Contents

ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার প্রত্যয়ে...

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা

অনলাইন সংস্করণ

❑ প্রকাশকাল:

১ম সংস্করণ: মার্চ ২০১৬ ইং।

❑ প্রকাশনায়:

ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া

ই-মেইল: support@i-onlinemedia.net

ওয়েব: www.i-onlinemedia.net

ফেসবুক: facebook.com/IslamicOnlineMedia

❑ ব্লগার/লেখকবৃন্দ:

- নূর-এ-আলম
- পাভেল আহমেদ
- আব্দুল্লাহ সাঈদ খান
- ইমরান হাসান
- সরোয়ার

❑ সংকলন, সম্পাদনা ও প্রচ্ছদ:

- এম.এ. ইমরান

- সূচিপত্র -

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব পরিচিতি	৫
	- পরিচিতি	৫
	- প্রাণের উৎপত্তি	১০
	- প্রজাতির উৎপত্তি	১৩
	- কোষের উৎপত্তি	১৪
	- ফসিল রেকর্ড	১৫
	- প্রাণীর উৎপত্তি	১৯
	- উদ্ভিদের উৎপত্তি	৪১
	- পৃথিবীর ইতিহাস	৪২
	- বেদনাদায়ক ভারসাম্য ব্যবস্থা	৫৮
২	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ১ – প্রাণের উৎপত্তি	৬১
৩	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ২ – কোষের জটিলতা–১ (ইউক্যারিওটিক কোষ)	৬৯
৪	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৩ – কোষের জটিলতা–২ (প্রোক্যারিওটিক কোষ)	৭৮
৫	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৪ – কোষের জটিলতা–৩ (ন্যূনতম অঙ্গাণুসমূহ)	৮৬
৬	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৫ – কোষের জটিলতা–৪ (সরলতম কোষের জটিলতম সমস্যা!)	৯৫
৭	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৬ – সম্ভাব্যতার অসম্ভাব্যতা–১	১০২
৮	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৭ – সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–২	১০৫
৮	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৮ – সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৩ (ছক্কা বনাম প্রোটিন)	১১১
১০	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৯ – সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৪ (সুনির্দিষ্ট জটিলতা)	১১৭

১১	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ১০ – সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৫ (বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা)	১২৭
১২	বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ১১ – সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৬ (সম্মিলিত হিসাব)	১৩৫
১৩	'Junk DNA' -এর পতন	১৪৯
১৪	মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো ইভলুশন: আদৌ কি সম্ভব?	১৫১
	আর্কিব্যাকটেরিয়া থেকে আর্কিয়া – বিবর্তনবাদীদের অস্বস্থি	১৬৩
১৫	বিবর্তনের বড় প্রমাণ 'জিরাফের লম্বা গলা'	১৬৭
১৬	নতুন নতুন ফ্লু ভাইরাসের আগমন কি বিবর্তনের উদাহরণ?	১৭১
১৭	মস্তিষ্কের আকার ও বিবর্তন	১৭৪
১৮	'অ্যাপেন্ডিক্স' অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়	১৭৭
১৯	বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ ও নাস্তিকতা	১৭৯
২০	সমাজতান্ত্রিক নাস্তিকতা এবং ইউজেনিক্স – এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক	১৮৫

চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব পরিচিতি

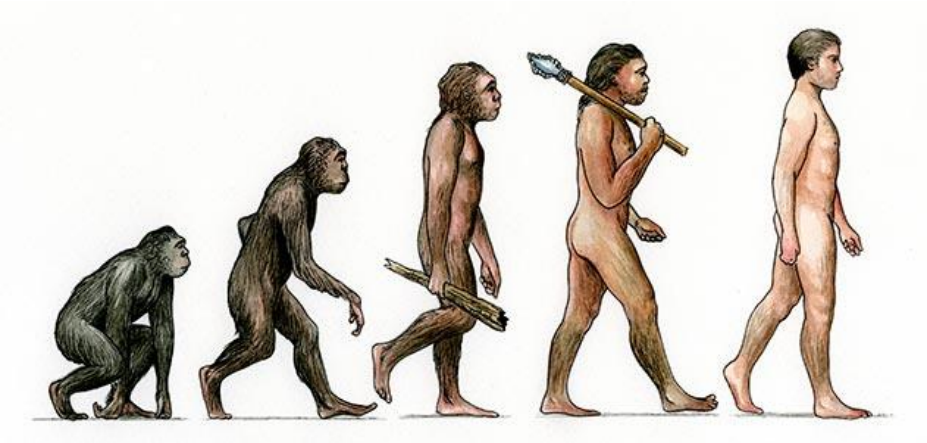

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

লামার্ক

যদিও প্রাচীন গ্রীসের রুপকথায় এটি প্রচলিত ছিলো, তবুও এই তত্ত্ব উনিশ শতকে বিজ্ঞান জগতের সামনে আনা হয়। বিবর্তন তত্ত্ব সর্বপ্রথম ফ্রেন্স জীববিজ্ঞানী ল্যামার্ক তার Zoological Philosophy (1809) নামক গ্রন্থে তুলে ধরেন। লামার্ক ভেবেছিলেন যে, প্রতিটি জীবের মধ্যেই একটি জীবনী শক্তি কাজ করে যেটি তাদেরকে জটিল গঠনের দিকে বিবর্তনের জন্য চালিত করে। তিনি এটাও ভেবেছিলেন যে, জীবেরা তাদের জীবনকালে অর্জিত গুণাবলি তাদের বংশধরে প্রবাহিত করতে পারে।

এ ধরনের যুক্তি পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাবনা করেছিলেন যে জিরাফের লম্বা ঘাড় বিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে তখন যখন তাদের পূর্ববর্তী কোন খাটো ঘাড়ের প্রজাতি ঘাসে খাবার খোঁজার পরিবর্তে গাছের পাতা খুঁজতে থাকে। কিন্তু লামার্কের এই বিবর্তনবাদী মডেল বংশানুক্রমিকতার জিনতত্ত্বীয় মডেল দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

মেন্ডেল

এখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কৌতুক মনে পড়ে গেল। শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণী কোনটি। ছাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল – জেব্রা। শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করলেন কেন? ছাত্রটি আবার বলল স্যার

পৃথিবীতে প্রথমে তো সব সাদা কালো ছিলো। জেব্রা তো এখনও সাদা কালো। তাই এটাই সবচেয়ে প্রাচীন প্রাণী।

ওয়াটসন ও ক্রিক

বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে DNA এর গঠন আবিষ্কারের ফলে প্রকাশিত হয় যে, জীবিত বস্তুর কোষের নিউক্লিয়াস বিশেষ ধরণের জৈবিক সঙ্কেত ধারণ করে এবং এ তথ্য অন্য কোন অর্জিত গুণ দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য নয়। অন্য কথায় জিরাফের জীবনকালে জিরাফ যদি গাছের উপরের শাখাগুলোর দিকে ঘাড় লম্বা করতে গিয়ে তার ঘাড়কে কিছুটা লম্বা করে ফেলতে সক্ষম হয়ও তবুও তা তার বংশধরে পৌছাবে না। সংক্ষেপে লামার্কের তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে এবং তা একটি ত্রুটিপুর্ণ ধারণা হিসেবে ইতিহাসে রয়ে গেছে।

এর পরে আসেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডারউইন। তার দেয়া তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় এবং এই তত্ত্বটি Darwinism বা ডারউইনের বিবর্তনবাদ নামে পরিচিত।

<u>ডারউইনিজমের জন্ম:</u>

ডারউইন ১৮৩১ সালে পাঁচ বছরের জন্য সমুদ্র ভ্রমণে বের হন। এই ভ্রমণে তিনি বিভিন্ন প্রজাতির জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রচন্ড প্রাভাবিত হন, বিশেষ করে গালাপাগোস দ্বীপের Finch পাখির ঠোঁট দেখে। এই পাখি গুলোর বিভিন্ন রকমের ঠোঁট দেখে তিনি মনে করেন যে পরিবেশের সাথে অভিযোজনের ফলাফল।

Finch পাখির ঠোঁট

ডারউইন এগুলোকে গালাপাগোস দীপপুঞ্জে দেখেছিলেন এবং তার তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে ধরেছিলেন। আসলে, পাখির ঠোটের এ বিভিন্নতার কারণ হল Genetic Variation কোন Macroevolution নয়।

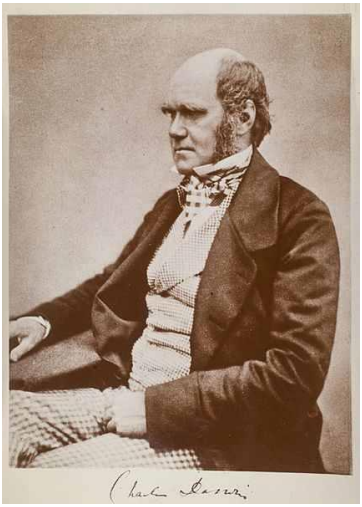

চার্লস ডারউইন

তার এই ভ্রমণ শেষে তিনি লন্ডনের একটি পশু মার্কেট পরিদর্শন করেন। তিনি এখানে দেখতে পান যে breeders রা সংকরয়নের মাধ্যমে নতুন চরিত্রের গরু উদ্ভাবন করছে।

এই সব অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি ১৮৫৯ সালে তার একটি বই প্রকাশ করেন The Origin of Species নামে। এই বইয়ে তিনি তার মতবাদকে তুলে ধরেন। তিনি এখানে বলেন- সকল প্রজাতি একটি কমন পুর্বপুরুষ থেকে এসেছে। (অবশ্য এই কমন পূর্বপুরুষ টি কোথা থেকে এসেছে তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি)।

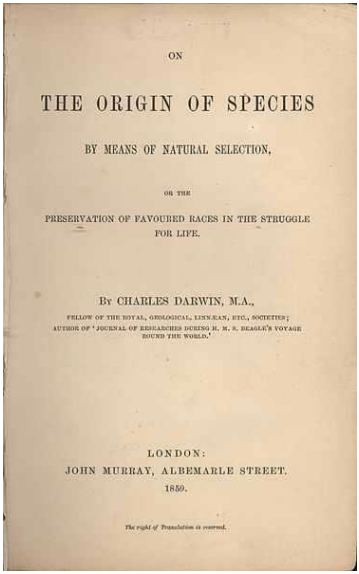
ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNEAN, ETC., SOCIETIES;
AUTHOR OF 'JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE ROUND THE WORLD.'

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

The right of Translation is reserved.

চার্লস ডারউইনের অরিজিন অফ স্পেসিস

ডারউইনবাদ বা বিবর্তনবাদ কি?

বিবর্তনবাদকে বুঝতে হলে আমাদের যেটা জানতে হবে- বিজ্ঞানী ডারউইনের The origin of Species – এ বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কি লিখেছেন?

তিনি যেটা লিখেছেন সেটি হল, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি বা অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যোগ্যতমের উর্ধতন।

তার তত্ত্বের গুরুত্বপুর্ণ উপাদানগুলো হলো-

১. দৈবাৎ স্বয়ংক্রিয় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবের উৎপত্তি।
২. প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং
৩. বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে,

প্রথমত: বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুসারে, জীবন্ত বস্তু অস্তিত্বে এসেছে দৈবাৎ কাকতালীয়ভাবে এবং পরবর্তিতে উন্নত হয়েছে আরও কিছু কাকতালীয় ঘটনার প্রভাবে। প্রায় ৩৮ বিলিয়ন বছর আগে, যখন পৃথিবীতে কোন জীবন্ত বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না, তখন প্রথম সরল এককোষী জীবের উদ্ভব হয়। সময়ের পরিক্রমায় আরও জটিল এককোষী এবং বহুকোষী জীব পৃথিবীতে আসে। অন্য কথায় ডারউইনের মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক শক্তি সরল প্রাণহীন উপাদানকে অত্যন্ত ক্ষুতহীন পরিকল্পনাতে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয়ত: ডারউইনবাদের মুলে ছিলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারনা। প্রাকৃতিক নির্বাচন ধারনাটি হল- প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি সার্বক্ষণিক সংগ্রাম বিদ্যমান। এটা সে সকল জীবকে অগ্রাধিকার দেয় যাদের বৈশিষ্ট্যসমুহ তাদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। এই সংগ্রামের শেষে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ খাওয়ানো প্রজাতিটি বেঁচে থাকবে।

যে সকল হরিণ সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী তারাই শিকারি পশুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। অবশেষে হরিণের পালটিতে শুধু দ্রুতগামী হরিণগুলোই টিকে থাকবে।

এখানে পাঠকদের বলে রাখি- যত সময় ধরে এই প্রক্রিয়াটি চলুক না কেন এটা সেই হরিণ গুলোকে অন্য প্রজাতিতে পরিণত করবে না। দুর্বল remove হবে, শক্তীশালী জয়ী হবে কিন্তু genetic ডাটাতে কোন change হবেনা। তাই প্রজাতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না।

হরিণের উদাহরণটি সকল প্রজাতির ক্ষেত্রে একই। প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র যারা দুর্বল তাদেরকে প্রকৃতি থেকে দূরীভূত করে। কিন্তু নতুন কোন প্রজাতি কিংবা কোন genetic

change আনে না। ডারউইন এই সত্য টাকে স্বীকার করেছিলেন এই বলে- প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না যদি অগ্রাধিকার যোগ্য স্বাতন্ত্র পার্থক্য ও বৈচিত্র না ঘটে।

তৃতীয়ত: প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য একটি ভায়ানক সংগ্রাম চলছে এবং প্রতিটি জীব শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তা করে। ডারউইন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ থমাস ম্যালথাস এর মত দ্বারা প্রাভাবিত হয়েছিলেন। তার মত ছিলো- জনসংখ্যা এবং সেই সাথে খাদ্যের প্রয়োজন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, কিন্তু খাদ্যের ভান্ডার বাড়ছে গানিতিক হারে। এর ফলে জনসংখ্যার আকৃতি অপরিহার্যভাবে প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন ক্ষুধা ও রোগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ডারউইন মানবজাতিতে 'বাচার জন্য সংগ্রাম' সংক্রান্ত ম্যালথাসের দৃষ্টিভঙ্গিকে বড় আকারে একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন এবং বলেন যে, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এ লড়াইয়ের ফল।

যদিও পরবর্তীতে অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয় যে, প্রকৃতিতে জীবনের জন্য সে রকম কোন লড়াই সংঘটিত হচ্ছে না যেরুপ ডারউইন স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে একজন ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী ভি.সি. উইনে অ্যাডওয়ার্ডস এ উপসংহার টানেন যে, জীবজগৎ একটি কৌতুহলোদ্দীপক পন্থায় তাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রাণীরা তাদের সংখ্যা কোনো প্রচন্ড প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয় বরং প্রজনন কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে করে।

প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের বিবর্তনবাদ নতুন কিছু নয়। বহু প্রাচীন কালেই এ তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছিল।

বিবর্তনবাদের ধারণাটি প্রাচীন গ্রিসের কতিপয় নাস্তিক বহুশ্বেরবাদী দার্শনিক প্রথম প্রস্তাব করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে সময়ের বিজ্ঞানীরা এমন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করত, যিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ফলে এ ধারণা টিকতে পারেনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী চিন্তাধারার অগ্রগতির সাথে সাথে বিবির্তনবাদী চিন্তা পুনর্জীবন লাভ করে।

গ্রিক মাইলেশিয়ান দার্শনিকরা, যাদের কিনা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা কিংবা জীববিদ্যার কোন জ্ঞানই ছিল না, তারাই ডারুইনবাদী চিন্তাধারার উৎস। থেলিস, অ্যানাক্সিম্যানডার, এম্পোডোক্লেসদের মত দার্শনিকদের একটি মত ছিল জীবন্ত বস্ত প্রাণহীন বস্তু থেকে তথা

বাতাস, আগুন এবং পানির থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এ তত্ত্ব মতে, প্রথম জীবন্ত জিনিসটিও পানি থেকে হঠাৎ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হয় এবং পরে কিছু জীব পানি থেকে মাটিতে উঠে এসে বসবাস করতে শুরু করে।

মাইলেশিয়ান গ্রিক দার্শনিক থেলিস প্রথম স্বয়ংক্রিয় উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণার মত প্রকাশ করেন। অ্যানাক্সিম্যানডার তার সময়কালের ঐতিহ্যগত ধারণা যে, জীবন কিছু সূর্যরশ্মির সাহায্যে ' Pre Biotic Soap' থেকে উৎপন্ন হয়, তা উপস্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রথম প্রাণীটির উদ্ভব হয়েছে সূর্যরশ্মির দ্বারা বাস্পীভুত সামুদ্রিক আঠালো কাদা মাটি থেকে।

চার্লস ডারউইনের ধারণাও উক্ত বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডারউইনের প্রজাতির মধ্যে অস্তিত্বের লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচন ধারণাটির মূল নিহিত রয়েছে গ্রিক দর্শনে। গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের থিসিস অনুযায়ী সার্বক্ষণিক লড়াই সংঘটিত হচ্ছে।

আবার গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রস্তুতিতে ভূমিকা রাখেন, বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যেই বস্তবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রাভাবিত তিনি তার ভিত রচনা করেন। তার মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছোট ছোট বস্তকণা দ্বারা গঠিত এবং বস্তছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। পরমাণু সবসময়ই বিরাজমান ছিল যা সৃষ্টি ও ধ্বংসহীন।

প্রাণের উৎপত্তি:

ডারউইন তার বইয়ে কোথাও প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে কথা বলেননি। তখনকার আমলের সরল মাইক্রোস্কোপ দিয়ে জীব কোষের গঠন সম্পর্কে খুব কমই জানা গিয়েছিল। তখন জীব কোষের গঠনকে খুবই সরল মনে করা হত। তাই তার মতবাদ- জড় বস্তু থেকে জীবের উৎপত্তি তখন খুবই জনপ্রিয়তা পায়।

তখন মনে করা হত গম থেকে ইদুরের উৎপত্তি। তারা এটা প্রমাণ করার জন্য গবেষনাগারে একটুকরা কম্বলের উপর কয়েক মুট গম ছড়িয়ে দেয়া হল। এবং প্রত্যাশা করা হল যে- এখান থেকে রহস্যজনক ভাবে ইদুরের সৃষ্টি হবে। গম পচা শুরু হলে সেখানে কত গুলো কীট দেখা যায়। এই কিট গুলো আলাদা করে নিয়ে বলা হয় যে গমের মত জড় পদার্থ থেকে প্রায় একই

আকৃতির কীট সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন পর আণুবীক্ষণিক গবেষনা থেকে জানা যায় যে, এই কিটগুলো এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। বরং গমের গায়ে পুর্ব থেকে এই লার্ভা লেগে ছিল।

ডারউইনের বই বের হওয়ার পাঁচ বছর পর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের অসারতা প্রমান করেন। তিনি বলেন – কোন বস্তুই নিজে নিজে সংঘটিত হতে পারে না।

জীবন প্রাণহীণ বস্ত থেকে উৎপত্তি হতে পারে - এই ভাবনাকে লুই পাস্তুর মিথ্যা প্রমাণ করেন।

বিজ্ঞানী মিলার (১৯৫৩ সালে) এই পরীক্ষায় গ্যাস reaction এর মাধ্যমে কিছু organic molecule সংগ্রহ করেন যেগুলো প্রাচীন জলবায়ুতে অবস্থান করত বলে মনে করা হয়। সে সময় এই পরীক্ষাকে বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে মনে করা হত। পরে এটাও ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ গবেষনায় দেখা গেছে মিলার তার পরীক্ষায় যে গ্যাস use করেছেন তা তখনকার জলবায়ুতে অবস্থানকারী গ্যাস থেকে যথেষ্ট ভিন্ন।

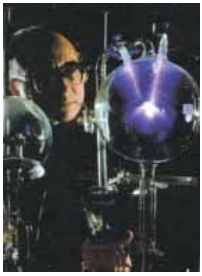

মিলারের experiment

The Great Chain of Being:

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলও ডারউইনবাদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এরিস্টটলের মতে জীব প্রজাতিসমূহকে সরল থেকে জটিলের দিকে একটি হাইয়ারারকিতে সাজানো যায় এবং তাদেরকে মইয়ের মত একটি সরল রেখায় আনা যায়। তিনি এ তত্ত্বটিকে বলেন Scala naturae. এরিস্টটলের এ ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের চিন্তাচেতনাকে গভীরভাবে প্রাভাবিত করে এবং পরে তা ‘ The Great Chain of Being’ –এ বিশ্বাসের উৎসে পরিণত হয়, পরবর্তিতে যেটা বিবর্তনবাদ ত রূপান্তরিত হয়।

The Great Chain of Being একটি দার্শনিক ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ বিশ্বাস অনুসারে ছোট ছোট জীব ধাপে ধাপে বড় জীবে পরিণত হয়। এই Chain এ প্রতিটি জীবেরই একটি অবস্থান আছে। এ ধারণা অনুসারে পাথর, ধাতু, পানি এবং বাতাস ক্রমে কোন

প্রকার বাধা ছাড়াই জীবন্ত বস্তুতে পরিণত হয়, তা থেকে হয় প্রাণী ও প্রাণী থেকে হয় মানবজাতি। এতদিন ধরে এ বিশ্বাসটি গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কারণটি বৈজ্ঞানিক নয়, বরং আদর্শিক।

The Great Chain of Being এর ধারণাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ পর্যন্ত বেশ বিখ্যাত ছিল এবং সে যুগের বস্তুবাদের ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। ফরাসি বিবর্তনবাদী কমটে ডি বুফন অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম বহুল পরিচিত বিজ্ঞানী ছিলেন। পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় যাবৎ তিনি প্যারিসের রায়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক ছিলেন।

ডারউইন তার তত্ত্বের একটি বড় অংশ বুফনের কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। বিজ্ঞানী ডারউইনের তত্ত্ব উপস্থাপন করতে যে, সকল উপাদান ব্যবহার করা দরকার ছিল তা বুফনের ৪৪ খন্ডে পুস্তক Historie Naturelle- তে পাওয়া যায়। ডি বুফন এবং লেমার্ক দুজনেরই বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বের ভিত্তি ছিল The Great Chain of Being এর ধারণা।

Tree of Life:

এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, জীব প্রজাতিকে যদি সরল থেকে জটিলের দিকে সাজানো যায় তাহলে এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে জীব প্রজাতি ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

হ্যা, এ সম্পর্কে বিবর্তনবাদের কট্টর সমর্থক ও প্রচারক Earnest Hackel এ সংক্রান্ত একটি স্কেচও করেন যা Tree of Life নামে পরিচিত।

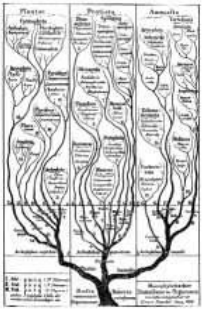

Earnest Heckel অঙ্কিত Tree of Life

Tree of Life এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রথমে আপনাদের জানতে হবে-

সমগ্র জীবজগতকে তাদের বৈশিষ্ঠের ওপর ভিত্তি করে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- জগৎ (Kingdom)

- পর্ব (Phylum)
- শ্রেনী (Class)
- বর্গ (Order)
- গোত্র (Family)
- গণ (Genus)
- প্রজাতি (Species)

আমরা জানি, সমগ্র জীবজতকে মোটামুটি ৫টি জগতে ভাগ করা যায়। এরা হলো প্রানিজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, ছত্রাক, প্রোটিস্টা এবং মনেরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ হলো প্রাণিজগৎ।

প্রাণিজগতের মধ্যে ৩৫ টির মত পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে Protozoa, Nedophorra, Platehelminthes, Nematoda, Mollusca, Arthropoda, Chordata ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পড়েছি ও জানি। বিভিন্ন পর্বের প্রাণিদের বৈশিষ্ঠ সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বতন্ত্র। আর প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই বিষয়গুলো আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যেমন- Chordata পর্বের Mammalia উপ-পর্বের দুটি প্রজাতি হলো বানর ও বেবুন। যদিও এরা দেখতে প্রায় একই রকম কিন্তু এদের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র পার্থক্য বিদ্যমান।

এখন আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি প্রজাতিগুলোর মধ্যে বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে দুটি কাছাকাছি প্রজাতির মধ্যে একটি অন্তরবর্তীকালীন (transitional) প্রজাতি থাকার কথা। বিবর্তনবাদীরা যেমন বলে যে, মাছ থেকে সরীসৃপ হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাছ ও সরীসৃপ এর মধ্যবর্তী প্রজাতি থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে এই প্রজাতি নেই।

প্রজাতির উৎপত্তি:

ডারউইন প্রাণীর সংকরায়নের ওপর পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, এ প্রক্রিয়ায় অধিক উৎপাদনশীল প্রাণী যেমন অধিক উৎপাদনশীল গরু উৎপন্ন হচ্ছে। এটা দেখে তিনি বলেন

এভাবে ক্রমাগত একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতেই কোন প্রজাতিতে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। কিন্তু যতই পরিবর্তন হোক গরু তো গরুই থাকছে। (গরু তো আর হাতি হচ্ছেনা)

বস্তুত জীবদেহের প্রতিটি কোষে ক্রোমোসোম থাকে। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মানব দেহে থাকে ২৩ জোড়া। আর ক্রোমোসোমই উত্তরাধিকারমূলক বৈশিষ্টের ধারক। প্রতিটি ক্রোমোসোমে থাকে জীন। জিন, যা বংশগতির তথ্য ধারন করে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল এর আবিষ্কার ও পরবর্তিকালের গবেষনায় এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই জিনের মধ্যে কোন পরিবর্তন না হলে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টের মধ্যে কোনটার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

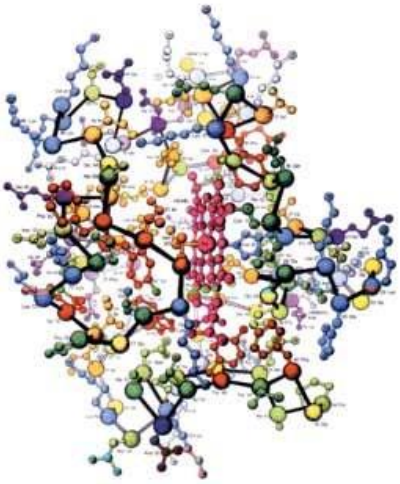

সাইটোক্রম সি প্রোটিনের জটিল ত্রিমাত্রিক গঠন। ছোট ছোট বলগুলো এমাইনো এসিডকে বুঝাচ্ছে। এই অ্যামাইনো এসিডের ক্রম ও আপেক্ষিক অবস্থানে ন্যুনতম ব্যত্যয় ঘটলে পুরো প্রোটিনটি অকার্যকর হয়ে যাবে। অথচ বিবর্তনবাদীদের ধারণা এ ধরণের অসংখ্য প্রোটিন নাকি কোন প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই দৈবাৎ দূর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তৈরী হয়ে গেছে!

ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম সৃষ্টি সময়কালে যে পরিবেশের চিন্তা করা হয় তাতে কোন জীবন্ত বস্তুর ন্যূনতম টিকে থাকার সম্ভাবনাই শূন্য। সুতরাং বিবর্তনবাদ অর্থহীন মতবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

কোষের উৎপত্তি:

ডারউইনের সময়ে যে অনুন্নত Microscope ছিল তাতে প্রতিটি কোষকে এক একটি প্রকোষ্ঠ ছাড়া কিছুই মনেই হয়নি। কিন্তু ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর দেখা যায় একটি কোষ কত জটিল।

মাইকেল ভেন্টন তার Evolotion: A theory in Crisis বইয়ে লেখেন- আণবিক জীববিদ্যা জীবনের যে বাস্তবতা প্রকাশ করেছে সেতি অনুধাবন করতে হলে, আমাদের একটি কোষকে

শতকোটি গুণ বড় করে দেখতে হবে যতক্ষণ না তা এত বড় করে দেখা যায় যে, তা ২০ কিলোমিটার ব্যাস ধারণ করে এবং গোটা লন্ডন বা নিউইয়র্ক শহরকে ঢেকে দেওয়ার মত বিশাল উড়োজাহাজের অনুরূপ আকৃতি লাভ করে। আমরা তখন যা দেখতে পাব তা হলো, একটি উপযুক্ত নকশা ও অসমান্তরাল জটিলতার বস্তু। উপরিতলে আমরা দেখতে পাব একটি বিশাল মহাকাশ যানে আলো বাতাস ঢোকার জন্য যে ছিদ্র যেগুলো অনবরত খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে এবং কোষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ভেতরে ঢোকানোর ও বাইরে বের করে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমরা যদি সে রন্ধ্রগুলোর এষ্টিতে ঢুকতে চাইতাম তাহলে আমরা আমাদেরকে এক সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি ও বিস্ময়কর জটিলতার জগতে দেখতে পেতাম- এটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য যে এলোমেলো কতগুলো প্রক্রিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ক্ষুদ্রতম উপাদানটিও এতটাই জটিল যা আমাদের নিজেদের সৃষ্টিশীল যোগ্যতার বাইরে? বরং এই জটিলতা এমন এক বাস্তবতা যা 'দৈবাৎ সৃষ্টি' হওয়ার মতবাদের বিপরীত তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং যেটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তৈরী যে কোন জিনিসের জটিলতা কে ছাড়িয়ে যায়।

ইংলিশ জোতির্বিদ এবং গাণিতিক স্যার ফ্রেড হোয়েল একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও বলেন যে, উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গঠন আকস্মাৎ তৈরী হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা এর সাথে তুলনীয় যে, একটি টর্নেডো কোন লোহা- লক্করের স্তূপের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান প্রস্তুত হয়ে গেল।

অন্যদিকে বিবর্তনবাদীরা একটি কোষ তো দূরে থাক বরং কোষের গাঠনিক উপাদান যেমন একটি প্রোটিনের উৎপত্তি পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।

ফসিল রেকর্ড:

ডারউইন বলেন, প্রাকৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে উন্নত প্রজাতি বাছাই হয়ে গেলে বিবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সে প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে জীবাশ্মের মধ্যে সেই মধ্যবর্তী প্রজাতির অসংখ্য সংখ্যায় পাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা কোন মধ্যবর্তী প্রজাতির কোন ধরণের জীবাশ্ম পাইনি।

ডারউইন এ সমস্যাটি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। তার বইয়ের Difficulties of The Theory অধ্যায়ে তিনি নিজেই এ প্রশ্নটি করেছেন এভাবে- কিন্তু যদিও এ তত্ত্বানুসারে অসংখ্য মধ্যবর্তী রুপ (transitional form) থাকার কথা তথাপি আমরা পৃথিবীতে তাদের অগণিত সংখ্যায় পাচ্ছি না কেন?

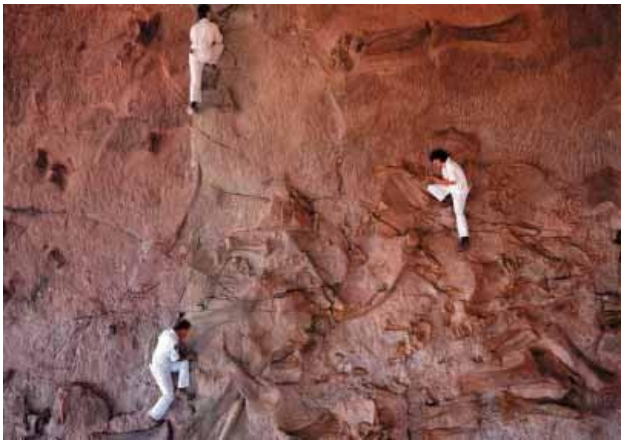

ফসিলের খোঁজে

ডারউইন তার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বলে যে, জীবাশ্ম রেকর্ড খুবই অসম্পুর্ণ। কিন্তু ডারউইনের এ তত্ত্ব দেয়ার পর গত ১৫০ বছর যাবৎ মিলিয়ন মিলিয়ন জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে। জীবাশ্ম রেকর্ড এখন প্রায় সম্পুর্ণ। কিন্তু আজ পর্যন্ত ডারউইন কথিত transitional form এর কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী Robert Carrol স্বীকার করেন যে, ফসিলের আবিষ্কার ডারউইনের আশাকে পূর্ণ করতে পারেনি।

এ বিষয়গুলো বিবর্তনবাদীদের কাছে স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের প্রমাণস্বরুপ জীবাশ্ম থেকে উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে যদিও ডারউইন কথিত মধ্যবর্তী অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব পাওয়ার কথা কিন্তু তা পাওয়া যায় না। তারপরও তারা বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করা বিভিন্ন ফসিলকে তারা দুটি প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে উপস্থাপন করে এবং ফলাওভাবে প্রচার করে।

ফসিল রেকর্ড থেকে বিবর্তনবাদীদের কথিত Tree of life এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং এক্ষেত্রে কোন নিকটবর্তী প্রজাতির জীবাশ্ম ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট সময়ে অধিকাংশ প্রজাতির স্বতন্ত্র জীবাশ্ম একই সাথে পাওয়া যায়। যেগুলো জীবাশ্ম রেকর্ডে একই সাথে আবির্ভূত হয়। এই সময়টিকে বলা হয় Cambrian age এবং উক্ত ঘটনাকে বলা হয় Cambrian Explosions.

কিন্তু ফসিল রেকর্ড তার বিপরীত অবস্থাই প্রদর্শন করে। নিচের ছবিটায় দেখা যাচ্ছে জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতিসমুহ হঠাৎ তাদের গঠনসহ আবির্ভূত হয়। পরবর্তীতে তাদের সংখ্যাটা না বেড়ে কমতে থাকে। আর কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিবর্তনবাদ বলে জীবজগতের বিভিন্ন দলসমুহ একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে এবং সময়ের সাথে পৃথক হয়ে গেছে। উপরের ছবিটি এই দাবিটি উপস্থাপন করে। ডারউইনবাদীদের মতে জীবসমূহ পরস্পর থেকে গাছের শাখা-প্রশাখার মত পৃথক হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

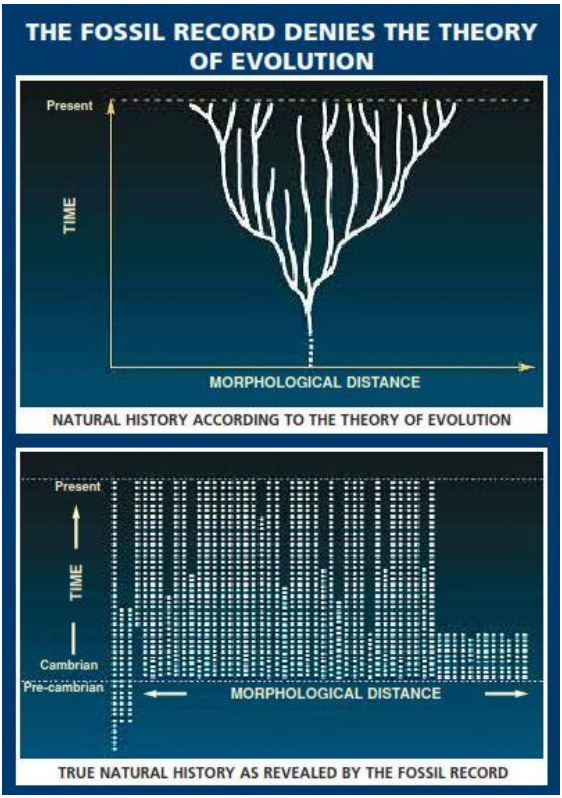

১০০- ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরনো স্টারফিস এর ফসিল

একটি Ordovician সময়ের Horseshoe crab এর ফসিল। এটির বয়স ৪৫০ মিলিয়ন বছর। যার বর্তমান প্রজাতির সাথে কোন ভিন্নতা নেই।

Ordovician সময়ের Oyster এর ফসিল

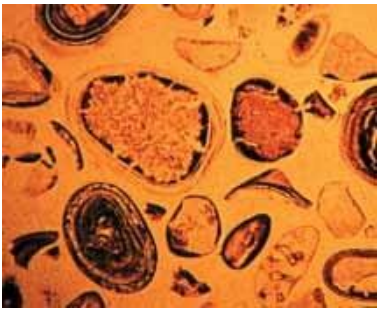

১.৯ মিলিয়ন বছরের ব্যাকটেরিয়ার ফসিল
(Ontario, United States)

৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Ammonites emerged

১৭০ মিলিয়ন বছরের পুরনো insect ফসিল
(Baltic Sea Coast)

১৪০ মিলিয়ন বছরের Dragonfly ফসিল
(Bavaria in Germany)

৩২০ মিলিয়ন বছরের Scorpion

১৭০ মিলিয়ন বছরের চিংড়ির ফসিল

৩৫ মিলিয়ন বছরের Old flies

প্রাণীর উৎপত্তি

উভচরের উৎপত্তি:

বিবর্তনবাদীরা ধারণা করেন যে, মাছ হয়ে যায় উভচর প্রাণী আর কোন কোন উভচর প্রাণী হয়ে যায় সরীসৃপ। আর সরীসৃপ হয়ে স্তন্যপায়ী ও পাখী। আর সবশেষে স্তন্যপায়ী থেকে মানুষের উৎপত্তি।

ডারউইনবাদীদের আঁকা মাছ ও উভচরের মধ্যবর্তী রুপ

বিবর্তনবাদীরা মনে করে Chordata পর্বটি একটি অমেরুদন্ডী পর্ব থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এসেছে। কিন্তু সত্য ঘটনা হলো Chordata পর্বের প্রাণীগুলো Cambrian age এ আবির্ভূত হয়।

উভচর প্রাণী ও মাছের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। দুটি উদাহরণ হল Eusthenopteron (একটি বিলুপ্ত মাছ) এবং Acanthostega (একটি বিলুপ্ত উভচর প্রাণী) এ দুটি চতুষ্পদ প্রাণীর উৎপত্তি সংক্রান্ত সমকালীন বিবর্তন চিত্রকল্পের প্রিয়বিষয়। Robert Carrol তার Patterns and Process of vertebrate Evolution গ্রন্থে এ দুটি প্রজাতি সম্পর্কে লেখেন যে Eusthenopteron এবং Acanthostega এর মধ্যে ১৪৫টি অ্যানাটমিকাল বৈশিষ্ঠের ৯১ টির মধ্যেই ভিন্নতা আছে। অথচ বিবর্তনবাদীরা বিশ্বাস করে যে এই সবগুলোই ১৫ মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে random mutation এর প্রক্রিয়ায় পুনরায় ডিজাইন হয়েছে। এই ধরণের একটা চিত্রকল্পে বিশ্বাস করা বিবর্তনবাদের পক্ষে সম্ভব হলেও এটা বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ঘটনাটি সকল মাছ উভচর প্রাণী বিবর্তন চিত্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Cambrian Age এর একটি ফসিল

Birkenia ৪২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো।

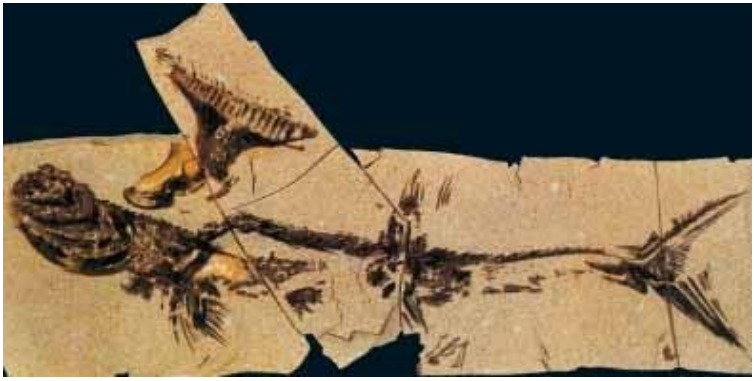

Shark – ৩৩০ মিলিয়ন বছরের পুরনো ফসিল।

Mesozoic Age এর কিছু মাছের ফসিল

১১০ মিলিয়ন বছরের পুরনো মাছের ফসিল (Brazil এ প্রাপ্ত)

Devonian Age. এর সময়ের ৩৬০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Osteolepis panderi

জলচর থেকে স্থলচর প্রাণীতে রুপান্তরিত হতে গেলে আর যে সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তা হল-

১. ভার বহন
২. তাপ ধারণ
৩. রেচনতন্ত্র
৪. শ্বসনতন্ত্র

ব্যাঙের উৎপত্তিতে কোন বিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়নি। জ্ঞাত সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাঙটিও মাছ থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন ছিল এবং এর সকল স্বতন্ত্র বিশিষ্ট নিয়ে আবির্ভুত হয়।

যখন বিবর্তনবাদীদের কাছে Coelacanth এর শুধু ফসিল ছিল তখন তারা এটি সম্পর্কে ডারউইনবাদী ধারণা পেশ করেন। যখন এর জীবিত নমুনা পাওয়া গেলো তখন তারা চুপ হয়ে যায়। উপরের ডানের ছবিটি ১৯৯৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় Coelacanth এর সর্বশেষ নমুনা।

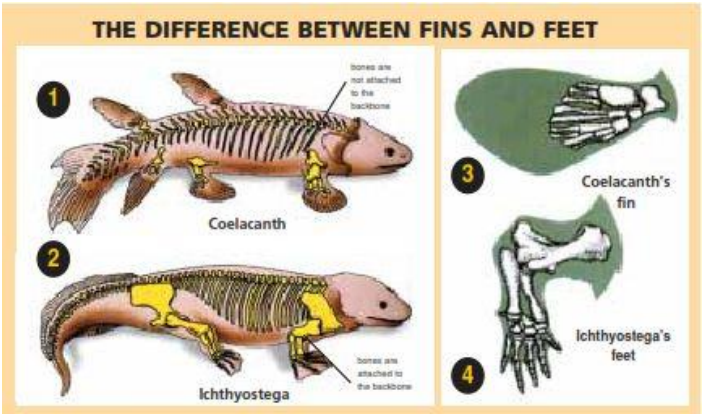

বিবর্তনবাদীদের Coelacanth এবং সম জাতীয় মাছকে 'স্থলচর' প্রানীর পূর্বপুরুষ বলে মনে করার মৌলিক কারণ হল Coelacanth দের কংকালময় ডানা (body fin) আছে। তারা মনে করে এই ডানাগুলো পর্যায়ক্রমে পায়ে পরিণত হয়। যাই হোক, মাছের অস্থি এবং স্থলচর প্রানী এর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে।

চিত্র-১ এ যেরুপ দেখন্নো হয়েছে Coelacanth এর হাড়গুলো মেরুদন্ডের সাথে লাগানো নয় অপরদিকে Ichthyostega এর ক্ষেত্রে তা লাগানো (চিত্র-২) একারণে মাছের ডানা পর্যায়ক্রমে পায়ে পরিণত হওয়ার ধারণাটি সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন। এছাড়াও Coelacanth এর ডানা Ichthyostega এর পায়ের অস্থির গঠনেও সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

৫০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Python এর ফসিল

জার্মানীতে প্রাপ্ত ৪৫ মিলিয়ন বছরের মিঠাপানির কচ্ছপ

১১০ মিলিয়ন বছরের পুরনো কচ্ছপের ফসিল (Brazil এ প্রাপ্ত)

২২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Eudimorphodon ফসিল। এটি flying reptiles এর oldest প্রজাতি (Italy)

২২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Ichthyosaur এর ফসিল

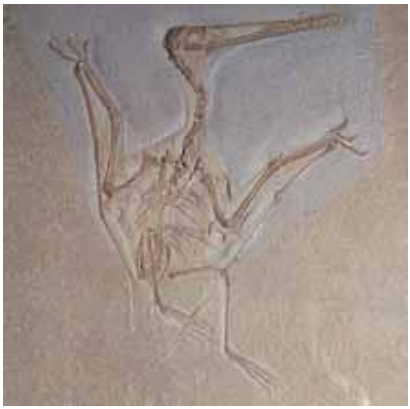

একটি Pterodactylus Kochi এর ফসিল। এটি উড়ন্ত Reptile. এটার বয়স ২৪০ মিলিয়ন বছর (Bavaria'য় প্রাপ্ত)

২২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো তেলাপোকার ফসিল, যা বর্তমান তেলাপোকার সাথে কোন পার্থক্য নেই।

একটি ৩০০ মিলিয়ন বছরের Acantherpestes major millipede এর ফসিল

একটি ১৪৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো ফসিল

একটি dragonflies এর ৩২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো ফসিল যার বর্তমান প্রজাতির সাথে কোন পার্থক্য নেই।

একটি ৫০মিলিয়ন বছরের পুরনো Bat এর ফসিল (Wyoming in the United States এ প্রাপ্ত)

পাখির উৎপত্তি:

থমাস হাক্সলে বলেন, পাখি হল মহিমান্বিত সরীসৃপ। অর্থাৎ সরীসৃপ পর্যায়ক্রমে পাখিতে পরিণত হয়। কিন্তু এ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পাখির গঠন এবং সরীসৃপ এর গঠন সম্পূর্ণ আলাদা।

পাখির বিশেষ শ্বসনতন্ত্র:

শ্বাসগ্রহণ:

বাতাস পাখির শ্বাসনালী দিয়ে এর পিছনের বায়ু থলিতে পৌছায়। যে বাতাস ব্যবহার করা হয়ে গেছে তা সামনের বায়ুথলিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

শ্বাসত্যাগ:

পাখি যখন শ্বাসত্যাগ করে পিছনের বায়ুথলির বিশুদ্ধ বাতাস তখন ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ব্যবস্থার কারণে পাখির ফুসফুসে সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ থাকছে।

এই শ্বসনতন্ত্রে অনেক জটিলতা আছে। যা এখানে সরলরুপে দেখানো হয়েছে। যেমন, ফুসফুসের সাথে বায়ুথলিতে যোগস্থলগুলোতে ভালভ আছে, যেন বাতাস সঠিক দিকে প্রবাহিত হয়। এসব কিছুই প্রকাশ করে যে, এখানে একটি পরিকল্পনা কাজ করছে। এই পরিকল্পনা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে শুধু ভুল প্রমাণিতই করে না বরং এটি স্পষ্টতই সৃষ্টির একটি নিদর্শন।

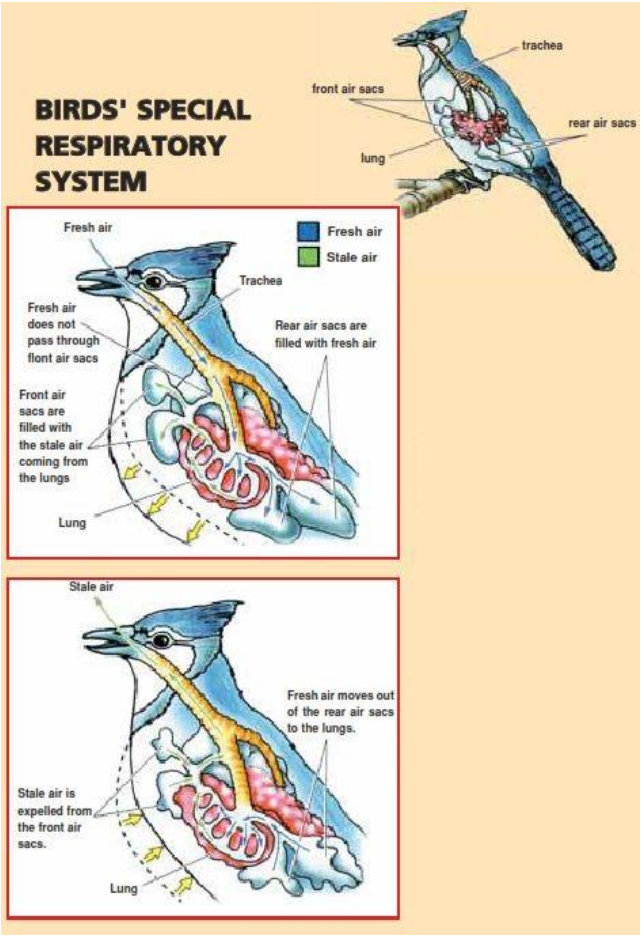

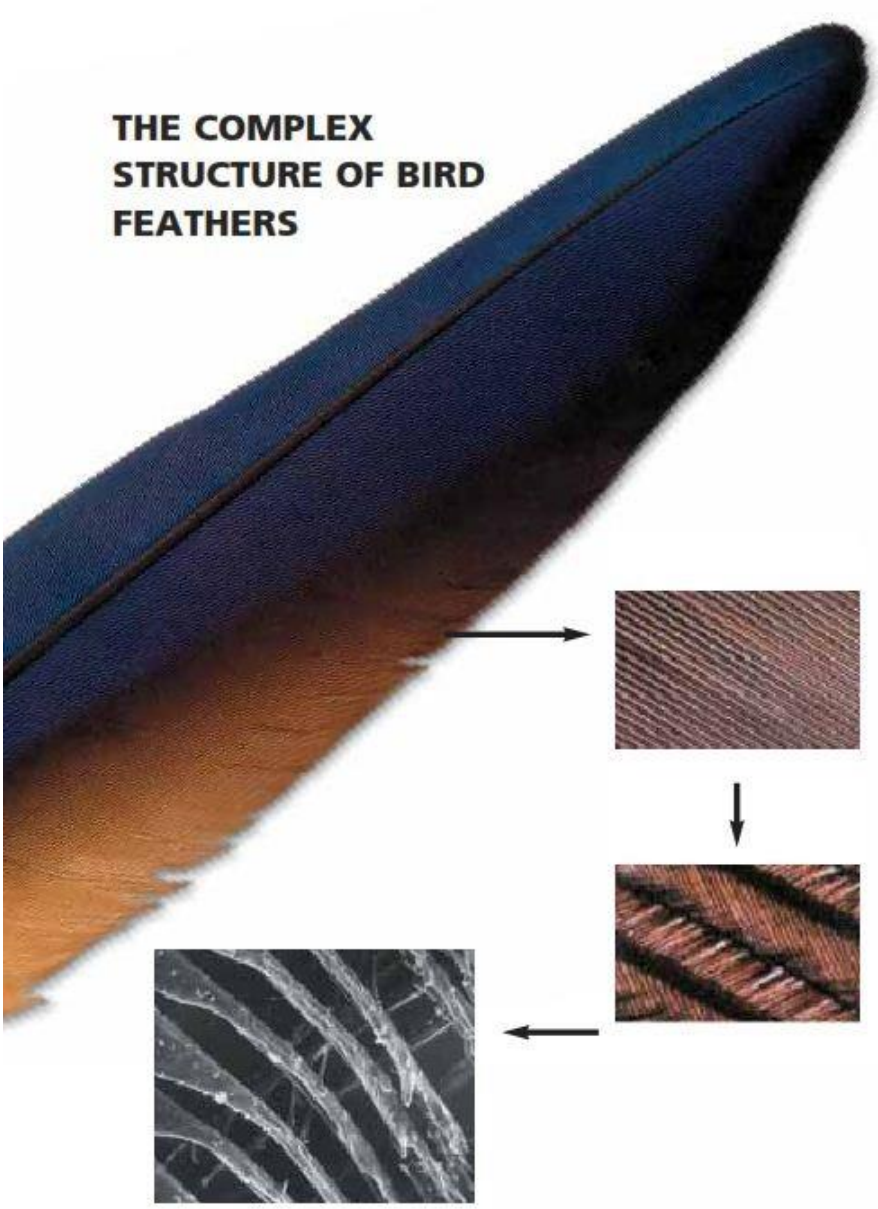

পাখির পাখার জটিল গঠন

যখন পাখির পাখাকে নিকট থেকে দেখা হয়, তখন একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা পাওয়া যায়। প্রতিটি ক্ষুদ্র পশমের ভিতরে আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পশম আছে এবং তাতে আছে বিশেষ হুক। যেগুলো পশমগুলির একটিকে অপরটির সাথে লেগে থাকতে সাহায্য করে।

মানুষের উৎপত্তি:

এরপর বিবর্তনবাদীরা আসে মানুষের গঠন নিয়ে। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

তারা দাবি করে বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি। আর এক্ষেত্রে মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী হল বনমানুষ। তারা দাবি করে যে, মানুষ ও বনমানুষ বা এপদের মধ্যে জেনেটিক সমতুল্যতা ৯৯%। তার মানে বাকি ১% এর কারণে আমরা মানুষ। কিন্তু ২০০২ সালের অক্টোবরে জানা যায় যে, এপ এর সাথে মানুষের জেনেটিক সমতুল্যতা ৯৯% নয় বরং ৯৫%।

ডারউইনবাদীরা দাবী করে যে, আধুনিক মানুষ এক ধরনের এপ (বনমানুষ জাতীয় প্রাণী) থেকে বিবর্তিত হয়েছে। ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হওয়া এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ ও তার পূর্বসূরীদের মধ্যে কিছু অবস্থান্তর প্রাপ্তিকালীন প্রজাতি পাওয়া যায় বলে দাবী করা হয়। এই কার্যত সম্পূর্ণ কাল্পনিক চিত্রে, নিম্নের চারটি মৌলিক প্রকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে-

1. Australopithecus
2. Homo Habilis
3. Homo Eractus
4. Homo Sapiens

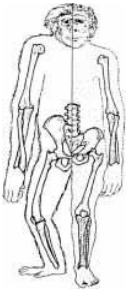

Australopithecus এর মাথার খুলি এবং কঙ্কাল আধুনিক এ্যাপ এর মাথার খুলি ও কংকালের সাথে প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ। উপরের চিত্রটিতে একটি শিমপাঞ্জি দেখানো হয়েছে।

একটি Australopithecus robustus এর খুলি। এটি বনমানুষের খুলির সাথে প্রায় সাদৃশ্যপুর্ণ।

ধারণা করা হয়, এই প্রজাতি গুলো আফ্রিকাতে প্রথম ৪ মিলিয়ন বছর আগে আবির্ভূত হয় এবং ১ মিলিয়ন বছর আগ পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি Australopithecus হল বিলুপ্ত এ্যাপ যেগুলো বর্তমানে বেঁচে থাকা এ্যাপ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Good bye Lucy

একসময় Australopithecus প্রজাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে ধরা হত 'Lucy' নামক একটি জীবাশ্মকে। কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। বিখ্যত ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞান ম্যাগাজিন Science et Vie এর ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সংখ্যা এ ঘটনার সত্যতাকে Good bye Lucy শিরোনামে স্বীকার করে নেয় এবং এটা নিশ্চিত করে যে Australopithecus কে মানুষের পূর্বসুরী হিসেবে ধরা যায় না।

বিবর্তনবাদ অনুসারে বনমানুষ পর্যায়ক্রমে মানুষে পরিণত হয়েছে তাই এদের মধ্যবর্তী প্রজাতি থাকার কথা এবং অসংখ্য এরুপ জীবাশ্ম পাওয়ার কথা। বিবর্তনবাদীরা এ জন্য পুরোদমে জীবাশ্ম অনুসন্ধান করতে থাকে। তারা তাদের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে কিছু জীবাশ্মকে মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। এ জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ধোঁকাবাজি, চিত্রাঙ্কন ও প্রচার মাধ্যমের আশ্রয় ও নেন। কিন্তু

দেখা যায় একটি মধ্যবর্তী প্রজাতির আবিষ্কার বলে প্রচার করার কয়েকদিন পরেই তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

AFARENSIS AND CHIMPANZEES

উপরের একটি AL 444-2 Australopithecus afarensis খুলি, এবং তার নিচে একটি আধুনিক শিম্পাঞ্জির খুলি। এখানে যে পরিস্কার সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা এ বিষয়টির প্রমাণিক নিদর্শন যে Afarensis একটি সাধারণ বনমানুষেয় প্রজাতি, এতে মানুষের কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

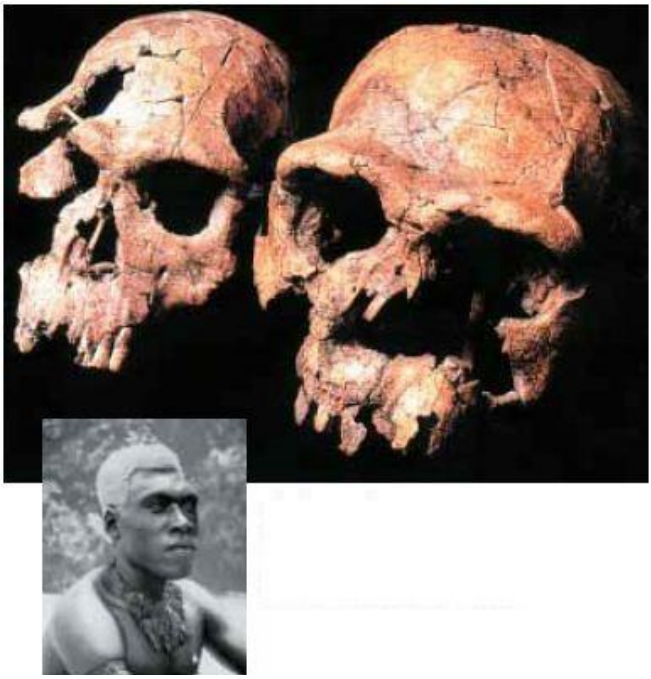

Homo eractus প্রজাতির বড় ' eyebrow protrusion' এবং ' পিছনের দিকে ঢালু কপাল'

Homo eractus প্রজাতির বড় 'eyebrow protrusion' এবং 'পিছনের দিকে ঢালু কপাল' এ জাতীয় বৈশিষ্টগুলো আমাদের সমকালীন কিছু জাতিতেও দেখা যায়। যেমন- ছবিতে একজন মালয়েশিয়ান আদিবাসিকে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং Homo eractus কে একটি মধ্যবর্তী প্রজাতি হিসেবে দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

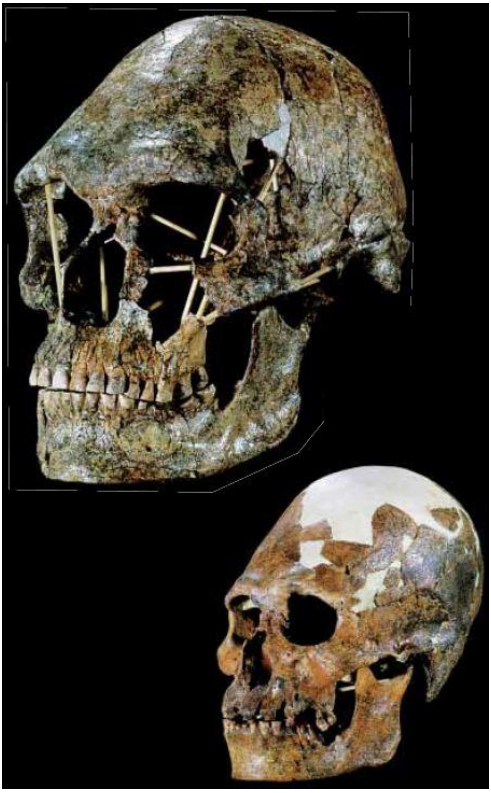

উপরের ছবিটি একটি ১০০০০ বছর পুরোনো Homo erectus.

এই খুলি দুটি ১৯৬৭ সালের ১০ই অক্টোবরে Australia র Victoria Kowswamp এলাকায় পাওয়া যায় যেগুলোর নাম দেওয়া হয় Kowswamp I এবং Kowswamp V Alan Throne এবং Philip Macumber যারা খুলি দুটি আবিষ্কার করেন এবং এগুলোকে Homo erectus এর skull বলেন। অথচ সেগুলোতে Homo erectus এর বিলুপ্তি প্রাপ্ত অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তথাপি এগুলোকে Homo erectus বলার একমাত্র কারণ হল এগুলোর বয়স হিসেব করা হয় ১০০০০ বছর। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা Homo erectus কে একটি মানুষের প্রজাতি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কারণ তারা বিশ্বাস করত Homo erectus একটি ‘আদিম’ প্রজাতি এবং তারা আধুনিক মানুষের ৫০০০০০ বছর আগে বসবাস করত। অন্য দিকে বর্তমান মানব প্রজাতির বয়স হল মাত্র ১০০০০ বছর।

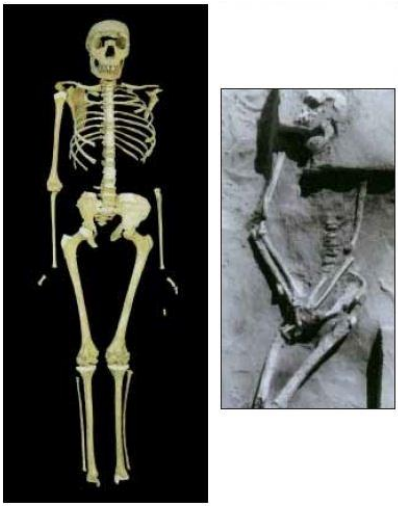

Homo erectus এবং আদিবাসী

উপরের চিত্রে প্রদর্শিত Turkana Boy কঙ্কালটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত Homo erectus এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মজার বিষয় হল, এই ১.৬ মিলিয়ন বছর বয়সী ফসিলটির সাথে বর্তমান মানুষের কঙ্কালে তেমন কোন তফাৎ নেই। উপরের প্রদর্শিত Australian আদিবাসীর কঙ্কালটির Turkana Boy এর সাথে বিশেষ সাদৃশ্যপুর্ণ। এ ঘটনাটি আবার প্রমাণ করে যে, Homo erectus মানুষের একটি প্রজাতি বৈ কিছুই নয় এবং এর কোন 'আদিম' বৈশিষ্ট নেই।

একটি মুখমন্ডলের হাড় ৮০০০০০ বছরের পুরনো ফসিল, স্পেনে প্রাপ্ত। যার সাথে বর্তমান সময়ের মানুষের কোন অমিল নেই।

৩.৬ মিলিয়ন বছর আগে মানুষের পায়ের ছাপ (তানজানিয়ায় প্রাপ্ত)

AL 666-1: A 2.3-MILLION-YEAR-OLD HUMAN JAW

Fossil AL 666-1 was found in Hadar in Ethiopia, together with *A. afarensis* fossils. This 2.3-million-year-old jaw bone had features identical to those of *Homo sapiens*.
AL 666-1 resembled neither the *A. afarensis* jawbones that were found with it, nor a 1.75-million-year-old *Homo habilis* jaw. The jaws of these two species, with their narrow and rectangular shapes, resembled those of present-day apes.
Although there is no doubt that AL 666-1 belonged to a "*Homo*" (human) species, evolutionary paleontologists do not accept this fact. They refrain from making any comment on this, because the jaw is calculated to be 2.3 million years old—in other words, much older than the age they allow for the *Homo*, or human, race.

The AL 666-1, 2.3-million-year-old *Homo sapiens* (human) jaw.

Side view of AL 666-1

AL 222-1 fossil, an *A. afarensis* jaw from the same period as AL 666-1.

AL 222-1 – a side view. The side views of the two jaws make the difference between the two fossils clearer.
The AL 222-1 jaw protrudes forwards. This is an ape-like feature. But the AL 666-1 jaw on top is a completely human one.

মিলিয়ন বছর পুর্বের মানুষের চোয়াল

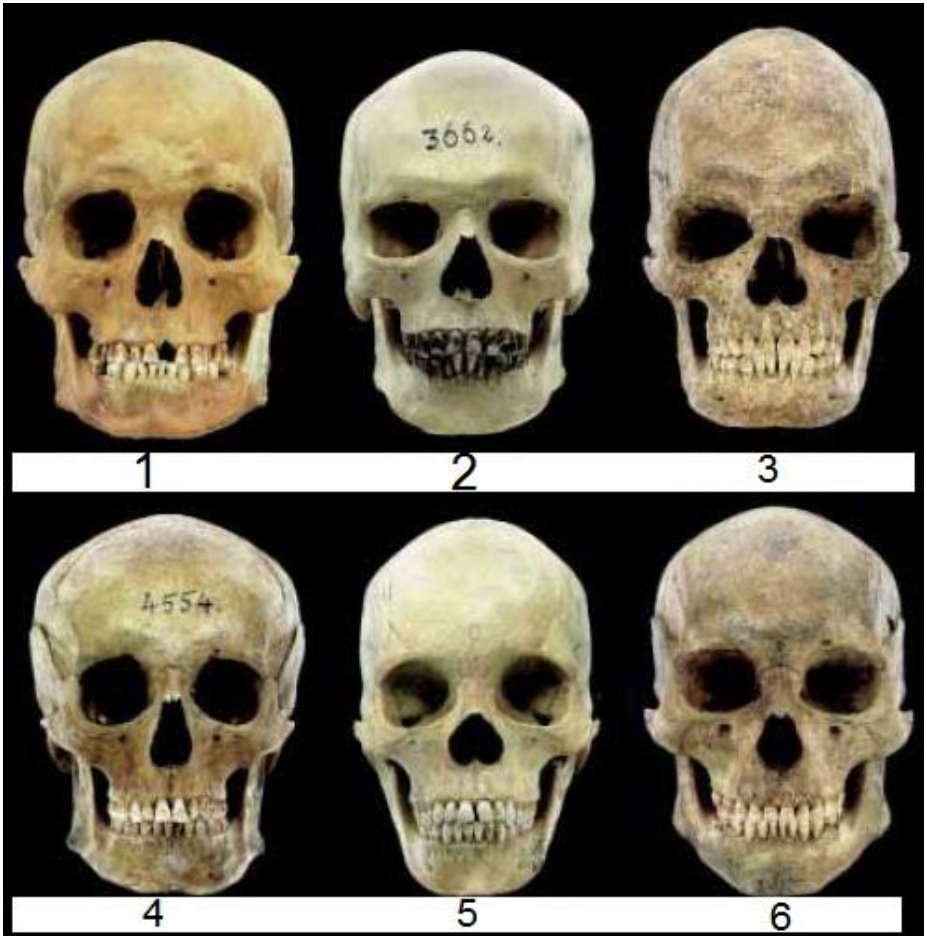

আধুনিক মানুষের জাতিসমূহের মধ্যে কঙ্কালগত পার্থক্য

বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদরা Homo erectus, Homo sapiens neanderthaleansis এবং archaic Homo sapiens মানব জীবাশ্মগুলোকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। তারা বিভিন্ন ফসিল স্কালগুলোর পার্থ্যক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্যের মধ্যে আছে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যকার বৈচিত্র যে, জাতিগুলোর কতক বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর কতক মিশে গেছে

অন্যান্য জাতির সঙ্গে। সময়ে সময়ে জাতিগুলো যখন একে অপরের সংস্পর্শে আসতে থাকে তখন পার্থ্যক্যগুলো আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে।

বর্তমান যুগের মানবজাতি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উপরে কয়েকটি আধুনিক জাতিসমুহের স্কালের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

উপরের চিত্রগুলো নাম্বার অনুযায়ী-

১. পনের শতাব্দীর পেরুভিয়ান আদিবাসী

২. মধ্য বয়সী বাঙ্গালী

৩. সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পুরুষ যিনি ১৮৯৩ সালে মারা যায়।

৪. জার্মান পুরুষ ২৫-৩০ বছর

৫. Congolese পুরুষ, বয়স ৩৫-৪০

৬. Inuit পুরুষ, বয়স ৩৫-৪০

বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদদের প্রবণতা হল নতুন কোন জীবাশ্ম আবিষ্কার হলেই তাকে এ্যপদের নিকটবর্তী অথবা মানুষের নিকটবর্তী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। অথচ জীবাশ্মটি যে এ্যপ বা মানুষের বিলুপ্ত কোন জাতি হতে পারে সে ব্যাপারটা তারা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এমনকি অনেকসময় শুধুমাত্র একটি দাঁতের উপর ভিত্তি করে পুরো একটি নতুন মধ্যবর্তী প্রজাতি দাড় করিয়ে দেয়। আবার মুখমন্ডলের কংকালের উপর যে Facial Reconstruction করা হয় তাও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিকর। কেননা কারও মুখমন্ডলের গঠন চর্বি ও মাংশপেশীর পরিমান ও তুলনামূলক অবস্থানের উপরও নির্ভর করে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রাপ্ত কঙ্কালের উপর ভিত্তি করে সঠিক Facial Reconstruction করা সম্ভব নয়।

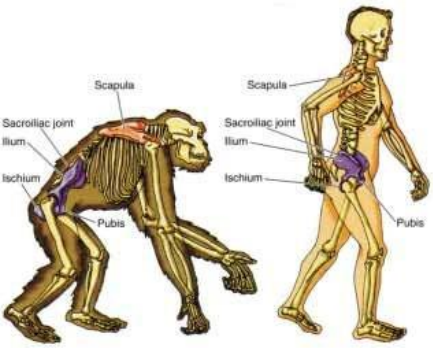

মানুষের কংকালকে দাঁড়িয়ে হাটার উপযুক্ত করে নকশা করা হয়েছে। অপরদিকে এ্যপদের ছোট পা, লম্বা হাত এবং সামনে ঝুকে

দাঁড়ানোর ভঙ্গি চার পায়ে চলার জন্য উপযুক্ত। এটা সম্ভব নয় যে, এ্যাপ ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী রুপ থাকবে। কেননা দ্বিপদী অবস্থাটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার 'উন্নততর অবস্থার দিকে যাওয়ার নীতি' এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অন্যদিকে এ ধরনের মধ্যবর্তী দশার পক্ষে চলাই অসম্ভব হয়ে পড়বে।

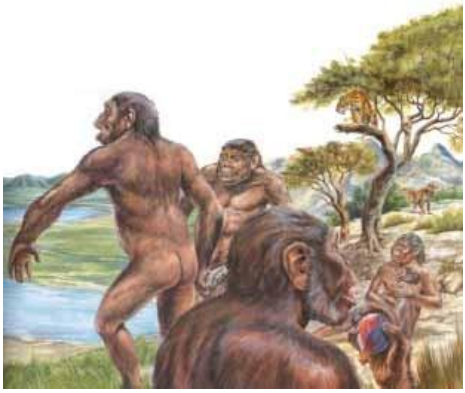

বিবর্তনবাদীদের এই সব আকাঝোকার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নাই।

৪০ বছর ধরে এই ফসিলটিকে বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের পক্ষে বড় প্রমান হিসাবে দেখাতো। কিন্তু পরে এই ফসিলটি ভুয়া প্রমানিত হয়।

Neanderthal মানব:

১০০০০০ বছর আগে ইউরোপে মানুষের হঠাৎ আবির্ভুত একটি জাতি যারা দ্রুত অন্যান্য জাতির সাথে মিশে যায় কিংবা হারিয়ে যায়। এরা ৩৫০০০ বছর আগে পর্যন্ত জীবিত ছিল। তাদের সাথে আধুনিক মানুষের একমাত্র পার্থক্য হল, তাদের কঙ্কালগুলো আরও বলিষ্ঠ এবং তাদের মাথার ধারণ ক্ষমতা একটু বেশী।

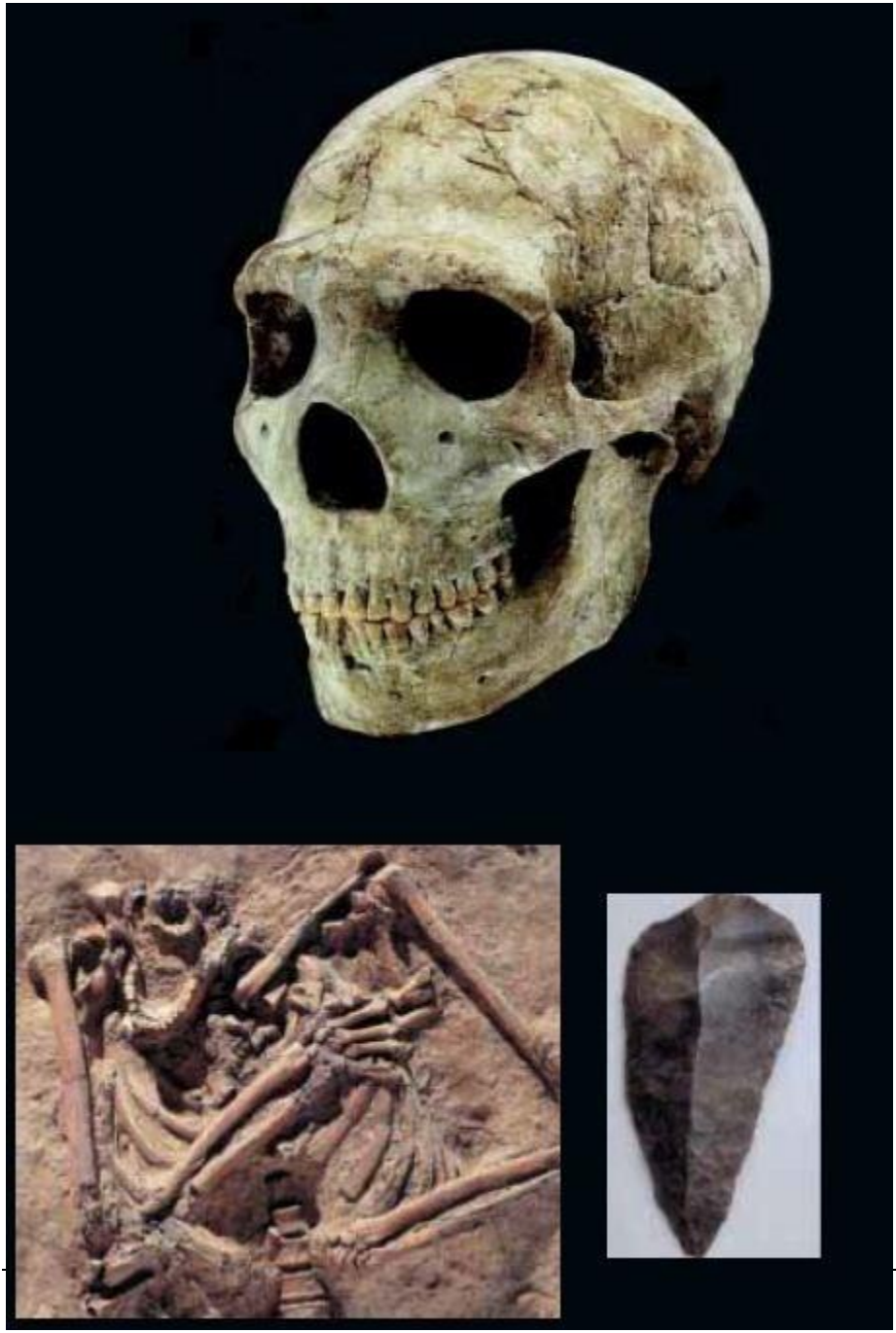

NEANDERTHALS:

উপরের চিত্রটিতে ইসরাইলে প্রাপ্ত Homo sapiens neanderthalensis Amud I এর skull দেখানো হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, খুলিটি যার ছিলো সে ১.৮০ মিটার লম্বা ছিলো। এই খুলির ধারণ ক্ষমতাও বর্তমানে প্রাপ্ত খুলির মতই- ১৭৪০ সিসি।

তার নিচে Neanderthals জাতির একটি ফসিল কঙ্কাল এবং তাদের use করা একটি পাথর নির্মিত যন্ত্র দেখানো হয়েছে।

এ ধরণের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, Neanderthals প্রকৃতপক্ষে মানব প্রজাতিই ছিল যারা সময়ের ধারাবাহিকতায় হারিয়ে গেছে।

NEANDERTHALS সূচ

ছাব্বিশ হাজার বছর পুরনো সূচ। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে Neanderthals- রা ১০০০০ বছর আগে পোষাক বুনন জানত।

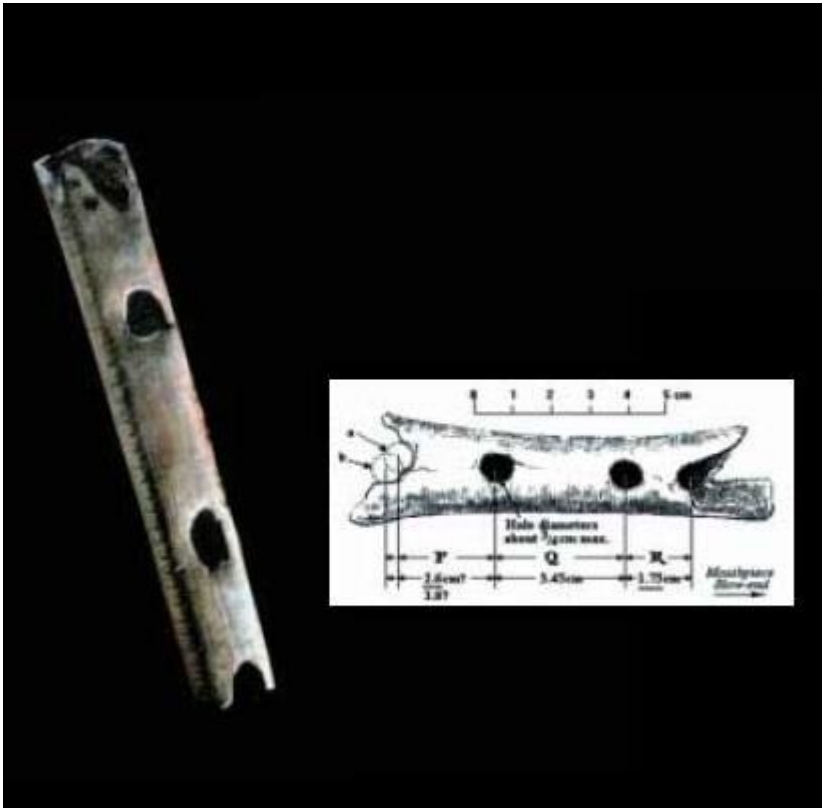

NEANDERTHALS বাঁশি

হাড় দিয়ে তৈরী Neanderthals বাঁশি। হিসাব করে দেখা গেছে যে ছিদ্রগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যেন সঠিক উপসুরটি পাওয়া যায়। অন্যকথায় বাঁশীটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়েছে।

উপরে গবেষক Bob Fink এর বাঁশী সংক্রান্ত হিসাবটি দেখানো হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পাই Neanderthals রা কোন আদিম গুহা মানব ছিলো না, বরং তারা সভ্য মানব ছিলো।

Nebraska মানব Scandal

একটি জীবাশ্ম এর উপর ভিত্তি করে এই Nebraska মানব এর কল্পিত চিত্র আঁকা হয়। নাম দেয়া হয় Hesperopithecus haroldcooki. কিছু দিন পর জানা যায় উক্ত জীবাশ্মটি ছিলো একটি বুনো শুকরের জীবাশ্ম।

বিবর্তনবাদীরা এ জাতিটিকে মানুষের আদিম প্রজাতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছিল তথাপি সকল আবিস্কার প্রমাণ করে যে, তারা আধুনিক বলিষ্ঠ মানুষের থেকে পৃথক কিছু নয়।

উদ্ভিদের উৎপত্তি:

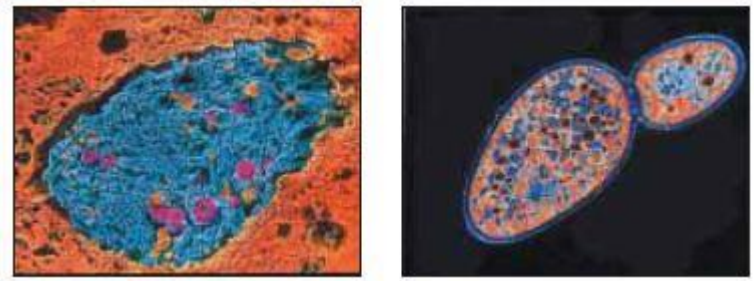

বিবর্তনবাদীদের দাবী- prokaryotic cells থেকে eukaryotic Cell এর উৎপত্তি। যার বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই।

৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরনো গাছের ফসিল, যা বর্তমান প্রজাতির সাথে কোন অমিল নেই।

১৮০ মিলিয়ন বছরের পুরনো গাছের ফসিল

১৪০ মিলিয়ন বছরের পুরনো Archaefructus প্রজাতির ফসিল

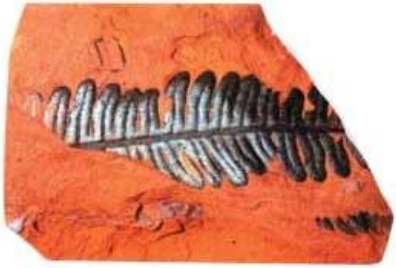

৩২০ মিলিয়ন বছরের পুরনো ফার্ন গাছের ফসিল

পৃথিবীর ইতিহাস

বিভিন্ন যুগ:

মানব ইতিহাসকে বিবর্তনবাদীরা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছে। তাদের মতে- মানুষ এক সময় বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, এরপর দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শেখে। এ সময় তারা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তখন ছিল প্রস্তর যুগ। পর্যায়ক্রমে আসে ব্রোঞ্জ যুগ তারপর আসে লৌহ

যুগ। মানুষ যখন আগুন জালাতে শেখে তখন সভ্যতার সূচনা হয়। কিন্তু তারা ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এবং কিছু অকাট্য যুক্তিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়।

যেমন: লোহা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। সুতরাং তথাকথিত প্রস্তর যুগে লোহা ব্যবহার হয়ে থাকলেও তা পাওয়া যাবে না। আবার ব্রোঞ্জ তৈরীর জ্ঞানতো লোহা ব্যবহারের জ্ঞানের চেয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা। সে হিসেবে লৌহযুগ ব্রোঞ্জের যুগের আগে আসার কথা, পরে নয়।

উপরের ছবিতে প্রদর্শিত ব্রেসলেট দুটির বামপাশেরটি মার্বেল দিয়ে তৈরী এবং ডানপাশেরটি ব্যসাল্ট দিয়ে তৈরী। এ দুটির বয়স ৮৫০০ এবং ৯০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুযায়ী এ সময় শুধু পাথর দিয়ে নির্মিত যন্ত্রপাতি use করা হত। কিন্তু মার্বেল ও ব্যসাল্ট খুব কঠিন পদার্থ। এগুলোকে বাঁকা ও গোল করতে গেলে অবশ্যই স্টীলের ব্লেড ও যন্তপাতি ব্যবহার করতে হবে। আর এটা স্পষ্ট যে তাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধও ছিল।

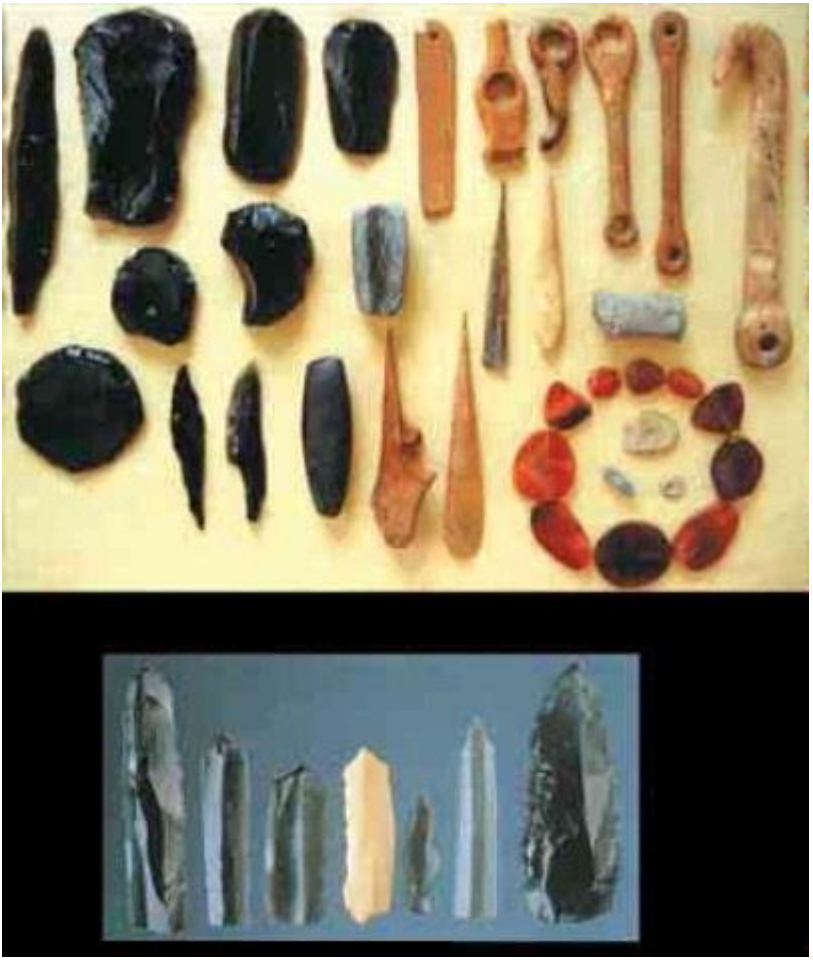

উপরের ছবিদুটি তে হাড়গুলো আবিসিডিয়ানের তৈরী বিভিন্ন বস্তু। এগুলো তৈরী করতে অবশ্যই স্টীলের ব্লেড ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

A 12,000-year-old button

Left: These bone buttons, used around 10,000 BCE, show that the people of the time had clothing with fasteners. A society that uses buttons must also be familiar with sewing, cloth making, and weaving.

12,000-year-old beads

Below: According to archaeologists, these stones, dating back to around 10,000 BCE, were used as beads. The perfectly regular holes in such hard stones are particularly noteworthy, since tools made out of steel or iron must have been used to drill them.

9,000 to 10,000-year-old needles and awl

Above: These needles and awl, which date back to around 7,000 to 8,000 BCE, offer important evidence of the cultural lives of the people of the time. People who use awls and needles clearly led fully human lives, and not an animalistic existence, as evolutionists maintain.

A 12,000-year-old copper awl

Above: This copper awl, dating back to around 10,000 BCE, is evidence that metals were known about and mined, and shaped during the period in question. Copper ore, typically found in crystal or powder form, appears in the form of seams in old, hard rocks. Any society that made a copper awl must have recognized copper ore, managed to extract it from inside the rock and have had the technological means with which to work it. This shows that they had not just recently been primitive, as evolutionists maintain.

The flutes in the picture are an average of 95,000 years old. People who lived tens of thousands of years ago possessed a taste for musical culture.

কয়েক হাজার পুর্বে পাথরের তৈরী কিছু জিনিস।

This stone carving is 11,000 years old—when, according to evolutionists, only crude, stone tools were in use. However, such a work cannot be produced by rubbing one stone against another. Evolutionists can offer no rational, logical explanation of such reliefs formed so accurately. Intelligent humans using tools of iron or steel must have produced this and other similar works.

১১০০০ পুর্বের কাটা পাথর

আপনি এই পাথর গুলোকে পাথর দিয়ে কাটতে পারবেন না।

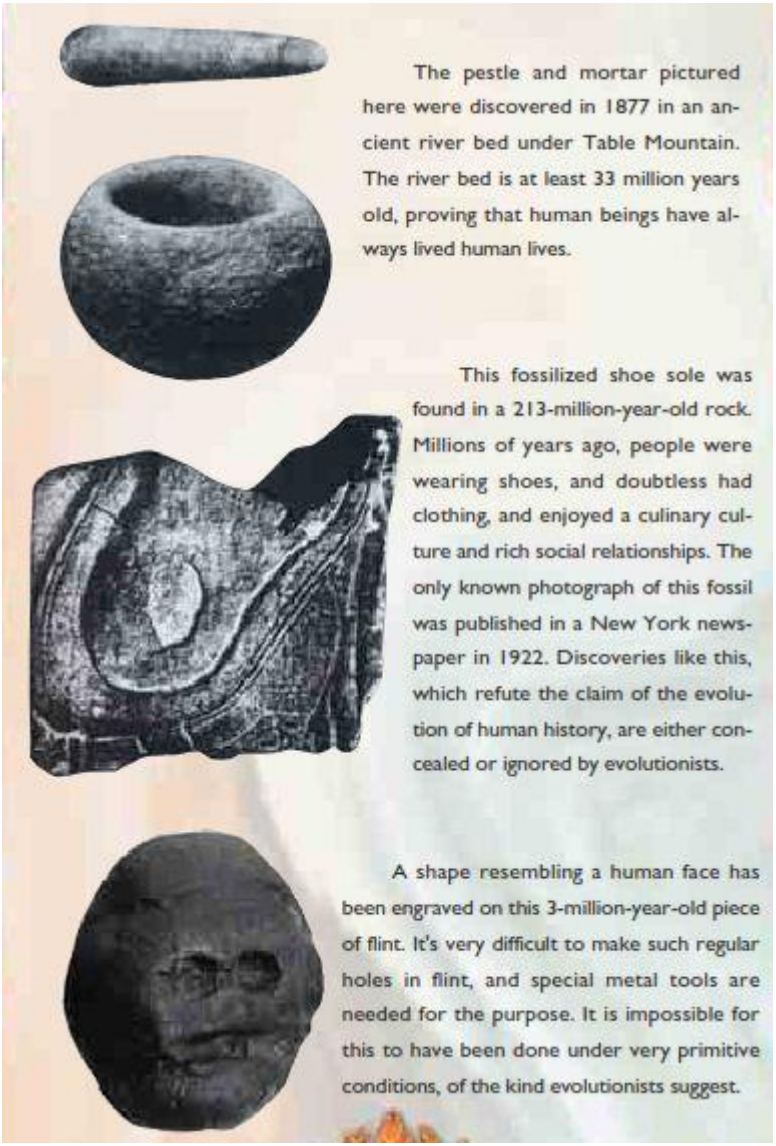

উপরের ৩ নাম্বার চিত্রটি ২১৩ মিলিয়ন বছর পুর্বের জুতার সোলের ফসিল এবং পাথরের তৈরী কিছু জিনিস।

গুহার অঙ্কন:

বিবর্তনবাদীরা বিভিন্ন গুহায় প্রাপ্ত বিভিন্ন অঙ্কন দেখে বলে যে, এগুলো আদিম গুহা মানবদের তৈরী। সে চিত্র গুলো আঁকতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে তা এমনি কি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও মুছে যায়নি বা ক্ষয় হয়নি? দেখা গেছে যে, আধুনিক যুগের জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেও সেই রঙটি পুনঃপ্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি কোন চিত্রে যে, ত্রিমাত্রিক গঠন পাওয়া যায় এবং যে সাদৃশ্যজ্ঞান পাওয়া যায় তা শুধুমাত্র অত্যন্ত দক্ষ ও শিক্ষিত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

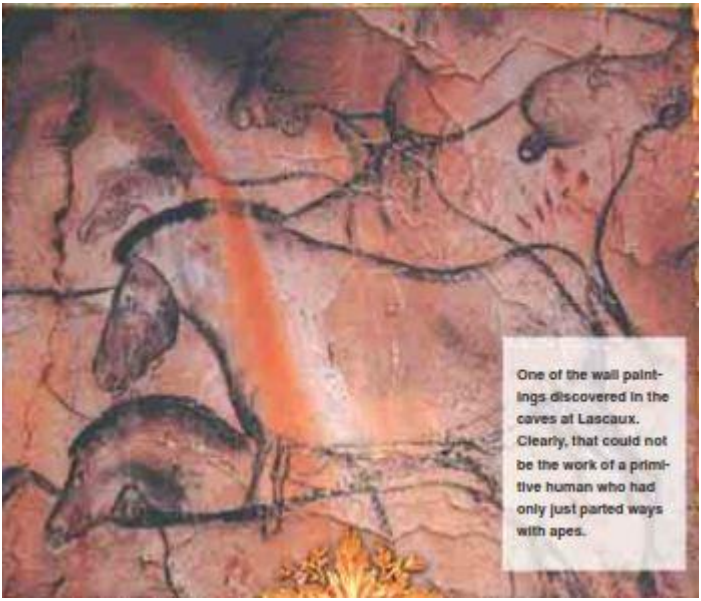

One of the wall paintings discovered in the caves at Lascaux. Clearly, that could not be the work of a primitive human who had only just parted ways with apes.

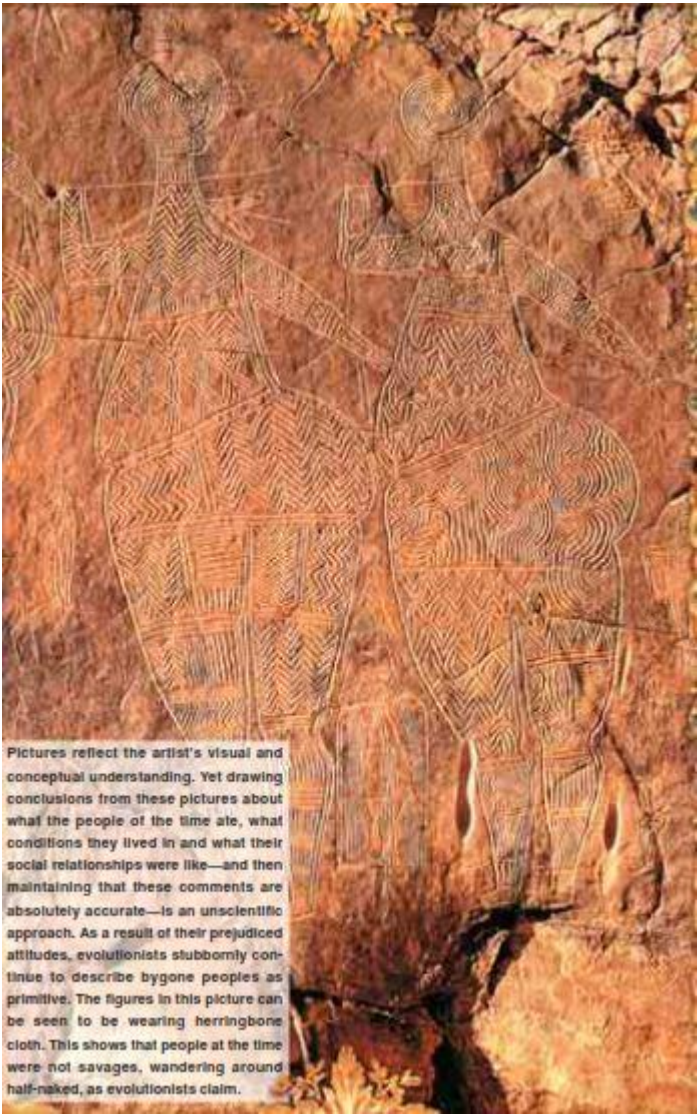

Pictures reflect the artist's visual and conceptual understanding. Yet drawing conclusions from these pictures about what the people of the time ate, what conditions they lived in and what their social relationships were like—and then maintaining that these comments are absolutely accurate—is an unscientific approach. As a result of their prejudiced attitudes, evolutionists stubbornly continue to describe bygone peoples as primitive. The figures in this picture can be seen to be wearing herringbone cloth. This shows that people at the time were not savages, wandering around half-naked, as evolutionists claim.

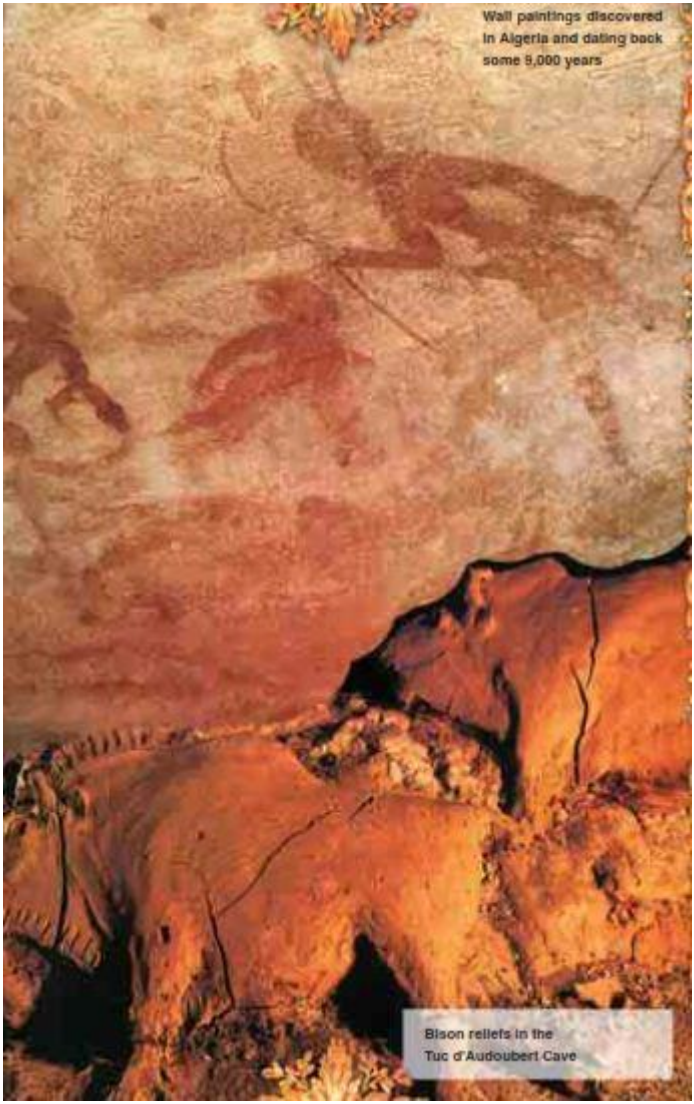

Wall paintings discovered in Algeria and dating back some 8,000 years

Bison reliefs in the Tuc d'Audoubert Cave

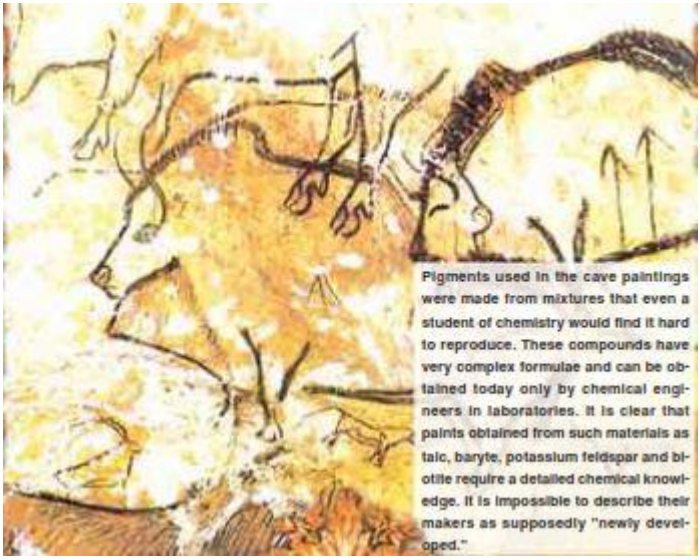

Pigments used in the cave paintings were made from mixtures that even a student of chemistry would find it hard to reproduce. These compounds have very complex formulae and can be obtained today only by chemical engineers in laboratories. It is clear that paints obtained from such materials as talc, baryte, potassium feldspar and biotite require a detailed chemical knowledge. It is impossible to describe their makers as supposedly "newly developed."

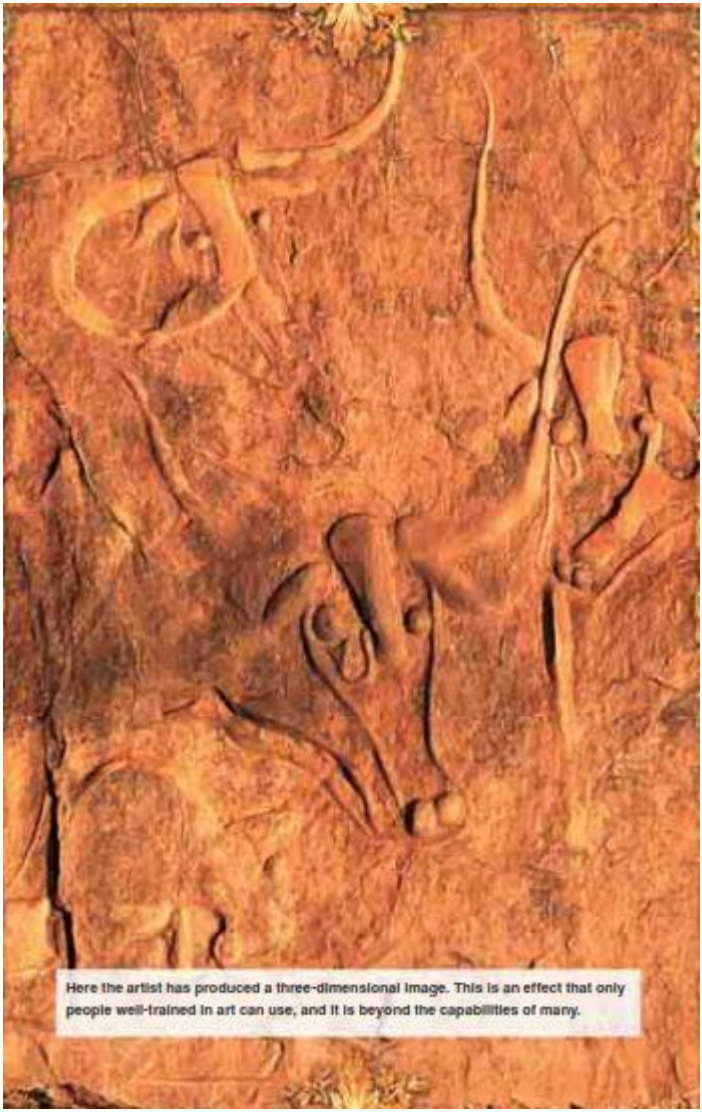

Here the artist has produced a three-dimensional image. This is an effect that only people well-trained in art can use, and it is beyond the capabilities of many.

The people who produced the cave paintings dating back as far as 35,000 BCE used paints containing such chemicals and substances as manganese oxide, iron oxide, iron hydroxide, and dentine (the inner part of the teeth in vertebrates, consisting of collagen and calcium). If you were to ask someone who had received no training in chemistry to reproduce any of the paints used in these pictures, they would not know which chemical to use, how to get hold of it, and which other substances needed to be mixed together with it. In addition, the people of the time were also well-informed about animal anatomy, as indicated by their making use of collagen and calcium powder from the teeth of vertebrates.

The horse at the bottom right is from one of the paintings in the Niaux Cave. Research has shown the painting to be some 11,000 years old. The close resemblance between this horse and those living in the region today is noteworthy in revealing the ability of the artist, who clearly had a highly developed artistic sense. That the paintings in question were made on cave walls is definitely no evidence that the artists lived primitive lives. There is a high probability that they used these walls as their canvas solely out of personal preference.

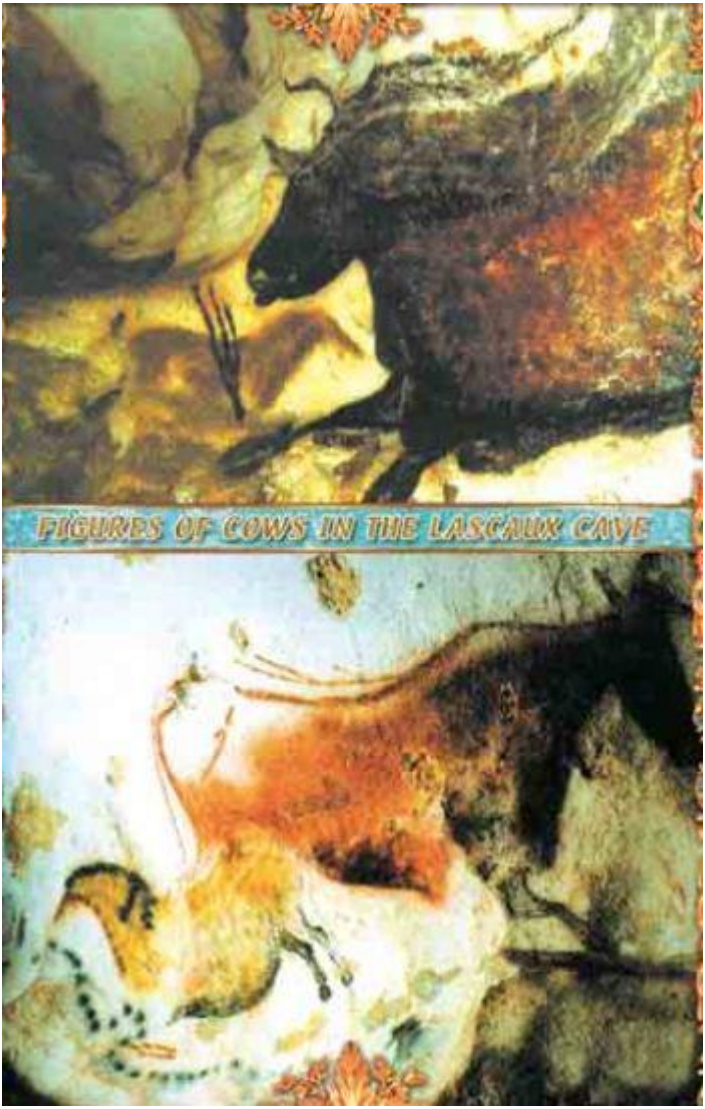
FIGURES OF COWS IN THE LASCAUX CAVE

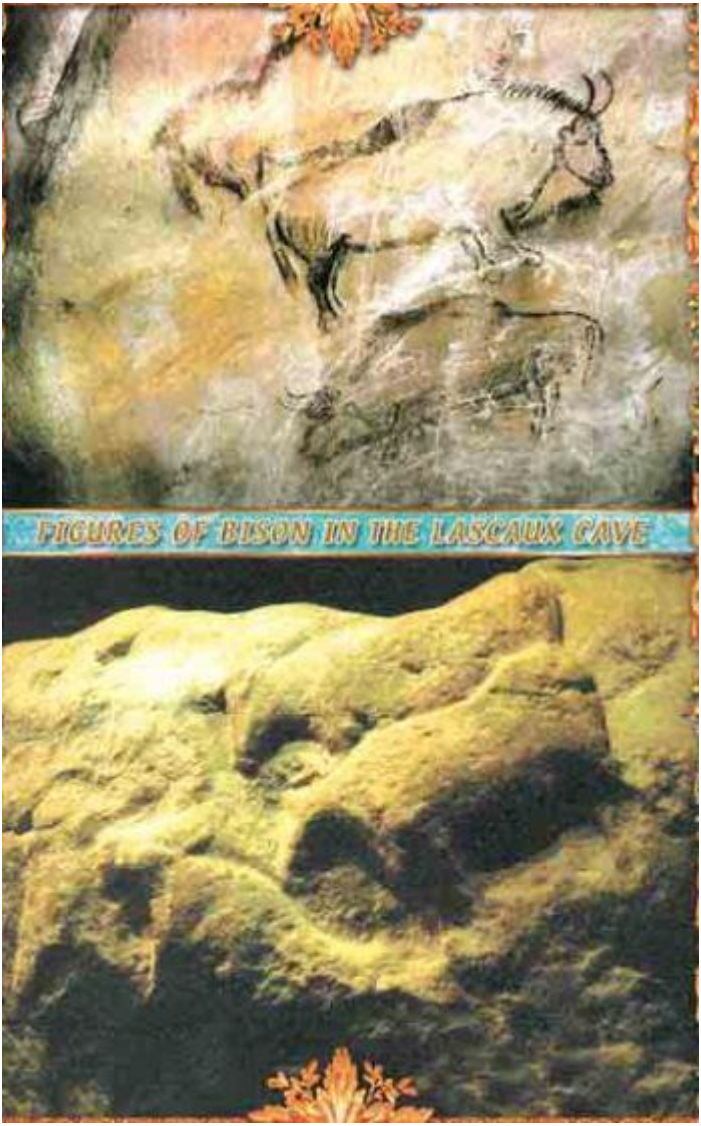
FIGURES OF BISON IN THE LASCAUX CAVE

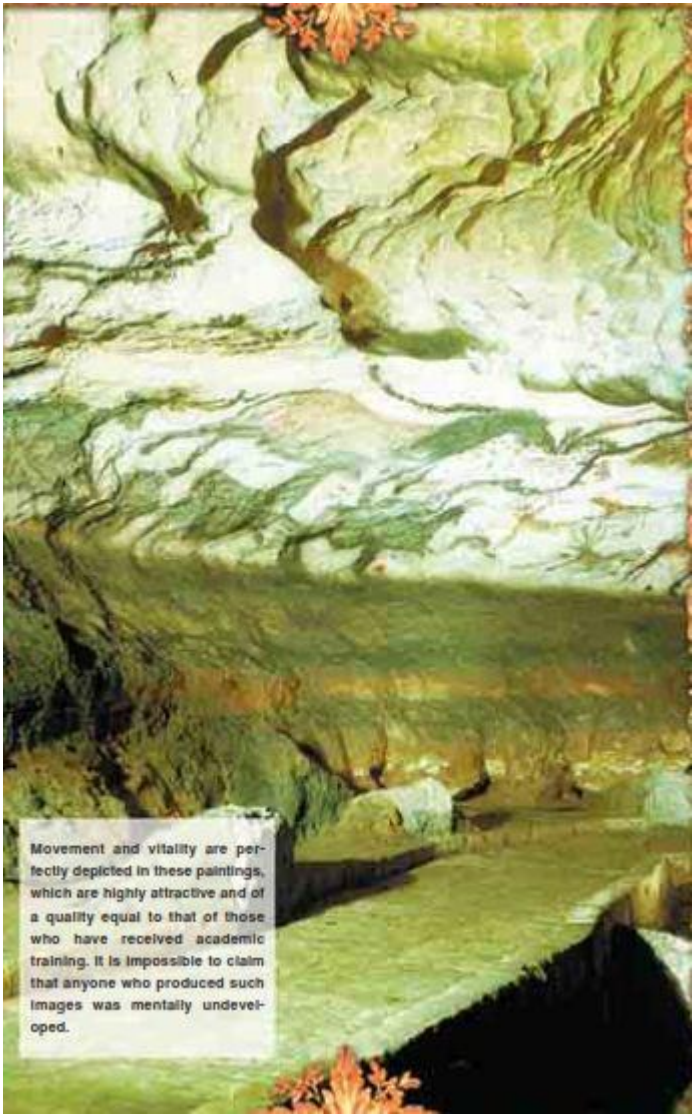
Movement and vitality are perfectly depicted in these paintings, which are highly attractive and of a quality equal to that of those who have received academic training. It is impossible to claim that anyone who produced such images was mentally undeveloped.

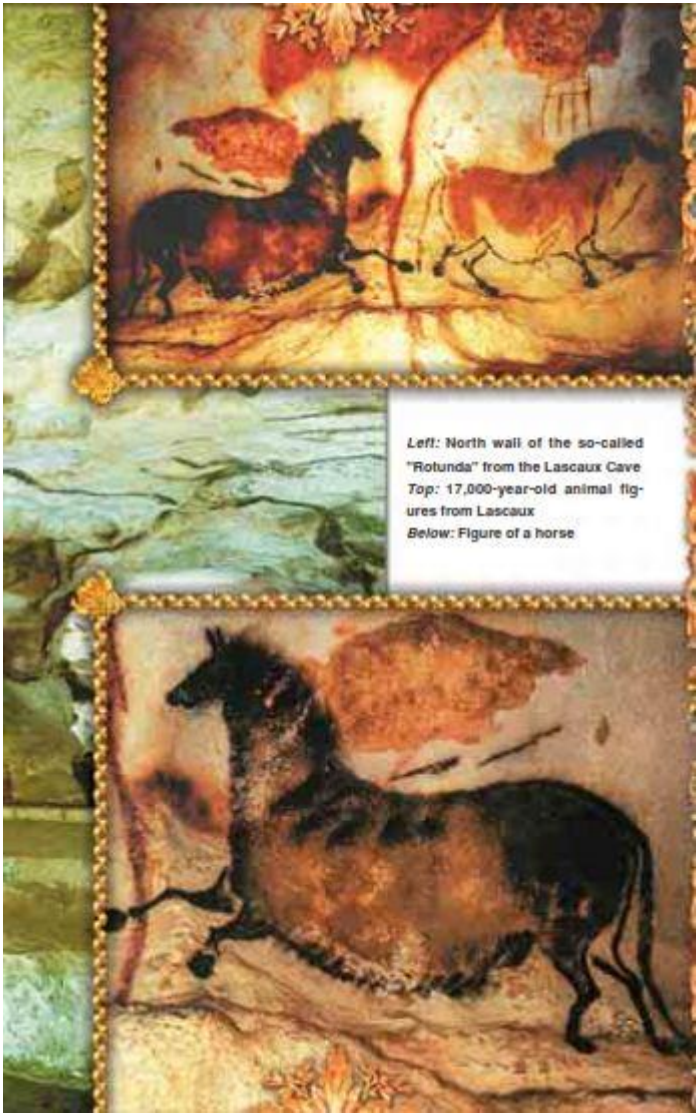

উপরের চিত্রগুলো আগের মানুষের, মানে মিলিয়ন বছর পুর্বের কিছু ওয়াল পেইন্টিং

তাই আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে কখনও প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহ যুগ, আদিম মানব, গুহা মানব বলতে কিছুই ছিলো না। মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে সেই অবস্থায়, যেমন এখন আছে।

বেদনাদায়ক ভারসাম্য ব্যবস্থা:

পূর্বেই বলেছি যে, ডারুইনবাদিদের একটি গুরত্বপুর্ণ দাবি হল, প্রকৃতিতে সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন হয় 'fight for survival' এর মধ্য দিয়ে। তার মানে শক্তিশালীরা সবসময় দুর্বলের উপর বিজয়ী হয় আর এর ফলেই সম্ভব হয় উন্নতি।

সামাজিক ডারউইনিজম অনুসারে যারা দুর্বল, গরীব, অসুস্থ এবং পশ্চাদপদ তাদের কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন না করে ধ্বংস করে দিতে হবে।

এ ব্যাপারে ডারউইন থমাস ম্যালথাসের বই An Essay on the Principle of Population থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি গণনা করেছিলেন যে মানবজাতিকে তার নিজের উপর ছেড়ে

দিলে এরা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, প্রতি ২৫ বছরে সংখ্যা দ্বিগুন হতে থাকবে। কিন্ত খাদ্য সরবরাহ কোন ভাবেই সে হারে বাড়বে না। তাই কিছু মানুষকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন অপর কিছু মানুষের মৃত্যু।

ডারউইন ঘোষনা করেন যে, ম্যালথাসের বই থেকে প্রাভাবিত হয়েই তিনি 'বাঁচার জন্য সংগ্রামের' ধারণা প্রদান করেন।

বংশবৃদ্ধি করতে থাকলে ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী মানবজাতির আবির্ভাব হবে এরুপ ডারউইনবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে হিটলার ইউজেনিক্সের নীতি অবলম্বন করে যেখানে পঙ্গু ও মানিসিক ভারসাম্যহীনদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই নীতির ফলে ইউরোপিয়ান সাদা চামড়ার লোকেরা আফ্রিকান নিগ্রো, রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিদেরকে পশ্চাদপদ বা অনগ্রসর আখ্যায়িত করে এবং তাদের সাথে পশুর মত আচরণ করা হয়।

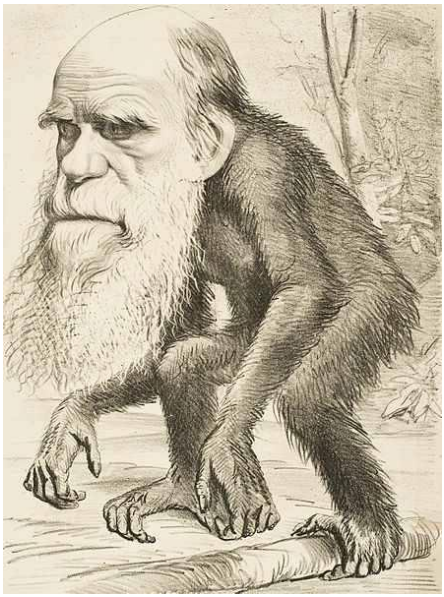

একজন ব্রিটিশ কার্টুনিস্টের আঁকা ডারউইন

তাই আমরা বলতে পারি, ডারউইনবাদিদের প্রচারণার ফলে যখন মনে করা হয় মানুষ কোন জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন তখন মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। এমনকি ধর্মকে আফিম পর্যন্ত বলা হয়।

তাই ডারউইনবাদের প্রবর্তনের ফলে মানুষে মানুষে হানা হানি বৃদ্ধি পায়, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়, মানুষের মধ্য হতে দয়া অনুগ্রহ ও সহানুভূতি হ্রাস পায় এবং মানুষের নৈতিকতার চরম অধঃপতন ঘটে।

বস্তুত নৈতিক বাধাবন্ধন ও বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা ও প্রবণতাই হলো ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করার মূল কারন। আর বিবর্তনবাদ দর্শনে বিশ্বাসীদের যারা ইতর ও হীন জীবজন্তুর বংশধর বলে মনে করে কোন নৈতিকতাই তাদের থাকতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সচেতন চিন্তাভাবনা এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলেছে যে, প্রতিটি প্রাণহীন বস্তু ও প্রতিটি জীবকেই সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভারসাম্যপুর্ণভাবে। অকাট্য ও ক্ষুতবিহীন পরিকল্পনার মাধ্যমে।

তাই আমাদের উচিত সেই সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। যিনি আমাদের অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আর এজন্য মহান আল্লাহ প্রেরিত ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত মুজিজা কুরআন তো আছেই। সাথে আছে আল্লাহর রাসুলের (সঃ) হাদীস।

তাই আজ,

আর ঘোষণা করে দাও, ''সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা''। (সুরা বনী ইস্রাইল: ৮১)

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা – ১ : প্রাণের উৎপত্তি

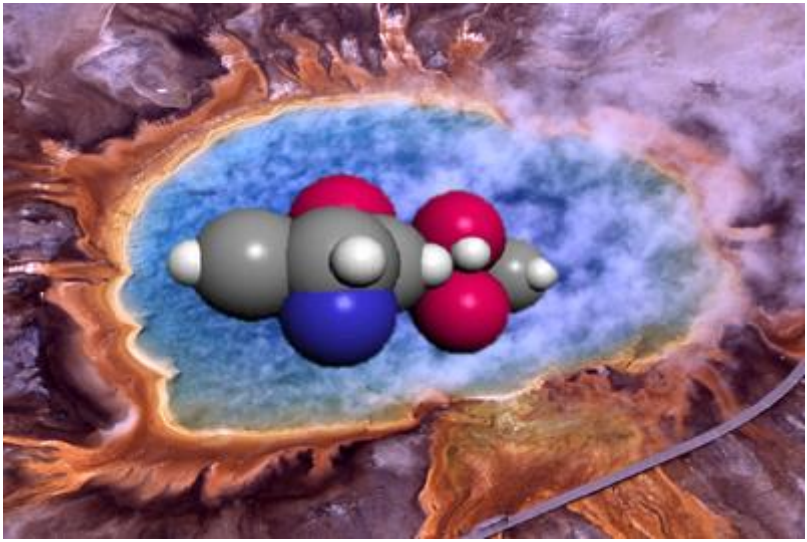

বিবর্তনবাদ সমর্থকদের বেশিরভাগেরই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বা স্বচ্ছ ধারণা নেই। এখানে আমরা বিবর্তনবাদের মূল অসংগতিগুলো তুলে ধরবো। বিবর্তনবাদের মূল অসংগতি হল প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে। বিবর্তনবাদীরা বলে থাকেন যে, বর্তমানকালের সকল জীবজন্তুই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকল জীবজন্তুই একটি নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষ বা COMMON ANCESTOR থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ক্রমধারায় বর্তমানের এই পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু তারা কখনোই একটি ব্যাপারের সমাধান দিতে সক্ষম হননি। আর সেটা হল প্রাণের উৎপত্তি কী করে হয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে নিজে নিজে হতে পারে সে সম্পর্কে গত দেড়শ বছরে অসংখ্য থিওরি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার কোনটাই এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত নয়। এমনকি যারা প্রাণের উৎপত্তির ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মতামতের মধ্যেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। বিবর্তনবাদের পক্ষের মানুষদেরকে প্রাণের উৎপত্তির এই অসংগতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা প্রাণের উৎপত্তির (ABIOGENESIS) সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করে বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চায়। তারা বলে যে ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদে প্রাণের

উৎপত্তির তেমন কোন কথা-ই উল্লেখ করেননি। তাদের কথা আংশিক সঠিক। ডারউইন তাঁর প্রণীত বিবর্তনবাদের মধ্যে প্রাণের উৎপত্তির সম্পর্কে তেমন কোন বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। কারণ, একটা নতুন তত্ত্বের জন্ম দেওয়ার ফলে এটা নিয়েই গবেষণা করে তাঁর সকল সময় পার হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের উৎপত্তির মত এতো সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর কোথায় ছিল? আর তাছাড়াও তাঁর সময়ে এটাই ধারণা করা হত যে, প্রাণের উৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে। একে বলা হয় স্পন্টেনিয়াস জেনারেসন (Spontaneous Generation)। প্রমাণ হিসেবে দেখানো হত যে, মাংস খোলা জায়গায় রেখে দিলে সেখান থেকে কিছুদিন পরে মাছির লার্ভা উৎপন্ন হয়, কাদা থেকে ব্যাঙ উৎপন্ন হয়, বদ্ধ বাক্সে পুরুষের ঘামে ভেজা কাপড় ও কিছু ধান/গম রেখে দিলে তা থেকে ইঁদুর উৎপন্ন হয়। এছাড়াও আরও অনেক হাস্যকর উদাহরণ তখনকার সময়ে দেওয়া হত। আর এই কারণেই ডারউইন বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে তেমন কোন চিন্তা করেননি। কারণ তাঁর জানা মতে প্রাণ তো নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে!

তবে ডারউইন প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা না দিলেও তিনি এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল স্থলভাগের কোন এক ছোট্ট উষ্ণ জলাশয়ে।

প্রাণের উৎপত্তির সাথে যদি বিবর্তনবাদের কোন সম্পর্ক না-ই থাকতো তাহলে ডারউইন কখনই প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাব্য উৎস নিয়ে মন্তব্য করতে যেতেন না।

ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বইটি লেখার ৫ বছর পরই জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধকের আবিষ্কারক বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হবার এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেন। যাই হোক, পরবর্তীতে ডারউইনের অনুসারীরা অর্থাৎ বিবর্তনবাদের পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা মূলত বিবর্তনবাদকে ভালোভাবে দাঁড় করানোর জন্য এবং ব্যাখ্যা করার জন্যই ABIOGENESIS নামক বিজ্ঞানের এই শাখাটি সৃষ্টি করেন।

"Evolutionists belive that life on earth has evolved progressively over thousands of millions of years, originally from none living materials".[1]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তনবাদীরা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কেও চিন্তা করে এবং তাদের কথা অনুসারে প্রাণের বিবর্তন শুরু হয়েছে প্রাণহীন বা জড় বস্তু থেকে। তবে এখানে এটাও বলা হয়েছে যে, অনেকেই মনে করেন সকল প্রাণীদের বর্তমানে যেভাবে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির শুরুর দিকেও তারা এইরূপেই অথবা কাছাকাছি রূপে বিদ্যমান ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যারা দাবী করে বিবর্তনবাদের সাথে প্রাণের উৎপত্তির কোন সম্পর্ক নেই, তারা আসলে না বুঝে ভুল দাবী করছে। কারন, বিবর্তনবাদের সাথে যদি প্রাণের উৎপত্তির কোন সম্পর্ক নাই থাকতো তাহলে একটি এনসাইক্লোপিডিয়াতে এভাবে ক্রিয়েশন থিওরি নামে কোন লেখা থাকতো না অথবা বিবর্তনবাদীরা যে প্রাণের উৎপত্তি জড় বস্তু থেকে হয়েছে এই বিশ্বাস করে এটাও দেওয়া থাকতো না। মূলত প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তনবাদ একটি আর একটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়াও জড় বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টির যে ঘটনাটির কথা বলা হয় সেটিও এক ধরণের বিবর্তন। ABIOGENESIS-এ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণ সৃষ্টি হবার যে ঘটনাটি কল্পনা করা হচ্ছে সেটি আসলে মূলত রাসায়নিক বিবর্তন (CHEMICAL EVOLUTION).

এছাড়াও, বিবর্তনবাদের মূল থিওরিটি দাড়িয়ে আছে আসলে প্রথম কোষের উপরে! বিবর্তনবাদ অনুসারে প্রথমে একটি কোষের উদ্ভব কোন না কোনভাবে হয়ে গিয়েছিল। এই উদ্ভবের পরে আস্তে আস্তে সেখান থেকেই বিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু সমস্যা হল যে, সেই কাল্পনিক কোষের অস্তিত্বের পক্ষে আজ পর্যন্ত কোন প্রমান দেওয়া সম্ভব হয়নি। যদি এই প্রথম কোষের কোন অস্তিত্বই না থাকে, যদি প্রথম কোষ বলে কিছুই না থাকে এবং এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে শুরুর দিকে এক বা একাধিক বহুকোষী জীব বিদ্যমান ছিল তাহলে বিবর্তবাদ কোন অবস্থানে এসে দাঁড়াবে?

বর্তমানে বিবর্তনবাদই হল বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিতর্কিত শাখা। এটি বিজ্ঞানের সবচেয়ে ধোঁয়াটে এবং অস্থিতিশীল অংশ। যখনই কোন নতুন ফসিল আবিষ্কৃত হয় তখনই

[1] Illustrated family encyclopedia : evolution: creation theories, page – 319. (first published in great briten in 1997 as millennium family encyclopedia , reprint – 2008)

বিবর্তনবাদের মধ্যে নতুন করে একটি পরিবর্তন আসে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন করে একটি তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পুরানো অনেক ধারণাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। অনেক সময় খুব সাধারণ একটি আবিষ্কার থেকেই আবার বিবর্তনবাদের মাঝে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। মাঝে মাঝেই আবার ভুল থিওরি এবং জাল ফসিলও বের হয়।

যাই হোক, এবার আমি শুরু থেকে শুরু করি! অর্থাৎ প্রাণের উৎপত্তি থেকে। আমাদের আগের রেফারেন্সেটিতে আমরা দেখেছি যে, বিবর্তনবাদীরা ধারণা করে জড় বস্তু হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থাৎ নিজে নিজেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাটি অর্থাৎ জড় বস্তু হতে প্রাণ সৃষ্টি হবার ঘটনাটি এখন পর্যন্ত অন্তত কোথাও কেউ দেখেনি বা লক্ষ্য করেনি নিজে নিজে হওয়া তো দূরের কথা।

জীববিজ্ঞানীরাও বলছেন যে, জড় বস্তু হতে প্রাণ সৃষ্টির ঘটনা এখনও পর্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। প্রিন্সিপাল অফ বায়োজেনেসিস (The Principle of Biogenesis) বলে যে, প্রাণ শুধুমাত্র প্রাণ থেকেই আসে।

এক্ষেত্রে বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বলেন –
CAN MATTER ORGANIZE ITSELF? NO! TODAY THERE IS NO CIRCUMSTANCE KNOWN UNDER WHICH ONE COULD AFIRM THAT MICROSCOPIC BEINGS HAVE COME INTO THE WORLD WITHOUT PARENTS RESEMBLING THEMSELVES.[2]

অনুবাদ: পদার্থ কি নিজে নিজেকে সাজাতে পারে? না পারে না! বর্তমানে এমন কোন ঘটনার কথা জানা যায়নি যাতে করে এমনটা প্রমাণ করা যায় যে, ক্ষুদ্র অণুজীবেরা নিজেদের সাথে মিল সম্পন্ন পূর্বপুরুষ ছাড়া এই পৃথিবীতে এসেছে।

এছাড়াও আলেক্সাণ্ডার ওপারিন নামের এক বিবর্তনবাদি বিজ্ঞানী স্বয়ং বলেছেন –
UNFORTUNATELY, **THE ORIGIN OF THE CELL** REMAINS A QUESTION THAT IS ACTUALLY THE MURKIEST ASPECT OF **THE WHOLE THEORY OF EVOLUTION**.[3]

[2] LOUIS PASTEUR , FOX & DOSE, ORIGIN OF LIFE, PAGE. – 4-5

[3] ALEXANDER OPARIN (ORIGIN OF LIFE P. – 196)

অনুবাদ: দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোষের উৎস এখনও পর্যন্ত একটি প্রশ্ন হয়ে রয়েছে যা আসলে সমস্ত বিবর্তনবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আরও একজন বিবর্তনবাদের সমর্থক জেফরি বেটা (যিনি একজন জিওকেমিসট) বলেছেন – TODAY, AS WE LEAVE THE 20TH CENTURY, WE STILL FACE THE BIGGEST PROBLEM THAT WE HAD WHEN WE ENTERED THE 20TH CENTURY : **HOW DID LIFE ORIGINATE ON EARTH?**[4]

অনুবাদ: আজ আমরা এই বিংশ শতাব্দী থেকে বের হয়ে যাওয়ার লগ্নে এখনও সেই বিশাল সমস্যার মুখোমুখি হয়ে রয়েছি যে সমস্যা বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের সময়ও ছিল, আর সেটা হল – পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হল?

২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জীববিজ্ঞানী জে ক্রেইগ ভেনটার (Craig Venter) যিনি কৃত্রিম প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন বলে দাবী করেছেন, তিনিও দাবী করতে পারবেন না যে, তিনি জড় বস্তু হতে প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে তার এই কাজকে প্রাণ সৃষ্টি হিসেবে বলা যায় না বরং তার কাজকে এক প্রকারের সফল ও উন্নতমানের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

আসুন আমরা দেখি ক্রেইগ ভেন্টার ও তার দল কী করলেন-

তারা একটি অলরেডি ‘লিভিং’ ব্যাকিটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, মাইকয়েড -এর কোষের নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল -এর ডাটা কালেক্ট করলেন। এবং সে অনুসারে (স্পেসিফিক পদ্ধতিতে) নিউক্লিউটাইড ক্যাসেট তৈরী করলেন। ইস্টের মাধ্যমে, ইস্টের অলরেডি বিল্ট ইন এসেমব্লি সিস্টেম ব্যাবহার করে তাদেরকে এসেম্বল করলেন। এরপর সেই জিনোমটিকে 'অলরেডি লিভিং' ব্যাকটেরিয়া মাইকোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকোলাম এর মধ্যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করলেন। তবে তার আগে তারা একটি বুদ্ধি খাটালেন। তারা ক্যাপ্রিকোলাম এর নিজস্ব ‘ রেস্ট্রিকশন এনজাইম’ এর জিনটাকে নক আউট করলেন। কেননা তারা জানতেন যে, ব্যাকটেরিয়ার একটি বুদ্ধি

[4] EARTH , FEBRUARY 1998

আছে। তারা অন্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ঢোকালে সেটাকে তাদের রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দিয়ে কেটে হজম করে ফেলে।

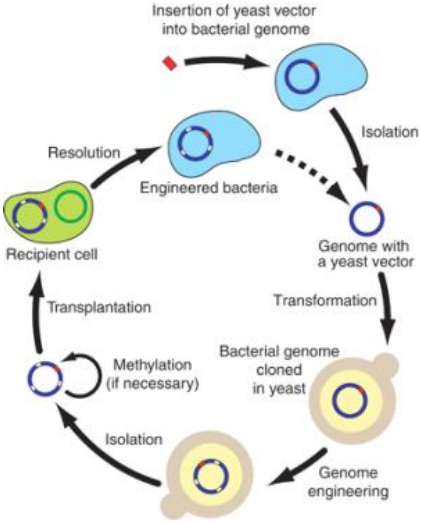

এরপর যখন ঐ তথাকথিত 'সিনথেটিক ডিএনএ'-কে প্রবেশ করালেন, তখন উক্ত ব্যাকটেরিয়া কোন প্রকার কথা না বলার সুযোগ পেয়ে সেটাকে নিজের করে নিল। কেননা কথা বলার ব্যবস্থাতো আগেই বুদ্ধি করে দূর করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল- তারা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নিউক্লিউটাইড-কে ঢোকালেন কিভাবে? আমার জানা মতে নিউক্লিয়িক এসিড দুভাবে ঢুকতে পারে। এক, যদি কোন 'ফায' ভাইরাস ব্যাকেটেরিয়াকে আক্রমণ করে নিজের জেনেটিক মেটেরিয়ালকে ব্যাকটেরিয়ার মেটেরিয়ালের সাথে যুক্ত করে লাইসোজেনিক phase এ চলে যায়। দুই, যদি ব্যাকটেরিয়ার বিল্ট ইন 'ট্রান্সফরমেশন' প্রসেস দ্বারা 'নির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত মেইনটেইন করা পরিবেশে' দ্রবনের নিউক্লিয়িক এসিডকে আপন করে নেয়।

চলুন, আমরা দেখি এরপর কী হল। ব্যাকটেরিয়া তার 'নিজস্ব' পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আরএনএ পলিমারেজ ব্যবহার করে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরী করল। এরপর সেই মেসেঞ্জার আরএনএ উক্ত ব্যাকটেরিয়ার 'নিজস্ব' রাইবোজম এর সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষ করল। এখন উক্ত সংশ্লেষিত প্রোটিন কিন্তু মাইকোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকুলাম এর নয় বরং মাইকোপ্লাজমা মাইকয়েড এর প্রোটিন। (কারণ জিনগুলোত মাইকয়েডেরই) সুতরাং এর যে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ তা 'রিসেপটর ব্যাকটেরিয়া' মাইকোপ্লাজমা ক্যাপ্রিকোলাম এর ডিএনএ কে ফরেইন মনে করে কেটে ফেলল। এবং তৈরী হল তথাকথিক 'কৃত্রিম কোষ'।

পুরো প্রসেসটা করল একদল 'ইন্টেলিজেন্ট সায়েন্টিস্ট'। পুরো প্রসেসটাকেই জ্ঞানের আলোকে অলরেডি 'জীবিত' ইস্ট ও ব্যাকেটেরিয়ার মধ্যে করা হল, তাদেরই বিল্ট ইন সিস্টেম ব্যাবহার করে। একটি Successful transplantation এর মাধ্যমে আমরা একটি

Successful Genetic Engineering দেখতে পেলাম। এ ব্যাপারে নিচের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

Dr Peter Dearden, Director of Genetics Otago comments:

"This paper represents a very significant step forward in engineering life. Venter's group have been able to put a fully synthetic genome into a bacterial cell and get it to act as that cell's genome. The technical skill required to get this to work is immense, and is the culmination of a long series of experiments that pioneered the technology to do this, as well as developing ways to prove that it had been done."

"The experiment raises an interesting question, has Venter and his team created life? The answer is NO. Venter's team is relying on the information in a natural genome. While the DNA strand that makes up the genome is synthetic and made in the lab, the information it contains comes from a species of bacterium; and it is the information that is important in a genome. Also Venter's team needs a bacterial cell, one without a genome, to put their synthetic genome into. This cell, currently, can only be made by a living organism."

"However, while Venter and his team haven't created life, they have carried out a remarkable feat, and put us one further step on the road to completely re-engineering organisms for biotechnological purposes."

এবং আমরা আবারও এই সুনিয়ন্ত্রিত ইন্টেলিজেন্স এর ব্যাবহার দেখে মূল ইন্টেলিজেন্ট স্বত্ত্বা 'আল্লাহ' যিনি জীবিত ব্যাকটেরিয়ার প্রাণ দান করেছেন তার পরিচয় পেলাম। এবং জানতে পারলাম কিভাবে তিনি আমাদেরকে সকল সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন।

এছাড়াও এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে উক্ত বিজ্ঞানীরা 'মৃত ব্যাকটেরিয়া' ব্যাবহার করলেন না। আর পৃথক ভাবে Cell memberane, microtubules, DNA, RNA, Ribosome, DNA polymerase, RNA polymerase, Golgi appearatus, Endolplasmic reticulum

তৈরী করে তাদেরকে একত্রিত করে 'জীবিত' করা হলে যাকে আমরা 'কৃত্রিম প্রাণ' বলতে পারতাম তার ধরা-ছোয়ার কাছেও তো এই প্রাণকে যেতে দেখলাম না!

বাস্তবতা হচ্ছে এরকম, যেরকম হেনরি এম. মরিস (Henry M. Morris) উপসংহারে এসেছেন যে, আমাদের এমন কোন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার কথা জানা নেই যার দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে প্রাণের উদ্ভব হতে পারে।

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–২: কোষের জটিলতা-১ (ইউক্যারিওটিক কোষ)

এখানে আমি আলোকপাত করতে চাই জীবদেহের জটিলতার উপর। বর্তমান সময়ে যতো ধরনের জীবজন্তু রয়েছে সেটা হোক বহুকোষী, হোক ক্ষুদ্র পোকা বা হোক আদিম প্রকৃতির এককোষী জীব, সকল জীবের দৈহিক গঠনই অসম্ভব সূক্ষ্ম ও জটিল প্রকৃতির যন্ত্রের মতই জটিল। জীবজগতের জটিলতা স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব একটি কাজ যার ফলে আমি এখানে শুধু জীবদেহ গঠনের একক অর্থাৎ শুধুমাত্র কোষের গঠন নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে এমনকি কোষের গঠনও এত বিস্তারিত বর্ণনা করাটা সম্ভব নয়। তাই আমি এর প্রাথমিক গঠন আলোচনা করছি।

জীবদেহে নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ প্রধানত ২ প্রকার। সেগুলো হল –

ক) ইউক্যারিওটিক কোষ বা প্রকৃত কোষ
খ) প্রোক্যারিওটিক কোষ বা আদি কোষ।

আমরা প্রথমে ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ক) ইউক্যারিওটিক কোষ:

নিউক্লিয়াস সুগঠিত। সুগঠিত নিউক্লিয়ার আবরণী থাকে। ফলে নিউক্লিয়াসের পদার্থসমূহ অর্থাৎ ক্রোমাটিন জালিকা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিওপ্লাজম ইত্যাদি সাইটোপ্লাজমের সরাসরি সংস্পর্শে থাকে না। একটি ইউক্যারিওটিক কোষের ২ টি মূল অংশ থাকে:

১) প্লাজমালেমা বা প্লাজমামেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন বা প্লাজমাপর্দা বা কোষ আবরণী
২) প্রোটপ্লাজম

১) প্লাজমামেমব্রেন:

প্রতিটি জীবকোষই এক প্রকারের সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক স্থিতিস্থাপক, অর্ধভেদ্য, সজীব, পাতলা আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। একে বলে প্লাজমামেমব্রেন। বর্তমানে প্লাজমামেমব্রেন প্রচলিত মডেল হল ফ্লুইড মোজাইক মডেল।

ভৌত গঠন:

১) সেল মেমব্রেনটি দ্বিস্তরী, ২) প্রতি স্তরে প্রোটিন এবং লিপিড স্তর আছে, ৩) প্রতিটি ফসফোলিপিডে দুটি ফ্যাটি এসিড এবং একটি ফসফেট মাথা থাকে, ৪) উভয় স্তরের হাইড্রোকার্বন স্তর মুখোমুখি থাকে, ৫) মেমব্রেনের প্রোটিন অণুগুলো ফসফোলিপিড স্তরে মোজাইকের মত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে, ৬) প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদানসমূহ স্থির নয় বরং ফ্লুইডের মত পরিবর্তনশীল।

রাসায়নিক গঠন:

১) সেল মেমব্রেন-এ থাকে প্রোটিন, লিপিড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পলিস্যাকারাইড, RNA, DNA ইত্যাদিও থাকতে পারে, ২) সেল মেমব্রেনের মোট তিন ধরনের শুষ্ক উপাদানের ৭৫%-ই লিপিড। লিপিড প্রধানত ফসফোলিপিড হিসেবে থাকে, ৩) মেমব্রেনে তিন ধরনের প্রোটিন থাকে: ক) ইন্টিগ্রাল প্রোটিন, খ) পেরিফেরাল প্রোটিন ও গ) লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন।

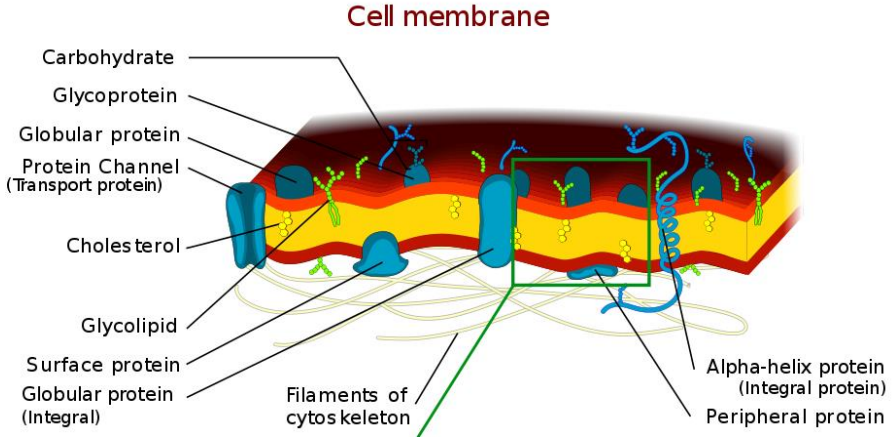

২) প্রোটপ্লাজম:

প্লাজমামেমব্রেন দ্বারা আবৃত, কোষের অর্ধসচ্ছ, দানাদার, বর্ণহীন, জেলির মত, সজীব বস্তু।

ভৌত গঠন:

ইউরসন, ফিসার, হার্টি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, "**প্রোটপ্লাজম এক ধরনের জটিল কলয়ডিয় তরল পদার্থ।**" প্রোটপ্লাজম বর্ণহীন, ঈষৎ সচ্ছ, ধূসর, সান্দ্র, ঘন, তরল পদার্থ।

রাসায়নিক গঠন:

প্রোটপ্লাজম বিভিন্ন জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। পদার্থগুলো দ্রবীভূত বা ভাসমান অবস্থায় থাকে। প্রধান জৈব বস্তুর মধ্যে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, চর্বি, নাইট্রোজেন যুক্ত পদার্থ ইত্যাদি থাকে। প্রোটপ্লাজমে সাধারনত ৭৫% পানি ও ২৫% অন্যান্য বস্তু থাকে। অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ৯০% জৈব পদার্থ ও ১০% অজৈব পদার্থ।

প্রোটপ্লাজমকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

i) সাইটোপ্লাজম
ii) নিউক্লিয়াস

i) সাইটোপ্লাসম:

প্রোটপ্লাজমের যে অংশ নিউক্লিয়াসের চারদিকে অবস্থান করে।

ভৌত গঠন:

আধুনিক বা কলয়েড মতবাদ অনুসারে সাইটোপ্লাসমের কিছু অংশ দ্রবন (SOLUTION) ও কিছু অংশ কলয়েড (COLLOIDAL) বা অর্ধতরল। দ্রবন আবার ২ টি অংশ নিয়ে গঠিত – একটি হল তরল বা জলীয় অংশ যাকে দ্রাবক (SOLVENT) বলে ও অপরটি হল রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গঠিত অংশ যাকে দ্রাব (SOLUTE) বলে। কলয়েড আবার ২ টি অংশ নিয়ে গঠিত – তরল দশা (LIQUID PHASE) ও বিক্ষিপ্ত দশা (DISPRESED PHASE)। সাইটোপ্লাজম আবার ২ টি অংশে বিভক্ত–

ক) একটোপ্লাজম ও খ) এন্ডোপ্লাসম

ক) একটোপ্লাজম:

সাইটোপ্লাজমের এই অংশ প্লাজমালেমার গা ঘেঁসে অবস্থান করে। এটি দানাহীন, সচ্ছ এবং অনড়। একটোপ্লাজম এর ভিতরের দিকে অবস্থিত এনডোপ্লাজমকে ধারন করে।

খ) এনডোপ্লাজম:

একটোপ্লাজমের ভিতরের দিকে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমের দানাদার, অস্বচ্ছ অংশটিকে এনডোপ্লাজম বলে। এনডোপ্লাজমে নিউক্লিয়াস, মাইটোকনড্রিয়া, গলজি বডি, রাইবোসোম, লাইসোসোম, আন্তঃপ্লাজমিয় জালিকা, সেন্ট্রিওল ইত্যাদি কোষ অঙ্গানু থাকে। এছাড়াও এনডোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরনেরর গহ্বর, তৈলবিন্দু, খাদ্যসার, বর্জ্যপদার্থ ইত্যাদি কোষীয় পদার্থও থাকে।

রাসায়নিক গঠন:

অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন এবং লোহা -এগুলো হল সাইটোপ্লাসমের মেজর বা ম্যাক্রো বা প্রধান উপাদান। এছাড়াও কিছু মাইক্রো বা ট্রেস বা অপ্রধান উপাদান আছে- কপার, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, বোরন, সিলিকন ইত্যাদি।

ii) নিউক্লিয়াস:

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সর্বাপেক্ষা ঘন ও বিশেষ গুণসম্পন্ন গোলাকার অংশ। এটি আবার এক ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুও।

ভৌত গঠন:

নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ আছে–

ক) **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন,**
খ) **নিউক্লিওপ্লাসম,**
গ) **নিউক্লিওলাস** এবং
ঘ) **ক্রোমাটিন তন্তু বা জালিকা।**

রাসায়নিক গঠন:

DNA ও RNA, প্রোটিন (নিউক্লিওপ্রোটামিন, নিউক্লিওহিস্টোন, ননহিস্টোন, নিউক্লিয়ার এনজাইম ইত্যাদি) এবং কয়েক প্রকার খনিজ লবণ (ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম) নিয়ে গঠিত।

ক) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন:

নিউক্লিয়াস যে সচ্ছ অর্ধভেদ্য কোমল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাই নিউক্লিয়ার মেমব্রেন।

গঠন: অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট দ্বিস্তরী পর্দা। এই পর্দা লাইপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। কোষ বিভাজনের সময় এর বিলুপ্তি ঘটে। ছিদ্রগুলো ৮টি সংকোচনশীল কণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

খ) নিউক্লিওপ্লাজম:

নিউক্লিয়াসের মধ্যকার দানাদার স্বচ্ছ, সমসত্ত্ব, তরল জাতীয় পদার্থ।

গঠন: এতে নিউক্লিওপ্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, খনিজ লবণ ইত্যাদি থাকে।

গ) নিউক্লিওলাস:

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ঘন গোলাকার বস্তু।

গঠন: প্রোটিন, লিপিড, DNA ও RNA, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

ঘ) ক্রোমাটিন তন্তু বা জালিকা:

নিউক্লিওপ্লাজমের অভ্যন্তরস্থ সুতার মত বস্তুর জাল। এদের এক একটি খণ্ডকে ক্রোমোজোম বলে।

গঠন: DNA, RNA, হিসটোন ও নন-হিসটোন আমিষ দ্বারা গঠিত। এতে DNA ও হিসটোনের পরিমাণ প্রায় ৩৫% – ৫৫%।

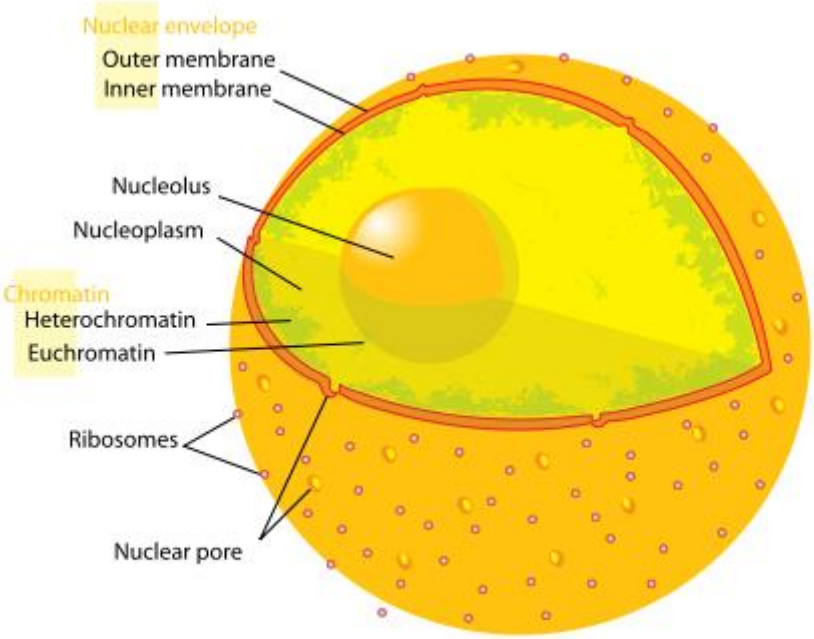

1. নিউক্লিয়াস

মাইটোকন্ড্রিয়া:

কোষীয় অঙ্গাণু যা হল কোষের জৈবিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস।

ভৌত গঠন: লিপিড ও প্রোটিন নির্মিত মসৃণ আবরণী দ্বারা বেষ্টিত। ভেতরের অংশে ক্রিস্টি নামের কতোগুলো আঙ্গুলের মত প্রবর্ধক আছে। ক্রিস্টির গায়ে থাকে কতোগুলো গোল গোল অক্সিসোম বর্তমানে যার নাম ভিন্ন কিছু। মাইটোকন্ড্রিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আছে দানাদার ম্যাট্রিক্স যাতে থাকে রাইবোসোম, ফসফেট দানা ও বৃত্তাকার DNA।

রাসায়নিক গঠন: প্রোটিন ৬০% – ৭০%, লিপিড ২৫% – ৩৫%, RNA ০.৫%, সামান্য DNA ও প্রায় ৭০ প্রকার এনজাইম ও কো-এনজাইম থাকে।

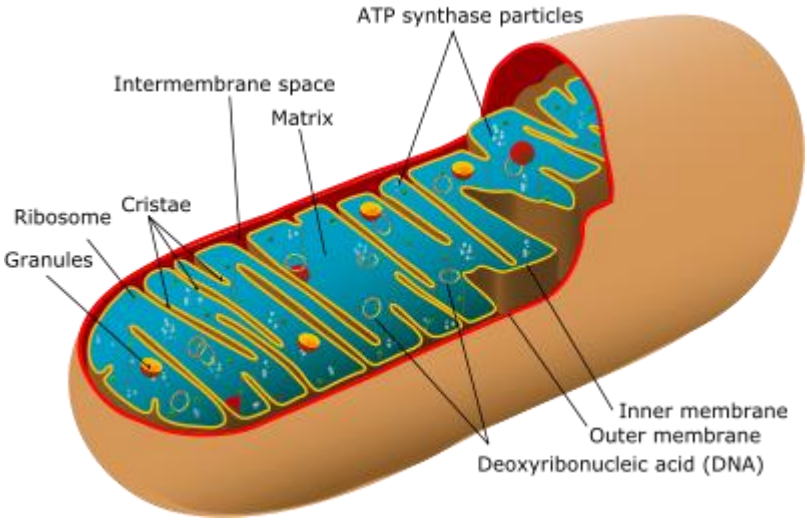

2. নিচে মাইটোকনড্রিয়ার চিত্র দেওয়া হল

এখানে ইউক্যারিওটিক কোষের সমস্ত অংশের বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর যেটুকু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটুকুও শুধুমাত্র প্রাথমিক গঠন। চার্লস ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে, একটিমাত্র কোষ থেকে সকল জীব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। কারন তাদের ধারণা ছিল কোষ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু উপরে দেওয়া কোষের প্রাথমিক গঠনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় কোষের গঠন মোটেও সরল কিছু নয়। বরং এটি এতই জটিল যে, একটি কোষ হঠাৎ করে অন্ধ প্রক্রিয়া দ্বারা তৈরি হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তাই বিবর্তনবাদীরা পরবর্তীতে নতুন করে থিওরি দেন যে, প্রোক্যারিওটিক কোষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ইউক্যারিওটিক কোষের উদ্ভব হয়। যেহেতু প্রোক্যারিওটিক কোষ ইউক্যারিওটিক কোষের তুলনায় অনেক সরল। কিন্তু একটি ইউক্যারিওটিক কোষের সত্যিকারের জটিলতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি এতোই জটিল যার সামনে মানুষের তৈরি সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের জটিলতাও তুচ্ছ। এমন এক ধরনের জটিল

গঠনের উদ্ভব হয়েছে বিবর্তনের মত একটি অন্ধ প্রক্রিয়া দ্বারা -এটি একটি অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য কথা!

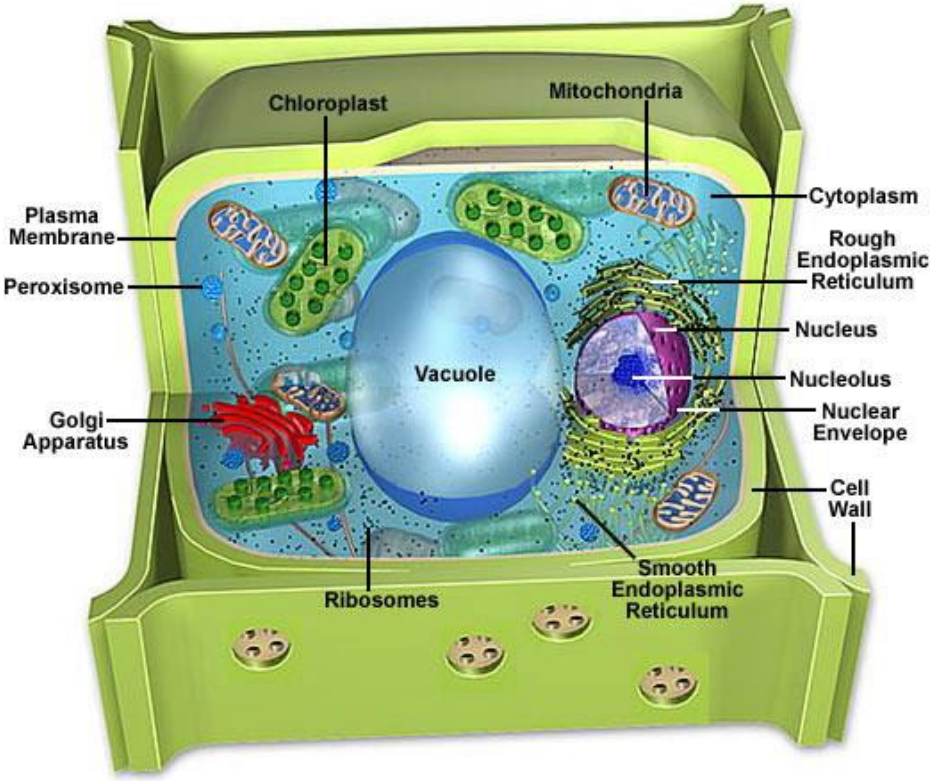

3. পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদকোষ

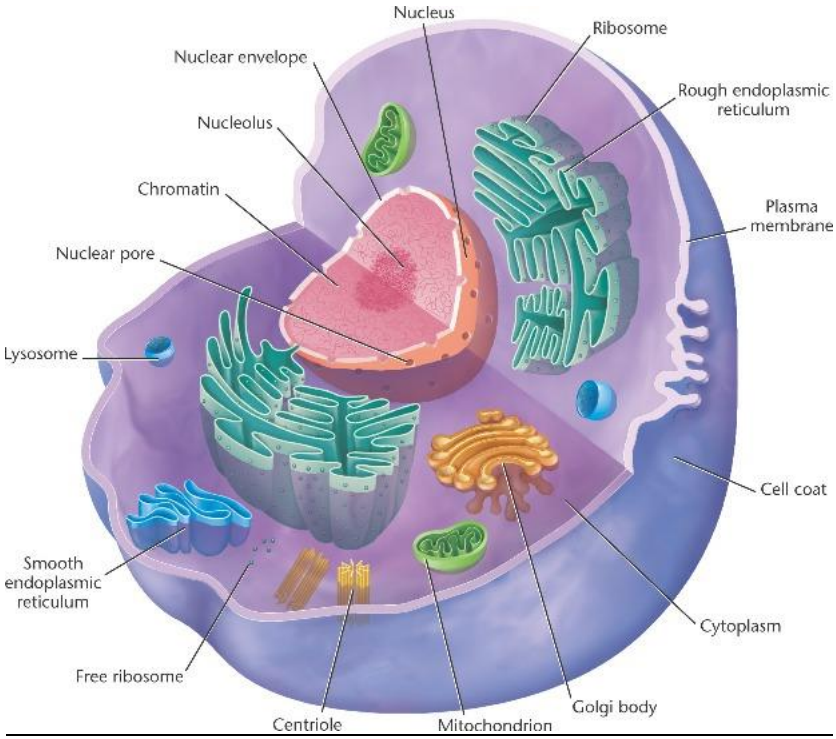

***4**. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীকোষ*

উপরের চিত্রগুলোতে কোষের জটিলতা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই আমি কোষের জটিলতা সম্পর্কিত এই ভিডিও লিংকটিও দিচ্ছি। চাইলে দেখতে পারেন: কোষের অসম্ভব জটিলতা!

যাই হোক, পরবর্তী অংশে প্রোক্যারিওটিক কোষের গঠনের বর্ণনা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে- প্রোক্যারিওটিক কোষের থেকে অন্ধ জৈবিক বিবর্তন শুরুর যে কল্পনা করা হয়েছে তা কতটুকু সম্ভব।

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৩: কোষের জটিলতা – ২
(প্রোক্যারিওটিক কোষ)

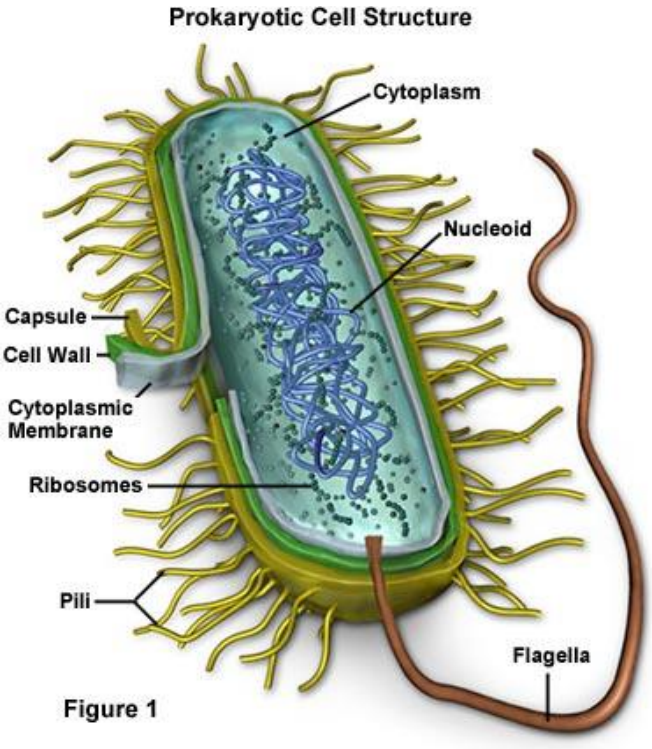

একটি আদর্শ প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটেরিয়া

পূর্বের অংশে ইউক্যারিওটিক কোষের একটি সরল ও প্রাথমিক গঠনের বর্ণনা দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে, সৃষ্টির শুরুর দিকে কোন ধরনের বহিঃহস্তক্ষেপ ছাড়া এই ধরনের কোষের উৎপত্তি হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব একটি ব্যাপার। এমনকি ধাপে ধাপেও যে এই ধরনের কোন কাঠামো বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া হতে পারে সেটাও কিছুটা অবাস্তব লাগে যদি একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়। তবে বিবর্তনবাদ অনুসারে যেহেতু প্রাণের বর্তমান রূপ এসেছে সরল থেকে তাই এখন আমাদের প্রশ্ন হল- ইউক্যারিওটিক কোষের থেকে সরল আর কোন কোষ আছে কিনা? উত্তর হল হ্যাঁ, আছে।

পূর্বে বলা হয়েছে নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ ২ প্রকার। যথা:

ক) ইউক্যারিওটিক কোষ বা প্রকৃত কোষ

খ) প্রোক্যারিওটিক কোষ বা আদি কোষ।

এখন প্রোক্যারিওটিক কোষের সংজ্ঞা দেবার পালা।

প্রোক্যারিওটিক কোষ:

এসব কোষের নিউক্লিয়াস আদি ধরনের হয়। এদের নিউক্লিয়াসের কোন নিউক্লিয়ার আবরণী থাকে না। ফলে নিউক্লিয়াসের পর্দাসমূহ অর্থাৎ ক্রোমাটিন জালিকা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিওপ্লাজম ইত্যাদি সাইটোপ্লাজমের সরাসরি সংস্পর্শে থাকে না এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। যেমন- ব্যাকটেরিয়া কোষ। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাণীদেহে প্রোক্যারিওটিক কোষ থাকে না।

এই পর্বে আমরা প্রোক্যারিওটিক কোষের বর্ণনার মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করবো- সৃষ্টির শুরুর দিকে এই আদি কোষ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কিনা।

প্রোক্যারিওটিক কোষ সম্পন্ন জীবকে বলা হয় প্রোক্যারিওট। পূর্বে প্রোক্যারিওটকে ২ ভাগে ভাগ করা হত। যথা:

১) ব্যাকটেরিয়া
২) আর্কিয়া।

তবে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম আর্কিয়াকে ভিন্ন জীবজগৎ বা কিংডমে ভাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে আর্কিয়ার আরএনএ এর উপর গবেষণা করে দেখা যায় এটি ব্যাকটেরিয়া থেকে যথেষ্ট পরিমানে ভিন্নরকমের। তাই একে নিজস্ব একটি কিংডমে বিভক্ত করে দেওয়া যায়। ২০০৩ সালে আর্কিয়াকে একারনে ষষ্ঠ কিংডমে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, যার নাম দেওয়া হয় আর্কিয়া। আর্কিয়ার গঠন ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় কিছুটা উন্নতমানের। আর্কিয়ার গঠনের সাথে ইউক্যারিওটিক কোষের গঠনের তুলনামূলক অনেক মিল রয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কোষসমূহের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন সবচেয়ে সরলতম। তাই আমরা এখানে ব্যাকটেরিয়ার গঠন বর্ণনা করবো।

একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়া কোষে নিম্নোক্ত অংশগুলি বিদ্যমান:
১) ক্যাপস্যুল, ২) সেল ওয়াল বা কোষ দেওয়াল, ৩) সাইটোপ্লাজম, ৪) সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন, ৫) ফ্লাজেলা, ৬) পিলি, ৭) রাইবসোম, ৮) নিউক্লিওয়েড।

১) ক্যাপস্যুল:
অনেক ব্যাকটেরিয়ার সর্ববহিস্থ স্তরে অতিরিক্ত এক প্রকারের সুরক্ষা পর্দা রয়েছে। একে বলা হয় ক্যাপস্যুল। ক্যাপস্যুল পলিসেকারাইড (জটিল কার্বোহাইড্রেট) দ্বারা গঠিত হয়। ক্যাপস্যুলের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যাকটেরিয়াকে আর্দ্র রেখে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। এছাড়াও এটি ব্যাকটেরিয়াকে অন্যান্য বৃহৎ অণুজীব থেকে ফেগোসাইটোসিস বা গ্রাস হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি ব্যাকটেরিয়াকে পৃষ্ঠ বা তলের সাথে লেগে থাকতেও সাহায্য করে। যেসকল ব্যাকটেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে তাদের গঠনের মধ্যে ক্যাপস্যুল একটি উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী উপাদান।

২) সেল ওয়াল বা কোষ দেওয়াল:
প্রত্যেক ব্যাকটেরিয়া এক প্রকারের দৃঢ় কোষ দেওয়াল দ্বারা আবৃত থাকে যা পেপটিডোগ্লাইসেন এবং একটি প্রোটিন সুগার (পলিসেকারাইড) অনু দ্বারা গঠিত হয়। এই দেওয়াল কোষকে আকৃতি দান করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনকে ঘিরে রাখে। এটি কোষকে বাহিরেরর পরিবেশ থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও এটি বিভিন্ন ধরনের উপাঙ্গ যেমন- ফ্লাজেলা এবং পিলিকে কোষের সাথে আটকে রাখতে সাহায্য করে যাদের উৎপত্তি সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনের ভিতরে হয় এবং কোষ দেওয়াল ভেদ করে বাহিরে প্রসারিত হয়। যখন কোষের সাইটোপ্লাজমের সাথে বাহিরের পরিবেশের ক্ষরণ চাপের বিশাল এক তারতম্য ঘটে তখন এই কোষ দেওয়ালই কোষটিকে বিস্ফররিত হতে বাধা দান করে।

৩) সাইটোপ্লাজম:
সাইটোপ্লাজম বা প্রোটপ্লাজম হল মূলত জেল বা জেলির মত এক ধরনের থকথকে পদার্থ যার প্রধানতম অংশ হল পানি। এছাড়াও এতে রয়েছে – এনজাইম, লবণ, পুষ্টিদায়ক পদার্থ, বর্জ্য ও বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু যেমন: ক্রোমোজোম, রাইবোজোম, প্লাজমিড এবং বিভিন্ন ধরনের জৈবিক অণু ইত্যাদি। সাইটোপ্লাজমেই কোষের বৃদ্ধি, রাসায়নিক রূপান্তর, বিপাকীয় ক্রিয়া

(খাদ্য দ্রব্যের সরলতর পদার্থে রূপান্তর) এবং রেপ্লিকেসন বা প্রতিলিপন বা প্রতিরূপ সৃষ্টি ইত্যাদি ঘটে থাকে। সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরনের কোষ অঙ্গাণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এখানে সকল কোষ অঙ্গাণুসমূহ এবং ডিএনএ ভেসে থাকে। সকল জীব কোষেই সাইটোপ্লাজম বিদ্যমান। একে প্রাণের ভৌত ভিত্তি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

৪) সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন:

সাইটওপ্লাজমিক মেমব্রেন অথবা প্লাজমা মেমব্রেন হল মূলত ফসফোলিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকারের পর্দা। ইউক্যারিওটিক কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের মতই এটি লিপিড বাই লেয়ার বা দ্বিস্তরী লিপিড দ্বারা গঠিত। এই মেমব্রেন কোষের সাইটোপ্লাজমকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। এর অভ্যন্তরের কিছু প্রোটিন আবার এর ভিতরে বা উপরের অংশে নড়াচড়া করে। প্লাজমা মেমব্রেন কোষের বাহির থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাহিরে রাসায়নিক পদার্থসমূহের যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে এটি কোষকে বাহিরের পরিবেশের সাথে রীতিমত বাছাই করে মিথস্ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে। এর অভ্যন্তরের প্রোটিনসমূহ কোষকে বাহিরের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। এই যোগাযোগের মধ্যে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সাথে রাসায়নিক সংকেত বা কেমিক্যাল সিগন্যালের আদান-প্রদান এবং ইউক্যারিওটিক কোষের সাথে মিথস্ক্রিয়াও হতে পারে। প্লাজমা মেমব্রেন অত্যন্ত রকমের সুশৃঙ্খল এবং দুটি দিক বিশিষ্ট ও অপ্রতিসম (একটি বিভাজন রেখার দুই দিকের অংশগুলো ঠিক সদৃশ নয় এমন)। প্রত্যেক দিকেরই ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠ বা তল রয়েছে যাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্ম। এছাড়াও এসব মেমব্রেন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সমস্ত জীব কোষেই এই প্লাজমা মেমব্রেন উপস্থিত থাকে কারন এটি কোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৫) ফ্লাজেলা:

ফ্লাজেলা (এক বচনে ফ্লাজেলাম) হল অনেক ব্যাকটেরিয়ার দেহে অবস্থিত চুলের মত একটি উপাঙ্গ। এর গঠনকে চাবুকের সাথেও তুলনা করা হয়। এটি মূলত ব্যাকটেরিয়াকে চলনশক্তি দান করে। এই উপাঙ্গটি সাধারনত ব্যাকটেরিয়ার দুই প্রান্তে বা যেকোনো এক প্রান্তে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার এটি ব্যাকটেরিয়ার সমগ্র পৃষ্ঠ জুড়েই দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাজেলা

প্রোপেলারের (পাখা) মত নড়াচড়া করে ব্যাকটেরিয়াকে খাদ্যের দিকে যেতে সাহায্য করে, বিষাক্ত দ্রব্য থেকে দূরে সরে যেতে সাহায্য করে এবং ফটোসিনথেটিক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আলোর দিকে যেতে সাহায্য করে।

৬) পিলি:

পিলি হল অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার দেহে অবস্থিত ক্ষুদ্র চুলের মত এক ধরনের অভিক্ষেপ যা কোষের বহিঃপৃষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে। এটি কোষকে আঁকশির মতই বিভিন্ন তল যেমন: দাঁত, বৃহদান্ত্র, পাথর ইত্যাদির সাথে আটকে রাখতে সাহায্য করে। যেসকল ব্যাকটেরিয়ার পিলি নেই তারা অন্যান্য কোষকে রোগ দ্বারা সংক্রমিত করতে পারে না যেহেতু তারা কোন কোষের সাথে আটকে থাকতে অক্ষম। কিছু বিশেষ পিলি আবার ব্যাকটেরিয়ার মিলনে ব্যবহৃত হয় যেখানে দুটি ব্যাকটেরিয়া তাদের মধ্যে প্লাজমিড ডিএনএ এর টুকরো বিনিময় করে।

৭) রাইবসোম:

এটি এক ধরনের আণুবীক্ষণিক কারখানার মত যা কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এরা একটি কম্পিউটার কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রিটার বা রূপান্তরকের মতই নিউক্লিয়িক এসিডের আণুবীক্ষণিক ভাষাকে অ্যামিনো এসিডে রূপান্তর করে যা প্রোটিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান। ব্যাকটেরিয়ার রাইবসোম ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবসোমের মতই হয় শুধু একটু ছোট আকারের হয় এবং গঠনগতভাবে কিছুটা ভিন্নরকমেরর হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়ার রাইবসোম অন্য কোন অঙ্গানুর সাথে কোন ধরনের বন্ধনে যুক্ত থাকে না। এটি সাইটোপ্লাজমে স্বাধীনভাবে বন্টিত থাকে।

৮) নিউক্লিওয়েড:

নিউক্লিওয়েড হল ব্যাকটেরিয়া কোষের সেই অঞ্চল যেখানে কোষের ক্রোমসোমাল ডিএনএ অবস্থিত। এটি ইউক্যারিওটিক কোষের মত কোন ধরনের মেমব্রেনে আবদ্ধ নিউক্লিয়াস নয়। এটি নিউক্লিয়াসেরই একটি অঞ্চল যেখানে ডিএনএ গুচ্ছ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ারই একটি বৃত্তাকার ক্রোমসোম থাকে যা কোষের রেপ্লিকেসন বা প্রতিলিপনের জন্য দায়ী। তবে সামান্য কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে আবার প্লাজমিড নামক দুই বা ততোধিক ছোট, বৃত্তাকার সহায়ক ডিএনএ গুচ্ছ থাকতে পারে।

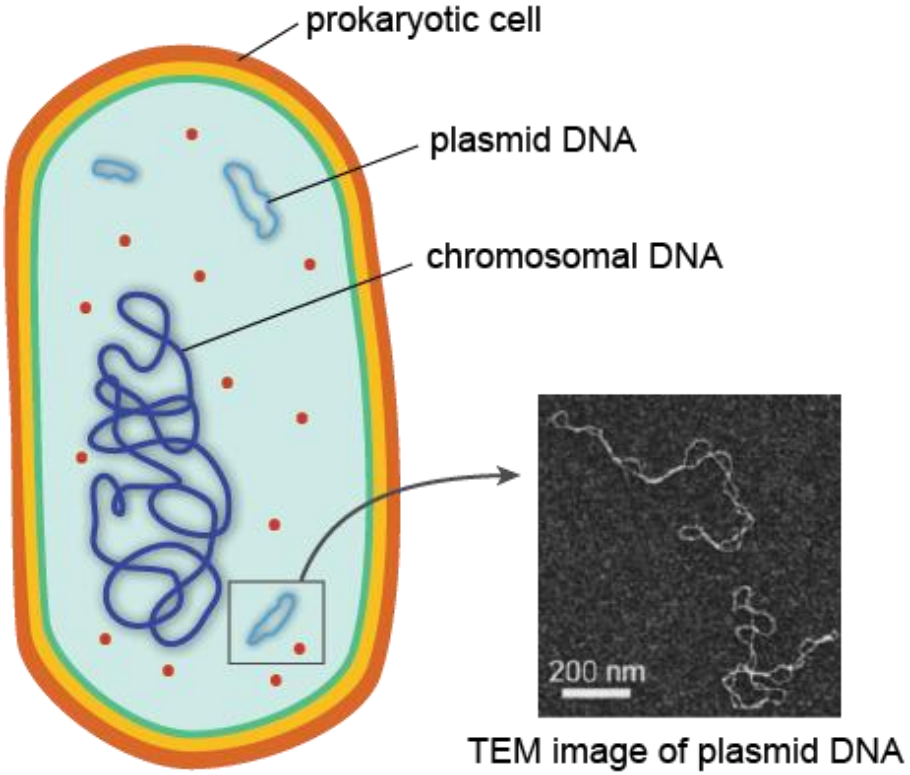

5. প্রোক্যারিওটিক ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমসোমাল ডিএনএ ও প্লাসমিড ডিএনএ

এখানে আদর্শ ব্যাকটেরিয়ার যে গঠন দেওয়া হল নিঃসন্দেহে সৃষ্টির শুরুতে বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া শুধুমাত্র সময় ও চান্স দ্বারাই এধরনের কোন গঠনই উপস্থিত থাকতে পারে না। তবে বিবর্তনবাদীরা তাই বলে এখানেই থেমে নেই। তাদের থিওরি অনুসারে কোষ এর থেকেও সরল গঠন দিয়ে শুরু হয়েছে। যদিও এটা শুধুমাত্র একটি থিওরিতেই রয়েছে এবং কোন প্রমাণ নেই কিন্তু তবুও তারা একেই ধ্রুব সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাদের প্রশ্ন হল- এই থিওরি ছাড়া আর কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করা যাবে? মানে তারা অপ্রমাণিত একটি থিওরিতে বিশ্বাস করতে রাজি আছে কিন্তু তবুও এটা স্বীকার করবে না যে, বাহিরের হস্তক্ষেপও এখানে কাজ করার একটা বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে! এখন আমরা যদি এই থিওরিকে সত্য বলে মেনেও নিই তবুও কোন ধরনের নির্দেশনা ছাড়াই কোষের উন্নতিকরনের

এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কারন যদিও একটি ব্যাকটেরিয়া একটি প্রাণী কোষের থেকে অনেক বেশি সরল কিন্তু তবুও এর গঠনকে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রের সাথে তুলনা দেওয়া যায়। এমন একটি সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্র যা তৈরি করা এখনও মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। কারন শুধুমাত্র এর একটি ডিএনএ অনুই প্রচণ্ড রকমের জটিলতা ধারণ করে। সমগ্র ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে এই ডিএনএই সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল এবং কোষের বাকি অংশের সম্মিলিত জটিলতাও ডিএনএ এর জটিলতার তুলনায় নগণ্য। ডিএনএর জটিলতা সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। যাই হোক, ব্যাকটেরিয়ার এই সূক্ষ্ম যন্ত্রের মত জটিলতা দেখলে এটাই মনে হয় যে, এটা খুবই বুদ্ধিমান কেউ প্ল্যান করে তারপর ডিজাইন করেছে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নিই যে, বিবর্তনবাদ অনুসারে কোন ধরনের সরলতম কোষ থেকে ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি হয়েছে তবুও এর সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রের মত ডিজাইন নির্দেশ করছে কোন ধরনের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ডিজাইনার, ইনভেন্টর ও মোডিফায়ারের দিকে। বিবর্তন যদি সত্যি সত্যি সংঘটিত হয়েও থাকে সেক্ষেত্রেও এই ধরনের জটিল ডিজাইন আসলে নিয়ন্ত্রিত বিবর্তনের দিকেই নির্দেশ করছে। অর্থাৎ বিবর্তন কোনভাবে হয়ে থাকলে অবশ্যই কোন না কোন ধরনের বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। অথবা ধরে নিতে হবে যে, বিবর্তন নামের এই প্রক্রিয়াটির নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা আছে! এমনকি বিবর্তনবাদের একজন কট্টর সমর্থক ও গবেষক **রিচারড ডকিন্স** নিজেও কোষের জটিল ডিজাইন দেখে এক ধরনের **ডিজাইনারের** সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার থিওরি অনুসারে এই ডিজাইনার হল প্রাচীন সময়ে মহাবিশ্বের অন্য কোন স্থানে সৃষ্টি হওয়া কোন ধরনের **সভ্যতা** (!) যারা ডারউইনের বিবর্তন অনুসারেই বিবর্তিত হয়ে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে বুদ্ধি ও প্রযুক্তিতে। তার মতে এই সভ্যতা-ই আমাদের গ্রহে **প্রাণের ডিজাইন করে** প্রাণের বীজ বপন করে গেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাণের ডিজাইনার সমস্যার সমাধান ডকিন্স করে ফেলেছেন। কিন্তু সেই উন্নত সভ্যতা যারা নাকি আমাদের তথাকথিত ডিজাইনার তাদের **আবির্ভাব** কোথা থেকে হল বা হতে পারে সে সম্পর্কে আর তিনি কোন মন্তব্যে যাননি। এমনকি তিনি এমন কোন থিওরিও দেননি যা দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করা যায় কি করে **নন-ডিজাইনড ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্তিত** কোন প্রাণী বা সভ্যতা আমাদের গ্রহের প্রাণের মত **জটিল প্রাণের বীজের ডিজাইন** করতে পারে। তবে মূল ব্যাপারটি হল এমনকি বিবর্তনবাদের অন্যতম একজন গবেষকও কিন্তু প্রাণের মাঝে বুদ্ধিমান ডিজাইনের ব্যাপারটি উড়িয়ে দেননি। **এটাই বা কম কি!**

পরবর্তী অংশে আমরা দেখার চেষ্টা করবো- একটি কোষ আসলেই কতটুকু সরল হতে পারে এবং সেই সরল কোষের ডিজাইন ঠিক কিরকম হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১) Wikipedia, the free encyclopedia (Prokaryote, Archaea)

২) http://micro.magnet.fsu.edu (Bacteria Cell Structure)

৩) http://biology.about.com (**Prokaryotes** By Regina Bailey, About.com Guide)

৪) http://www.shmoop.com (Prokaryotic Cell Structure and Function)

৫) http://www.cellsalive.com (Bacterial Cell Structure)

৬) http://www.wisegeek.com (What Are the Differences Between Archaea and Bacteria?)

৭) http://plantphys.info (What are Archaea?)

৮) উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান ১ম পত্রঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৪: কোষের জটিলতা-৩ (ন্যূনতম অঙ্গাণুসমূহ)

কোষের জটিলতা সংক্রান্ত পূর্বের অংশে ইউক্যারিওটিক এবং প্রোক্যারিওটিক কোষের জটিলতার বর্ণনা দিয়ে দেখানো হয়েছিল- এই ২ ধরনের কোষের কোনটির অস্তিত্বই বিবর্তনবাদ অনুসারে প্রাণ সৃষ্টির শুরুর দিকে থাকতে পারে না। এমনকি এই ২ ধরনের কোষের মধ্যে জটিল ধরনের ডিজাইন দেখতে পাওয়া যায় যা থেকে একজন ডিজাইনারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনকি বিবর্তন যদি সত্যি সত্যি ঘটেও থাকে তবুও এই জটিল ধরনের ডিজাইন কোন ধরনের নিয়ন্ত্রিত বিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে। এর মানে হল- হয় প্রাণের বিকাশের পিছনে কোন অত্যন্ত বুদ্ধিমান সত্তা আছে নতুবা বিবর্তন নামক প্রক্রিয়াটির নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা আছে! যাই হোক এসকল কিছুর মধ্যে থেকে একটি কথা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট আর সেটি হল যে, প্রাণ সৃষ্টির শুরুর দিকে বর্তমানকালের ইউক্যারিওটিক বা প্রোক্যারিওটিক কোন প্রকারের কোষেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না - যদি আমরা বিবর্তনের নিয়ম অনুসরণ করি। বিবর্তনবাদীদের বর্তমান থিওরি হল- অত্যন্ত সরল প্রকৃতির কোন কোষ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়। এতই সরল যে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সরলতম কোষও এমনকি সেই আদি সরল কোষের তুলনায় প্রচণ্ড মাত্রায় জটিল। যাই হোক এবার আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে সেই সর্বপ্রথম আদি কোষের কাল্পনিক গঠন ঠিক কতটুকু সরল হতে পারে। আমরা চেষ্টা করবো আদি সেই সরল কোষটির একটি যৌক্তিক মডেল দাঁড় করানোর।

পৃথিবীর সকল জীব কোষের মধ্যেই গঠনগত দিক দিয়ে কিছু মিল বিদ্যমান। উদ্ভিদ কোষ, প্রাণী কোষ, ইউক্যারিওটিক কোষ, প্রোক্যারিওটিক কোষ যাই হোক না কেন সকল প্রকারের জীবদেহ গঠনকারী কোষের মধ্যেই কিছু কমন অঙ্গাণু আছে যেগুলো কোষের জন্য শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং অপরিহার্য। কোষের এধরনের চারটি অংশ আছে যেগুলোকে পৃথিবীর সকল কোষেই পাওয়া যায়। সেগুলো হল:

১) সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন
২) সাইটোপ্লাজম
৩) রাইবসোম এবং
৪) জেনেটিক মেটেরিয়াল (ডিএনএ এবং আরএনএ)।

এবার কোষের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর গঠন ও কাজের একটি সাধারন বর্ণনা দেবার পালা।

১) সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন:

সাইটওপ্লাজমিক মেমব্রেন অথবা প্লাজমা মেমব্রেন হল মূলত ফসফোলিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকারের পর্দা। এটি লিপিড বাই লেয়ার বা দ্বিস্তরী লিপিড দ্বারা গঠিত। এই মেমব্রেন কোষের সাইটোপ্লাজমকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। এর অভ্যন্তরের কিছু প্রোটিন আবার এর ভিতরে বা উপরের অংশে নড়াচড়া করে। প্লাজমা মেমব্রেন কোষের বাহির থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাহিরে রাসায়নিক পদার্থসমূহের যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে এটি কোষকে বাহিরের পরিবেশের সাথে রীতিমত বাছাই করে মিথস্ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে। এর অভ্যন্তরের প্রোটিনসমূহ কোষকে বাহিরের পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। এই যোগাযোগের মধ্যে অন্যান্য কোষের সাথে রাসায়নিক সংকেত বা কেমিক্যাল সিগন্যালের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের কোষের সাথে মিথস্ক্রিয়াও হতে পারে। প্লাজমা মেমব্রেন অত্যন্ত রকমের সুশৃঙ্খল এবং দুটি দিক বিশিষ্ট ও অপ্রতিসম (একটি বিভাজন রেখার দুই দিকের অংশগুলো ঠিক সদৃশ নয় এমন)। প্রত্যেক দিকেরই ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠ বা তল রয়েছে যাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্ম। এছাড়াও এসব মেমব্রেন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সমস্ত জীব কোষেই এই প্লাজমা মেমব্রেন উপস্থিত থাকে কারন এটি কোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২) সাইটোপ্লাজম:

সাইটোপ্লাজম বা প্রোটপ্লাজম হল মূলত জেল বা জেলির মত এক ধরনের থকথকে পদার্থ যার প্রধানতম অংশ হল পানি। এছাড়াও এতে রয়েছে – এনজাইম, লবণ, পুষ্টিদায়ক পদার্থ, বর্জ্য ও বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু যেমন- ক্রোমোজোম, রাইবোজোম, প্লাজমিড এবং বিভিন্ন ধরনের জৈবিক অণু ইত্যাদি। সাইটোপ্লাজমেই কোষের বৃদ্ধি, রাসায়নিক রূপান্তর, বিপাকীয় ক্রিয়া (খাদ্য দ্রব্যের সরলতর পদার্থে রূপান্তর) এবং রেপ্লিকেসন বা প্রতিলিপন বা প্রতিরূপ সৃষ্টি ইত্যাদি ঘটে থাকে। সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন ধরনের কোষ অঙ্গাণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এখানে সকল কোষ অঙ্গাণুসমূহ এবং ডিএনএ (DNA) ভেসে থাকে। সকল জীব কোষেই সাইটোপ্লাজম বিদ্যমান। একে প্রাণের ভৌত ভিত্তি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়।

৩) রাইবসোম:

রাইবসোম মূলত নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। একারনে এদেরকে বলা হয় রাইবো-নিউক্লিয়িক প্রোটিন পারটিকল বা সংক্ষেপে আরএনপি (RNP)। কোষের মধ্যে এদেরকে দেখতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মত মনে হয়। এরা কখনও কখনও এককভাবে আবার কখনও কখনও একাধিক রাইবসোম চেনের আকারে বা গুচ্ছাকারে সজ্জিত হয়ে পলিজোম গঠন করে। অনেক সময় বহুসংখ্যক রাইবসোম সাইটোপ্লাজমে গুচ্ছাকারে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এদেরকে আবার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়েও লেগে থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় এরা নিউক্লিয় আবরণীর গায়েও লেগে থাকতে পারে। রাইবসোম প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে। এটি সংশ্লেষিত প্রোটিনকে গলজিদ্রব্যে প্রেরণেও সাহায্য করে।

৪) জেনেটিক মেটেরিয়াল:

কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি অংশের মধ্যে জেনেটিক মেটেরিয়াল হল সবচেয়ে জটিল ও সূক্ষ্ম গঠনের অধিকারী এবং একইসাথে এই অংশটি কোষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জেনেটিক মেটেরিয়াল ২ টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হল-

ক) ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ (DNA) এবং
খ) রাইবো নিউক্লিক এসিড বা আরএনএ (RNA)।

ক) ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড:

সজীব কোষে অবস্থিত স্বপ্রজননশীল, পরিব্যক্তিক্ষম, সকল প্রকার জৈবনিক কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক যে নিউক্লিক এসিড তাকেই ডিএনএ (DNA) বলে। জেনেটিক মেটেরিয়ালের দুটি অংশের মধ্যে এই অংশটিই সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এই DNA ছাড়া জীবন্ত কোষের অস্তিত্ব অসম্ভব।

ভৌত গঠন:

1. আকার – ইউক্যারিওটিক কোষের DNA সূত্রাকার সোজা এবং শাখাহীন। প্রোক্যারিওটিক কোষে মাইটোকনড্রিয়া ও প্লাস্টিডের ডিএনএ গোলাকার।

2. ওয়াটসন ও ক্রিকের মডেল অনুসারে DNA দ্বিসূত্রক, দেখতে পেঁচানো সিঁড়ির মত। সিঁড়ির এক একটি প্যাচের দৈর্ঘ্য ৩.৪ ন্যানোমিটার।
3. সিঁড়ির এক একটির মধ্যে ১০ টি করে নাইট্রোজেন বেসের ধাপ থাকে। দুটি ধাপের মধ্যবর্তী দূরত্ব ০.৩৪ ন্যানোমিটার।
4. সিঁড়ির দুই পাশের দুটি সূত্রের মধ্যের দূরত্ব ২ ন্যানোমিটার।
5. সূত্র দুটির একটি ঊর্ধ্বমুখী এবং অপরটি নিম্নমুখী অর্থাৎ একটি ৩-৫' হলে অপরটি ৫-৩'।
6. আয়তন – মানুষের দেহকোষে DNA এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য সাধারনত ১৭৪ সে.মি. এবং ব্যাকটেরিয়াতে এর দৈর্ঘ্য সাধারনত ১.৪ মি.মি.।
7. আণবিক ওজন – এর আণবিক ওজন ১০^৬ থেকে ১০^৯ এর মধ্যে।

DNA এর ভৌত গঠন

<u>রাসায়নিক গঠন:</u>

1. DNA একটি বৃহৎ অণু, যা হাইড্রোজেন অপেক্ষা কয়েক কোটি গুন বড়।
2. DNA গঠিত হয় ৫ কার্বন বিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন নামক নাইট্রোজেন বেস দ্বারা।

3. প্রতিটি DNA অণু দুটি সূত্র নিয়ে গঠিত এবং এই সূত্র ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা (S) ও অজৈব ফসফেট (P) দ্বারা তৈরি।
4. সূত্র দুটির মাঝখানের ধাপগুলো বেস দিয়ে তৈরি।
5. সাইটোসিন (C) ও থাইমিনকে বলা হয় পাইরিমিডিন এবং অ্যাডেনিন (A) ও গুয়ানিনকে (G) বলা হয় পিউরিন।
6. অ্যাডেনিন ও থাইমিন দুটি হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে এবং গুয়ানিন ও সাইটোসিন তিনটি হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।
7. একটি ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা ও একটি নাইট্রোজেন বেস মিলে গঠন করে একটি নিউক্লিওসাইট।
8. একটি নিউক্লিওসাইট ও একটি অজৈব ফসফেট মিলে গঠন করে একটি নিউক্লিওটাইড।

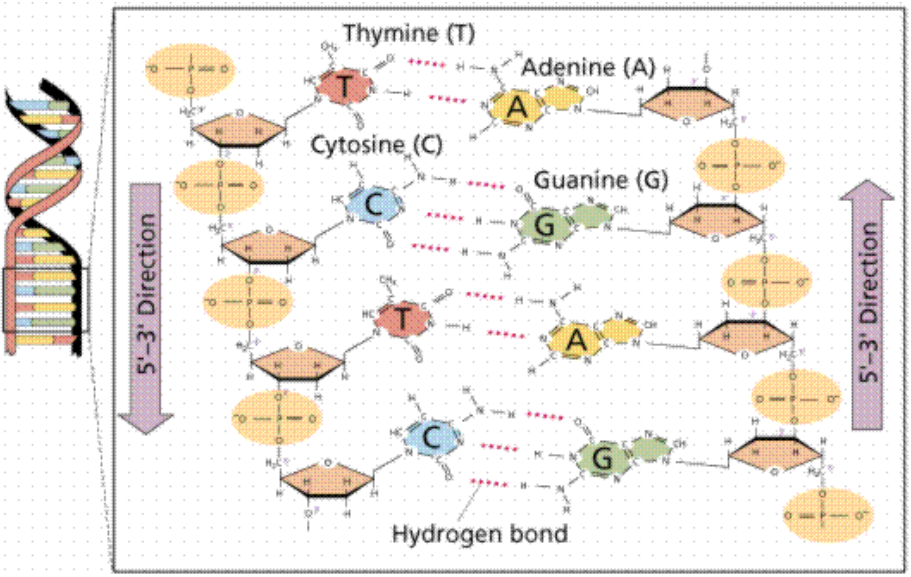

DNA এর রাসায়নিক গঠন

DNA এর কাজ:

1. DNA বংশগতি বৈশিষ্ট্যাবলীর ধারক ও বাহক।
2. দেহের সকল ধরনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।
3. কোষের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষ করে।
4. RNA সংশ্লেষ করে।
5. জীব জগতে ভেরিয়েসন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।
6. প্রতিরূপ সৃষ্টি করে কোষ বিভাজনে সাহায্য করে।

খ) রাইবো নিউক্লিক এসিড:

সাইটোপ্লাজম, রাইবসোম, নিউক্লিওলাস এবং DNA এর সহযোগী হিসেবে ক্রোমোজোমে যে নিউক্লিক এসিড থাকে তাকেই আরএনএ (RNA) বলে। DNA এর তুলনায় RNA অনেক কম জটিল এবং সামান্য কম গুরুত্বপূর্ণ। তবে DNA কে সহযোগিতা করতে হয় বলে আসলে এর গুরুত্বও আসলে অনেক বেশি।

ভৌত গঠন:

RNA এক সূত্রক চেইন এর মত। এটি স্থানে স্থানে কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। এর গঠনে একাধিক ইউ (U) আকৃতির ফাঁস (hairpin loop) থাকে।

রাসায়নিক গঠন:

নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে RNA গঠিত হয়:

১) রাইবোজ সুগার (পেন্টোজ সুগার); এটি ৫ কার্বন বিশিষ্ট।

২) নাইট্রোজেন বেস – অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, ইউরোসিল এবং সাইটোসিন।

৩) ফসফেট (ফসফরিক এসিড)।

৪) উপরের চারটি বেস ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য বেসও থাকতে পারে।

প্রকারভেদ:

একটি কোষে সাধারনত তিন প্রকারের RNA পাওয়া যায়। এগুলো হল:

১) ট্রান্সফার আরএনএ বা টি আরএনএ (tRNA)

২) রাইবসোমাল আরএনএ বা আর আরএনএ (rRNA) এবং

৩) মেসেঞ্জার আরএনএ বা এম আরএনএ (mRNA)

১) ট্রান্সফার আরএনএ:

নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে tRNA সৃষ্টি হয়। প্রতিটি tRNA-তে মোটামোটি ৯০ টি নিউক্লিওটাইড থাকে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি tRNA এক সূত্রক এবং লম্বা চেইনের মত থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বেস এর মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি tRNA তে একাধিক ফাঁস (loop) সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস হল এন্টিকোডন ফাঁস যা mRNA এর কোডন এর সাথে মুখে মুখে বসে যেতে পারে। tRNA-৩' প্রান্ত এক সূত্রক এবং সব সময়ই CCA ধারায় বেস সজ্জিত থাকে। এখানে অ্যামিনো এসিড সংযুক্ত হয়। ফাঁস অবস্থায় সব সময়ই এন্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো এসিড সাইট বিপরীত অবস্থানে থাকে। তিনটি বেস নিয়ে এন্টিকোডন সৃষ্টি হয়।

২) রাইবসোমাল আরএনএ:

কোষের সমস্ত RNA এর শতকরা ৮০-৯০ ভাগই হল rRNA। কোষের রাইবোসোমে এদের অবস্থান।

৩) মেসেঞ্জার আরএনএ:

DNA থেক সরাসরি ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA সৃষ্টি হয়। mRNA লম্বা চেইনের মত। mRNA এর ৫' প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডবিহীন, এই প্রান্তকে লিডার (S'-leader) বলে। আবার ৩' – প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডবিহীন, এই প্রান্তকে ৩' – ট্রেইলার (3' trailer) বলা হয়। মাঝখানের অংশকে কোডিং অংশ (coding region) বলে। পরপর তিনটি বেস মিলে একটি কোডন হয়।

এই তিন প্রকারের RNA ছাড়াও আরও এক প্রকারের RNA প্রকৃতিতে দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হল জেনেটিক আরএনএ (genetic RNA) বা জি আরএনএ (gRNA)। ভাইরাসের RNA হল gRNA।

RNA এর প্রধান কাজ:

RNA এর প্রধান কাজ হচ্ছে মূলত প্রোটিন প্রস্তুত করা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগতির বস্তু হিসেবেও কাজ করে। যেমন – টিএমভি (TMV) ।

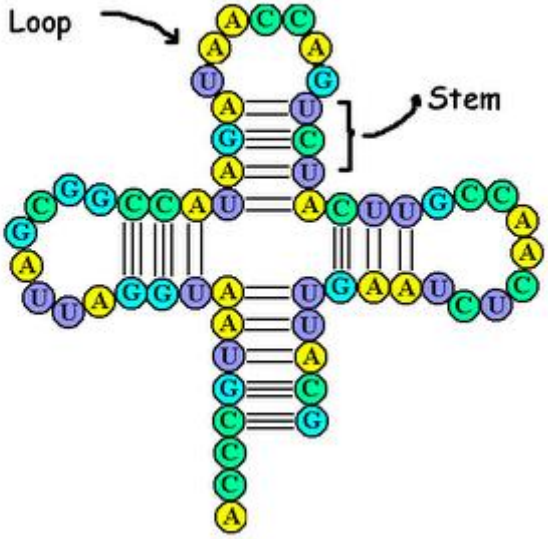

RNA এর একটি চিত্র

কোষের এই চারটি ন্যূনতম অংশের এই সাধারন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এমনকি শুধুমাত্র অপরিহার্য অংশগুলো দিয়েও যদি একটি কোষ গঠন করা হয় তবুও কোষের গঠন যথেষ্ট জটিল হয়। বিশেষ করে যেখানে এই অংশগুলোর গঠন ও কাজের খুব সামান্য বর্ণনাতেই যথেষ্ট জটিল গঠনের প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এদের সত্যিকারের গঠন কি পরিমাণ জটিল হতে পারে তা চিন্তা করাটাও কঠিন ব্যাপার! যদিও বর্তমান সময়ের যেকোনো জটিল কোষের গঠনের থেকে এই গঠনটি তুলনামুলকভাবে বেশ সরল তবুও প্রাণের সৃষ্টির শুরুর দিকে বিবর্তনবাদ অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এরকম কোন ধরনের গঠন সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্য গঠনটি অনেক বেশি পরিমানে জটিল। সুতরাং এধরনের সরল কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টির জন্য অসম্ভব ধরনের জটিল একটি গঠনের অস্তিত্ব সৃষ্টির শুরুর দিকে থাকা অসম্ভব যদি বিবর্তনবাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের সরল থেকে জটিলে রূপান্তর তত্ত্বটি

আমরা অনুসরণ করি। বর্তমানের বিবর্তনবাদও তা বলছে না। বর্তমানকালের বিবর্তনবাদীরা বলছে যে, অত্যন্ত সরল ধরনের অঙ্গাণু দিয়ে জীবিত কোষের সূচনা ঘটে। তাদের মতে সেই সরল অঙ্গানুই বিবর্তনের ধারায় অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে একসময় বর্তমান রূপে আসে। সে ক্ষেত্রে আমরা সর্বশেষ একটা প্রচেষ্টা করে দেখতে পারি। আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি একেবারে সরলতম কোষের গঠনটি ঠিক কেমন হুতে পারে।

পরবর্তী অংশে আমরা আমাদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোষেকে যতটা সম্ভব সরল হিসেবে কল্পনা করে দেখার চেষ্টা করবো যে, অন্তত এই ধরনের কোন সরল গঠনের অস্তিত্ব সৃষ্টির শুরুর দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হতে পারে কি না!

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৫: কোষের জটিলতা–৪
(সরলতম কোষের জটিলতম সমস্যা!)

পূর্বের অংশে দেখানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র ন্যূনতম অপরিহার্য অঙ্গাণুগুলো দিয়েও যদি কোষ গঠন করা হয় তবুও সেটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে চান্স দ্বারা সৃষ্টি হবার জন্য যথেষ্ট সরল নয় বরং একটু বেশিই জটিল। যদিও সেই জটিলতাকে সামান্য পরিমাণেই বর্ণনা করা হয়েছিল এমনকি তবুও তা ছিল যথেষ্ট পরিমানে জটিল। এখন আমরা শেষবারের মত দেখার চেষ্টা করবো যে একটি কোষের সরলতা সর্বনিম্ন কোন পর্যায়ে যেতে পারে।

প্রথমেই আমরা চিন্তা করি সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেনের কথা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য ও জটিল একটি অংশ। আমরা ধরে নেই যে, সর্বপ্রথম কোষে এই অংশটি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিল। কিন্তু একটি কোষ যত সরলই হোক না কেন এই অংশটি বা এই ধরনেরই কোন অংশের উপস্থিতি কোষে অবশ্যই থাকতে হবে। কোষে কোন না কোন ধরনের বাহ্যিক আবরনী থাকতেই হবে যা কোষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাণুসমূহকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা যেমন- তাপমাত্রা, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি এবং রেডিয়েশন ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবে। এছাড়াও এই আবরণী কোষের বাহির থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাহিরে রাসায়নিক পদার্থের আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ এই আবরণী কোষের জন্য এক প্রকারের ডিফেন্স সিস্টেম বা সুরক্ষা প্রক্রিয়া এবং একই সাথে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের আসা যাওয়ার জন্য এক ধরনের অটোম্যাটিক গেটওয়ে হিসেবে কাজ করবে। কোষের যদি এসকল কাজের জন্য কোন ধরনের আবরণী না থাকে তাহলে কোষ হয় প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অথবা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করতে করতে ধ্বংস হয়ে পড়বে। সুতরাং আদি কোষের জন্য অবশ্যই প্রতিকূল পরিবেশ এবং রাসায়নিক পদার্থের থেকে রক্ষা করতে পারার মত কোন ধরনের আবরণী থাকা অপরিহার্য।

এবার একটু সাইটপ্লাজমের কথা চিন্তা করা যাক। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন একে ঘিরে থাকে। এটি মূলত কোষের মূল দেহটিকে গঠন করে। কোষের অভ্যন্তরস্থ সকল অঙ্গাণুসমুহ এই সাইটোপ্লাজমেই ভেসে থাকে। এটি কোষের মূল কাঠামো গঠন করে বলেই একে জীবনের ভৌত ভিত্তি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখন প্রথম কোষ যতই সরল হোক না কেন এর

একটি নির্দিষ্ট বডি স্ট্রাকচার বা দেহ কাঠামো লাগবেই। কারন তা না হলে কোষ তার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গাণুসমূহ ধারণ করার মত কিছুই পাবে না, কোষ নড়াচড়া করতে পারবে না, খাদ্য গ্রহন করতে পারবে না, বিভাজিত হতে পারবে না। মোট কথা কোন ধরনের কোষ দেহ না থাকলে কোষ বলে কিছুই গঠিত হবে না, হবে না কোষের বংশ বৃদ্ধি। অতএব কোষের কোনো ধরনের বিবর্তনও হবে না। সুতরাং প্রথম কোষে একটি সরল কোষদেহ থাকা প্রয়োজন, যেখানে থাকবে কিছু সরল অঙ্গাণু।

এখন চিন্তা করা যাক কোষের শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে। একটি কোষকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন পড়বে। এই শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি মূলত দুটি ধাপে হবে। প্রথম ধাপে কোষকে খাদ্য বা এমন কোন কিছু গ্রহন করতে হবে যা থেকে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। এরপর দ্বিতীয় ধাপে কোষ ওই খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে শক্তিতে রূপান্তর করবে। এই শক্তি দিয়ে কোষের সমস্ত জৈবিক কাজ সম্পাদিত হবে। এই শক্তি কোষকে বেঁচে থাকতে, বিভাজিত হতে বা বংশবৃদ্ধি করতে, খাদ্য সংগ্রহ করতে এবং দেহের সকল অঙ্গাণুসমূহের কার্যকলাপ চালু রাখতে ব্যবহৃত হবে। শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রথমেই কোষের এমন ধরনের কোন ডিটেকশন বা শনাক্তকরণ সিস্টেম থাকা লাগবে যা দ্বারা খাদ্যকে শনাক্ত করা যাবে। তবে তারও আগে দেহের যে খাদ্য বা শক্তির প্রয়োজন হয়েছে সেটা জানান দেওয়ার জন্যও কোষের ভিতরে আলাদা একটি সিস্টেম থাকা লাগবে যা হবে অনেকটা ফুয়েল মিটার এর মতই যা কিনা আবার জ্বালানির প্রয়োজনে জ্বালানি ফুরানোর আগেই অ্যালার্ম বা সতর্ক সংকেত দান করে। খাদ্য গ্রহন করার জন্য কোষকে প্রথমে খাদ্যের কাছে যাওয়া লাগবে। খাদ্যের কাছে যাওয়ার জন্য আবার কোষের চলন ক্ষমতা থাকা লাগবে যা সর্বপ্রথম কোষের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক হবে। ব্যাপারটা অনেকটা শিশুর জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই হাটা-চলার ক্ষমতা রপ্ত করার মত হবে! তবে এক্ষেত্রে কোষের চলনের ব্যাপারটি বাদ দেওয়া যায় এই চিন্তা করে যে বিবর্তনবাদীদের মতবাদ অনুসারে এক ধরনের কেমিক্যাল সুপ (অবশ্যই খাওয়ার সুপ নয়!) বা রাসায়নিক দ্রবনের মধ্যে প্রথম কোষের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং এই ধারনা করে নেওয়া যায় যে প্রথম কোষ উৎপন্ন হবার পর এই দ্রবনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকেই শক্তি উৎপাদনের উপাদান গ্রহন করতো। তাই চলনের প্রয়োজন পড়তো না। যাই হোক এরপর খাদ্যকে ভক্ষন বা গ্রহন করার জন্য আবার আর একটি সিস্টেম থাকা লাগবে। মানে ব্যাপারটা যেন এমন যে, একটি শিশু জন্মের পরপরই নিজের খাদ্য নিজেই সনাক্ত ও

জোগাড় করে নিজের হাতে খাওয়া শিখে গেছে! এরপর লাগবে এই খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে শক্তিতে রূপান্তর করার মত কোন ধরনের সিস্টেম। অর্থাৎ কোষটিকে হতে হবে কোন ধরনের আণুবীক্ষণিক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির মত। এই শক্তি আবার কোথাও জমা রাখা লাগবে, কেননা তা না হলে শক্তি উৎপাদনের সাথে সাথেই তা ক্ষয় হয়ে যাবে এবং কোষের কার্যক্রম চালানোর জন্য আর কোন শক্তি থাকবে না। তার মানে কোষের শক্তি জমা রাখার জন্য রিচারজেবল ব্যাটারির মত একটি সিস্টেম থাকা লাগবে। আবার এই শক্তি সমগ্র কোষে বণ্টনের জন্য ইউপিএস (UPS) বা আইপিএস (IPS) এর মত আর একটি সিস্টেম থাকা লাগবে। শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায় কিছু বর্জ্য অবশ্যই উৎপন্ন হবে। এই বর্জ্য কোষ থেকে বের করে দেবার জন্য আবার আর একটি সিস্টেম থাকা লাগবে যা একটি আণুবীক্ষণিক গারবেজ ডিসপোজাল সিস্টেমের সাথে তুলনীয়। অর্থাৎ আমরা কোষের সম্পূর্ণ খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে একটি মাইক্রোস্কোপিক অটোম্যাটিক পাওয়ার প্ল্যান্ট বা স্বচালিত আণুবীক্ষণিক শক্তিকেন্দ্রের সাথে তুলনা করতে পারি। এই শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি অবশ্যই কোষে থাকা লাগবে, কারন তা না হলে সেই কোষ তৈরি হবার একটি নির্দিষ্ট সময় পরই ধ্বংস হয়ে যাবে বিবর্তন বা বংশবৃদ্ধি না করেই। এখন এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে। সর্বপ্রথম কোষ সৃষ্টি হলে এর অঙ্গাণুসমূহ সচল রাখার জন্য এবং এমনকি শক্তি উৎপাদনের জন্যও প্রাথমিক কিছু পরিমানে জমাকৃত ব্যাবহারযোগ্য শক্তি প্রয়োজন।

কিন্তু সেই প্রাথমিক ব্যাবহারযোগ্য জমাকৃত শক্তি কোষের অভ্যন্তরে কোথা থেকে এলো?

এবার কোষের বংশবৃদ্ধির কথাটা একটু ভাবা যাক। বর্তমান সময়ের সকল এককোষী প্রাণীরা বংশবৃদ্ধি করে কোষ বিভাজন দ্বারা। প্রথম কোষেও তার ব্যাতিক্রম হবার কথা না। বিশেষ করে যেহেতু এই কোষই তৎকালীন সময়ের একমাত্র জীবিত কোন কিছু। প্রথম কোষের মডেল যদি বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম না হয় তাহলে বিবর্তনবাদ সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং প্রথম কোষে একদম শুরুতে অবশ্যই বিভাজন বা বংশবৃদ্ধির একটি সিস্টেম থাকা লাগবে। যদি প্রথম কোষের বিভাজন সিস্টেম শুরু থেকেই না থাকে তাহলে সে কোষের কোন ধরনের বিবর্তন বা পরিবর্তন হবার আগেই কোষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

এখন কোষের নিয়ন্ত্রক নিয়ে একটু কথা বলা যাক। একটি কোষ যত প্রাচীন এবং সরলই হোক না কেন কোষে অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে যা কোষের সমস্ত অঙ্গাণু ও সিস্টেমের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করবে। এই নিয়ন্ত্রক না থাকলে কোষের অঙ্গাণুসমূহের কাজকর্মে কোন মিল থাকবে না। তখন দেখা যাবে কোন কারন ছাড়াই কোষ খাদ্য গ্রহণ করছে এবং খাদ্য গ্রহন করে শক্তি উৎপাদনের পরিবর্তে সম্পূর্ণটাই বর্জ্য হিসেবে বের করে দিচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, রাসায়নিক দ্রব্যটি কোষের জন্য প্রয়োজনীয় তাকে কোষের আবরণী প্রবেশ করতে দিচ্ছে না কিন্তু যে রাসায়নিক দ্রব্য বিপদজনক তাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এধরনের অবস্থা হলে অত্যন্ত দ্রুত কোষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং কোষের অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকও থাকতে হবে।

এবার আসা যাক কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ডিএনএ এর বিষয়ে। ডিএনএ হল মূলত এক ধরনের ইন্সট্রাকশন সেট বা নির্দেশাবলীর গুচ্ছ। একে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর সাথে তুলনা করা যায়। প্রথম কোষ সৃষ্টি হবার সময়ই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিএনএ তৈরি হতে হবে। কারন একটি কোষ কি করবে, এর বৈশিষ্ট্য কি হবে, এর প্রতিটি অঙ্গাণু কিভাবে কোন কাজ করবে এবং এই কোষ দেখতে কেমন হবে -এসমস্ত কিছুই ডিএনএ নির্ধারণ করে। এছাড়াও কোষ বিভাজন এবং বিভাজনের সময় কোষের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভাজিত কোষে প্রেরণও ডিএনএই করে থাকে। সুতরাং অবশ্যই কোষে ডিএনএ উপস্থিত থাকতে হবে, তা না হলে কোনভাবেই জীবিত ও কর্মক্ষম কোষ গঠিত হতে পারবে না। কিন্তু ডিএনএ হল কোষের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও জটিলতম অংশ। এখনও পর্যন্ত প্রকৃতিতে জড় বস্তু থেকে ডিএনএ সৃষ্টি হবার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বহু বছর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ডিএনএ অণু তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। এখানেই ব্যাপারটি শেষ নয়। এমনকি জীবদেহেও এখনও পর্যন্ত নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন ডিএনএ অণু সৃষ্টি হবার রেকর্ড পাওয়াও যায়নি বা কৃত্রিমভাবে জীবদেহেও সৃষ্টি করা যায়নি। পূর্বে যে সকল ডিএনএ জীবদেহে বিদ্যমান ছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধুমাত্র সেসকল ডিএনএই জীবদেহে উৎপাদিত হয়। আর জীববিজ্ঞানীদের জন্য আরও বড় খারাপ ব্যাপার হল যে, তারা এমনকি অতি চেনা পরিচিত ডিএনএ এরও সামান্য একটা অণু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি নতুন কোন ডিএনএ সৃষ্টি করা তো দূরে থাক।

সুতরাং সৃষ্টির শুরুতে প্রথম ডিএনএ কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চান্স দ্বারা সৃষ্টি হল সেটা বিশাল একটা প্রশ্নের বিষয়।

এবার উপরের সম্পূর্ণ লেখাকে একটু অন্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সৃষ্টির প্রথম কোষের কাল্পনিক মডেলটিকে মূলত ৩ টি অংশে বিভক্ত করছি:

১) কোষ আবরণী
২) কোষ দেহ
৩) কোষ অঙ্গাণুসমূহ

এই কাল্পনিক মডেলটি যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় তার জন্য এর যেসকল ক্রিয়াকলাপ বা সিস্টেমের প্রয়োজন সেগুলো হল:

১) সুরক্ষা সিস্টেম
২) শক্তি উৎপাদন সিস্টেম
৩) শক্তি সংরক্ষণ সিস্টেম
৪) বর্জ্য অপসারণ সিস্টেম
৫) শক্তি বণ্টন সিস্টেম
৬) কোষ বিভাজন সিস্টেম
৭) নিয়ন্ত্রক ও সমন্বয়কারি সিস্টেম।

শক্তি উৎপাদন সিস্টেমের অভ্যন্তরে আবার কতগুলো পৃথক পৃথক সিস্টেম থাকবে। সেগুলো হল:

১) খাদ্য বা শক্তি উৎপাদক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণ সিস্টেম
২) খাদ্য সনাক্তকরন সিস্টেম
৩) খাদ্য গ্রহন সিস্টেম
৪) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সিস্টেম

এখানে যেসকল সিস্টেমের কথা বলা হল সবগুল সিস্টেমই কোষের জন্য অপরিহার্য। একটি সিস্টেমও যদি কোষ থেকে বাদ পড়ে যায় তবে বংশবৃদ্ধি করা ছাড়াই কোষের মডেল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্যাপারটি নিয়ে পুনরায় সামান্য আলোচনা করা যাক। কোষের জীবিত থাকার জন্য এবং অঙ্গানুসমুহ চালনা করার জন্য প্রয়োজন শক্তি। তাই শক্তি উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া থাকা লাগবে। শক্তি উৎপাদনের জন্য শক্তি উৎপাদক বস্তু সনাক্তকরণ, গ্রহন ও প্রক্রিয়াজাতকরন করা লাগবে। এরপর এই শক্তিকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা লাগবে। সংরক্ষিত শক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে সমগ্র কোষদেহে সরবরাহ করার সিস্টেম থাকতে হবে। খাদ্য বা শক্তি উৎপাদক দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় অবশেষ হিসেবে কিছু না কিছু উৎপন্ন হবে যাকে আমরা বর্জ্য পদার্থ হিসেবে ধরতে পারি। এই বর্জ্য পদার্থ অবশ্যই নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া থাকা লাগবে কারন কোষের ভিতর অবশ্যই অসীম জায়গা নেই। আর কোষের ভিতরে বর্জ্যের পরিমাণ বাড়তে থাকলে কোষের কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যন্ত কোষের অভ্যন্তরে আর কোন কিছু প্রবেশেরই স্থান থাকবে না। তাই এর নিষ্কাশন জরুরি। কোষের শক্তির জন্য খাদ্য গ্রহন এবং বর্জ্য অপসারনের জন্য কোষের আবরণী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। কোষের বংশবৃদ্ধির জন্য অবশ্যই একটি বিভাজন প্রক্রিয়া থাকা লাগবে। তা না হলে তথাকথিত বিবর্তন কিভাবে সম্ভব হবে? আর এসকল কাজকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এবং তার জন্য কোষে নিয়ন্ত্রক থাকা লাগবে। তা না হলে কোষের অঙ্গাণুসমূহ হয় সমন্বয়হীন উল্টাপাল্টা আচরন করবে অথবা কোন কাজই করবে না। যেহেতু ডিএনএ হল কোষের গঠন ও কার্যকলাপের বেসিক ইন্সট্রাকশন সুতরাং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকে ডিএনএ বিদ্যমান থাকবে অথবা ডিএনএ নিজেই হবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক। তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে, প্রথম কোষকে যতটা সরল বলা হয়েছিল তা মোটেও ততটা সরল তো নয়ই বরং এতগুলো সিস্টেম সম্বলিত একটি কোষ যথেষ্ট পরিমাণে জটিল হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, সৃষ্টির শুরুতে বিনা কোন নিয়ন্ত্রণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুধুমাত্র চান্স বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কোষ গঠিত হওয়া সম্ভব না। কারন কোষের উল্লেখিত সকল সিস্টেমের যেকোনো একটিও যদি বাদ পড়ে তাহলেই আর জীবন্ত কর্মক্ষম কোষ সম্ভব হবে না। আর এতগুলো সিস্টেম বিশিষ্ট কোন জটিল গঠন কখনই চান্স দ্বারা গঠিত হওয়া সম্ভব

নয়, বিশেষ করে যেহেতু বিবর্তনবাদের মূল কথাই হল বিবর্তনের মাধ্যমে সরল থেকে জটিল গঠনের দিকে যাওয়া। যদি একটি সরল অঙ্গাণু থেকে কোষের শুরু করতে হয় তাহলে তার সাথে অন্যকোন অঙ্গাণু যুক্ত হবার পূর্বে বা তার থেকে অন্য অঙ্গাণু সৃষ্টি হবার পূর্বেই তার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

সুতরাং বিবর্তনবাদের সময়ের সাথে চান্স দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন সরল কোষ থেকে জীবনের শুরু হবার মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে ভুল।

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৬: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা-১ (টর্নেডো থেকে বোইং)

পূর্বের অংশে কোষের জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার একটু প্রাণের উদ্ভবের ক্ষেত্রে **TIME, CHANCE** ও **RANDOM PROCESS** নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিবর্তনবাদীরা বলে থাকে যে **CHANCE** বা ভাগ্যের কারণে এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গাণিতিকভাবে হিসাব করলে দেখা যায়, যদি কারও কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া প্রান সৃষ্টি হয় তাহলে সম্ভাব্যতার সূত্রানুসারে সেটা হবে অসম্ভব একটি ব্যাপার।

এক্ষেত্রে স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ভিক্রমসিং একটি বিখ্যাত উক্তি দেন। সেটি হল: Belief in the chemical evolution of the first cell from lifeless chemicals is equivalent to believing that a tornado could sweep through a junkyard and form a Boeing 747.

তাঁরা এখানে বলেন, প্রাণহীন রাসায়নিক দ্রব্যাদি থেকে প্রথম কোষের রাসায়নিক বিবর্তনের উপর বিশ্বাস করা হল একটি টর্নেডোর প্রচুর আবর্জনা ভর্তি একটি স্থান থেকে বোইং ৭৪৭ তৈরি করতে পারার উপর বিশ্বাস করার সমান।

স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ভিক্রমসিং এর কথা অনুসারে, একটি টর্নেডো ময়লা আবর্জনা ভর্তি একটি স্থান দিয়ে যাবার সময় সঠিক পার্টগুলো খুঁজে বের করে একটি বোইং ৭৪৭ তৈরি করতে পারে এই কথায় বিশ্বাস করা এবং রাসায়নিক বিবর্তন এর মাধ্যমে প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রথম কোষের উদ্ভব হওয়ায় বিশ্বাস করা একই কথা। মানে তাদের কথা থেকেই বোঝা যায় যে রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণের উদ্ভব হওয়াটা কতটুকু অবাস্তব একটি ব্যাপার। এর কারন হল রাসায়নিক বিবর্তনের দ্বারা প্রথম কোষের উৎপত্তির সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, এতই ক্ষীণ যে একে অসম্ভব হিসেবে বললেও কিছুমাত্র ভুল হবে না।

এবার একটু দেখা যাক যে রাসায়নিক বিবর্তন দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি ও উন্নতির সম্ভাবনা ঠিক কতটুকু। স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ভিক্রমসিং RANDOM PROCESS এর মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি হবার সম্ভাব্যতা গণনা করেন। তাঁরা বলেন, RANDOM PROCESS এ CHANCE দ্বারা শুধুমাত্র একটি এনজাইম বা প্রোটিন অনু গঠিত হবার সম্ভাবনা 1 IN 10 TO THE POWER 20 (1/10^20) এর বেশি নয়। বর্তমান পৃথিবীর জীবজগতে ২০০০ এরও বেশি এনজাইম আছে । এই দুই বিজ্ঞানী গননা করেন যে RANDOM PROCESS এ CHANCE দ্বারা এই সমস্ত এনজাইম গঠিত হবার সম্ভাবনা হল 1 IN 10 TO THE POWER 40,000(1/10^40000)। তবে দুঃখের বিষয় হল যে বর্তমানে আর তাদের এইসব গণনা ব্যাবহার করা হয় না! কারন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁদের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত এইসব গণনা ভুল হিসেবে গণ্য হয়!! বর্তমানে জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। মানুষ এখন জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কে এমন অনেক কিছু জানে যা স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ভিক্রমসিং এর সময় মানুষ জানতো না। এখনকার জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সম্ভাব্যতা গননা করা হয় তা আসলে আরও ভয়াবহ!!! এখনকার গননা অনুসারে CHANCE এর মাধ্যমে ২০০ টি এমিনো এসিড অণু সম্বলিত শুধুমাত্র ১ টি প্রোটিন অণু গঠন হবার সম্ভাবনা হল 1 IN 10 TO THE POWER 260 বা **1/10^260**।(সংখ্যাটি এতই বড়ো যে Fx-570ms SCIENTIFIC CALCULATOR এ CALCULATION এর সময় **Math ERROR** দেখায়!)। এই গণনাটি করা হয় বর্তমানে পাওয়া প্রোটিনের সংখ্যা অর্থাৎ ২০ এর উপর বর্তমানে পাওয়া অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা মানে ২০০ এর পাওয়ার (**POWER**) দিয়ে। অর্থাৎ **20^200** থেকে এই গণনাটি পাওয়া যায়। এই সম্ভাবনাটি এতোই সামান্য যে সারা মহাবিশ্বও যদি অ্যামিনো এসিড দ্বারা ভর্তি থাকে এবং তারা যদি ১ বিলিয়ন বছর ধরেও একটি আর একটির সাথে সংযুক্ত হতে থাকে তবুও ২০০ অ্যামিনো এসিড সম্বলিত ১ টি প্রোটিন অণুও গঠিত হবার কথা না জীবন্ত কোষ তো দূরে থাক!

দেহের অভ্যন্তরের প্রোটিন তৈরি হয়ে থাকে কোষের জিন দ্বারা। আমাদের বর্তমান জ্ঞান অনুসারে মানুষের প্রতিটি জিনে গড়ে প্রায় ৩০০০ টি করে বেস থাকে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বেস সম্বলিত যে জিন পাওয়া গেছে সেখানে বেস আছে সর্বমোট 2.4 বিলিয়ন বা ২৪০ কোটি! মানুষের দেহে প্রায় ৩০,০০০ জিন আছে। মানুষের জেনোমে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডিএনএ

বেস পেয়ার আছে। শুধুমাত্র পরিণত লাল রক্ত কোষগুলো ছাড়া মানুষের প্রত্যেক কোষে জেনোম সম্পূর্ণভাবে রয়েছে। প্রতি কোষে প্রটিওম আছে যা প্রোটিন থেকেই আসে। জেনোম সাধারণত কখনও পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু প্রটিওম প্রতি মিনিটেই পরিবর্তিত হয় পরিবেশের বিভিন্ন প্রায় ১০,০০০ সিগনাল পেয়ে। সবশেষে আমরা জানতে পারি, মানব দেহে প্রায় ২ মিলিওন প্রোটিন আছে যার প্রতিটিরই আছে বিভিন্ন ধরনের কাজ। কিন্তু যেখানে মহাবিশ্বে এমিনো এসিড দ্বারা পূর্ণ থাকলেও ১ বিলিয়ন বছরে **CHANCE** দ্বারা ১ টি প্রোটিন অণু গঠিত হয় কিনা সন্দেহ সেখানে ২ মিলিওন প্রোটিন অণু এবং আরও অসংখ্য সূক্ষ্ম অংশ সম্বলিত এতো জটিল এবং কর্মক্ষম একটি মানবদেহ কিনা এসেছে **CHANCE** থেকে! আর পুরা জীবজগতের কথা তো ভাবাই যায় না, যেখানে এখনও প্রচুর নতুন নতুন প্রাণী আবিষ্কার হচ্ছে!! এটা তো একটা অবিশ্বাস এবং অলৌকিক ব্যাপার!!! যারা সৃষ্টিকর্তা এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য এটা একটা বেশ ভালই কল্পনা প্রসূত অলৌকিক চিন্তাভাবনা! এক্ষেত্রে এই কথাটি বেশ ভালভাবেই খেটে যায় যে –

There is no chance that the human body could have come about by chance!

তবে এই কথাটি শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই খাটে না বরং আসলে পৃথিবীর সকল জীবের ক্ষেত্রেই খাটে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠন অন্যান্য জীবদের মস্তিষ্কের গঠন থেকে অনেক অনেক বেশি জটিল ও উন্নত বলেই মূলত মানব দেহের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে সম্ভাব্যতা অনুসারে আসলে বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম এককোষী জীবটিরও অস্তিত্ব থাকার কথা নয়!

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৭: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা-২ (প্রাণরসায়ন ও সম্ভাব্যতা)

পূর্বের অংশে একটি সাধারন প্রোটিন অণু সৃষ্টিতে সম্ভাব্যতার হিসাব দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, সম্পূর্ণ শুধুমাত্র একটি প্রোটিন অণু সৃষ্টি হওয়াটাও প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। এবারে বিবর্তনের পক্ষ সমর্থনকারীরা এ সম্পর্কে কি বলে থাকে তার একটি উদাহরণ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রোটিন সৃষ্টি হবার আরও একটি হিসাব দেওয়া হবে।

বিবর্তনবাদীরা CHANCE এর ধারনাকে খণ্ডন করার কিছু ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা করেন। আমাদের দেশেরই Arman Khandaker (ফেসবুক আইডি) নামের এমন একজন বিবর্তনবাদ সমর্থকের উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। **এই ব্যক্তি** CHANCE এর ব্যাপারটিকে মোটামোটি উড়িয়ে দিয়েই ফেসবুকে জনৈক আল ফাত্তাহ নামের এক ব্যাক্তির বিবর্তনবাদ বিরোধী একটি নোটে আমার একটি কমেন্টের জবাবে বলেছিলেন-

এটা যেন ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্য দ্বারা জেট প্লেনের উপাদানসমূহকে একত্রে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জেট প্লেন তৈরির অনুরূপ! এটা অবশ্যই হাস্যকর! কিন্তু abiogenesis-এর বেলায় ব্যাপারটা কি আসলেই তাই? প্রথম কোষটির organelle গুলোর হয়তোবা আরও সাধারণ কোনও রুপ ছিল। প্রথম জীবন্ত কোষ তৈরির ঘটনার ধারাবাহিকতা যাই না হোক, এটার পেছনে অবশ্যই সম্ভাব্যতার বেশ স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সম্ভাব্যতাই এক মাত্র গুণক নয়। প্রাণরসায়ন

শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার খেলা নয়, কারণ এটা সাধারণ উপাদান কে জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা জটিলতর উপাদানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুপান্তর করতে সক্ষম।

কিন্তু প্রথমত ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে বোইং প্লেন তৈরির এই তুলনা যত হাস্যকরই শোনাক না কেন সেটা ২ জন বিজ্ঞানীর দেওয়া গবেষণালব্ধ মতামত। Arman Khandaker নিজে কোন বিজ্ঞানী না হয়েও কিভাবে দুই জন বিজ্ঞানীর দেওয়া মতামতকে হাস্যকর বলল সেটা ঠিক বোঝা গেল না। আর তাছাড়াও তারা তো গানিতিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই এই মতামতটি দেন যে, ফলাফলের মধ্যে কোন প্রকারের ভুল নেই। এছাড়াও Arman Khandaker একটি অতি সাধারণ ভুল করেছেন। আর সেটি হল সম্ভাব্যতাকে খুব বেশি একটা গুরুত্ব না দেওয়া। তিনি অবশ্য সম্ভাব্যতার সাথে প্রাণ সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার করেছেন কিন্তু সেটাকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব দিয়ে নিজেই হাস্যকরভাবে প্রাণরসায়নের কথা অবতারনা করে বলেছেন, *প্রাণরসায়ন শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার খেলা নয়, কারণ এটা সাধারণ উপাদান কে জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা জটিলতর উপাদানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুপান্তর করতে সক্ষম*।

কিন্তু সত্যি বলতে, সম্ভাব্যতার সাথে রসায়নের সম্পর্ক একমাত্র গবেষণাগারেই কম থাকে। কারন গবেষণাগারের পরিবেশ হল নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ। যে কথাটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়। যদি কেউ বলে, প্রাকৃতিক পরিবেশও সম্ভাব্যতার কঠোর থাবার আওতা মুক্ত তাহলে অবশ্যই তাকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশও নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ। আর প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ এটা স্বীকার করার অর্থই হল একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্ব স্বীকার করা।

গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত প্রযোজ্য –

1. ২ টি রাসায়নিক দ্রবের মধ্যে বিক্রিয়া করতে হলে এই ২ টির মধ্যে সংস্পর্শ অত্যাবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহকে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনার জন্য তাদেরকে দ্রবীভূত করার প্রয়োজন পড়ে।
2. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বায়ুচাপ একটি বিরাট ভূমিকা রাখে । যদি চাপের একটু হেরফেরও হয় তাহলে বেশিরভাগ সময়ই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না।

3. চাপের মত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপেরও বেশ বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যদি তাপেরও হেরফের হয় তাহলে এক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময়ই আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না।
4. অনেক সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আলোকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই অন্ধকারে সংঘটিত হয় না কিন্তু আলোকের উপস্থিতিতে হয়। আবার অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই আলোর তীব্রতা এবং স্বল্পতা প্রভাব ফেলে এবং আলোর সঠিক পরিমান উপস্থিতি ছাড়া রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় না।
5. অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন পড়ে। বিদ্যুৎ প্রবাহ ছাড়া ওইসব রাসায়নিক বিক্রিয়া একেবারেই অসম্ভব।
6. কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়াতে শব্দ কম্পনেরও প্রয়োজন হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে শব্দ কম্পন মাত্রা নির্দিষ্ট না হলে এসকল বিক্রিয়া হয় না।
7. অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবকও বেশ ভালো একটি ভূমিকা রাখে। প্রভাবক ছাড়া বিক্রিয়াটি কিছুটা ভিন্নভাবে হতে পারে।
8. প্রভাবক সহায়কও প্রভাবক এর মত ভূমিকা পালন করে। অবশ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক এবং প্রভাবক সহায়কের ভুমিকাই সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। মূলত প্রভাবক ও প্রভাবক সহায়ক রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

গবেষণাগারে উক্ত শর্তসমূহকে বিবেচনা করেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে যদি নিয়ন্ত্রণ করার কেউই না থাকে তবে বিক্রিয়ার এইসব শর্তসমূহ কে বিবেচনা করবে? যেখানে এমনকি গবেষণাগারে এত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও রসায়নবিদরা অনেক সময় ভুল করে যার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে যখন কোন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন এর চারপাশের পরিবেশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। যেমন- প্রাকৃতিক পরিবেশে বাতাসের আর্দ্রতা একটি বিরাট ব্যাপার। বাতাসের আর্দ্রতার পরিমানের উপর নির্ভর করে অনেক বিক্রিয়ার ফলাফল। এছাড়াও বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের উপস্থিতিও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার উপর অনেক প্রভাব ফেলে। এতসব বাধা পেরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণ সৃষ্টি আসলে শুধু কঠিনই নয় প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। আর তাছাড়াও

এখানে এমন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারনাই নেই। তারা অনেক আগেই এরকম একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারনা দিলেও বহু চেষ্টা করেও এখনও পর্যন্ত গবেষণাগারে প্রাণ সৃষ্টির ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

Arman Khandaker বলেছিলেন যে, *প্রাণরসায়ন শুধুমাত্র সম্ভাব্যতার খেলা নয়, কারণ এটা সাধারণ উপাদান কে জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা জটিলতর উপাদানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুপান্তর করতে সক্ষম*।

এই কথাটি বলার আসলে কি মানে ছিল সেটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কারন প্রাণরসায়ন কখনই প্রানের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি। প্রাণরসায়ন যা করে তা হল জীবদেহের ভিতরে কিভাবে রাসায়নিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা করা। যেহেতু জীবদেহের ভিতরে প্রাণরসায়নের যে ক্রিয়া সংঘটিত হয় তা নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া তাই এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আসবেই না। আর জটিল উপাদানে রূপান্তরিত করতে হলে আগে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংঘটিত হতে হবে। কিন্তু যে বিক্রিয়া ঘটার সম্ভাব্যতা এত ক্ষীণ তার উপর আবার সেটা কি এবং কিভাবে হয় সেটাও কেউ জানে না তার ক্ষেত্রে কিভাবে এতো সহজেই এসব কথা বলে দেওয়া যায় তা ঠিক বোঝা গেল না! আর তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ততার কথাটি বললেন তার সম্পর্কে তো আমি আমার প্রথম লেখাতেই বলেছিলাম যে এখনও পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড় বস্তু হতে প্রাণ সৃষ্টির ঘটনা প্রকৃতিতে বা গবেষণাগারে কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। এমন কোন প্রমাণও নেই যে, কখনও কোথাও এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল। প্রাণরসায়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র জীবদেহেই সম্ভব।

যাই হোক এবার একজন বিশেষজ্ঞের মতামত জানা যাক –

Doug Axe, Ph.D, Cal Tech, Worked in Cambridge for 14 years. এই ডাগ এক্স এর একটি প্রশ্ন ছিল যে – "How common (or rear) are functional sequences (i.e., protins) among all the possible combinations of amino acids."

মানে তার প্রশ্নটি হল, একটি সক্ষম বা কর্মক্ষম প্রোটিন অণু অ্যামিনো এসিডের সম্ভাব্য সকল কম্বিনেশন এর মধ্যে কতটা সুলভ বা দুর্লভ?

এর উত্তর তিনি নিজেই গবেষণা করে বের করেছেন। আর উত্তরটি হল:
Functional fold of a given length / Number of sequences of a given length = 1/10^74

অর্থাৎ অ্যামিনো এসিডের মোট সম্ভাব্য সঠিক সিকোয়েন্সের কম্বিনেশন সংখ্যা হল 10^74 (১০ এর পরে আরও ৭৪ টি শুন্য) যেগুলোর মধ্যে কর্মক্ষম প্রোটিন হল মাত্র ১টি। এতগুলো কম্বিনেশন এর মধ্যে একটি কর্মক্ষম প্রোটিন অণু তৈরি হওয়াটা খুব একটা সহজ কাজ নয়।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি প্রোটিন অণু গঠনে আরও কিছু সম্ভাব্যতার ফ্যাক্টর বা কারন বিচার করেন রসায়নবিদ ও জীববিদরা। তার মধ্যে একটি হল রাসায়নিক বন্ড বা বন্ধন। অ্যামিনো এসিডের ২ ধরনের বন্ড আছে। একটি হল পেপটাইড বন্ড এবং অপরটি হল নন–পেপটাইড বন্ড। প্রোটিন অণু গঠনের সময় অ্যামিনো এসিডের অণুগুলো পরস্পরের সাথে পেপটাইড বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়। যদি এমনকি একটি অ্যামিনো এসিডের অণুও নন–পেপটাইড বন্ড দ্বারা যুক্ত হয় তাহলেই আর প্রোটিন অণু গঠিত হবে না। সুতরাং বন্ডের ক্ষেত্রে ১৫০ টি টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১ টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রোটিন তৈরির সম্ভাব্যতা হল 1 IN 2 TO THE POWER 149 (1/2^149) বা 1 IN 10 TO THE POWER 45 (1/10^45) [2^149 কে লগারিদম (log) করে অর্থাৎ log 2^149 = 10^45]।

প্রোটিন তৈরির ক্ষেত্রে আর একটি ফ্যাক্টর হল অ্যামিনো এসিডের প্রকারভেদ। অ্যামিনো এসিড প্রধানত ২ ধরনের হয়। একটি হল বাঁ-আবর্তে ঘূর্ণায়মান অ্যামিনো এসিড এবং অপরটি হল ডান-আবর্তে ঘূর্ণায়মান অ্যামিনো এসিড। প্রোটিন গঠনের জন্য শুধুমাত্র বাঁ-আবর্তে ঘূর্ণায়মান অ্যামিনো এসিডই প্রয়োজন। যদি ১৫০ টি অ্যামিনো এসিডের মধ্যে এমনকি একটিও ডান-আবর্তে ঘূর্ণায়মান অ্যামিনো এসিড এসে পড়ে তাহলেই আর কোন কর্মক্ষম প্রোটিন গঠিত হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রোটিন গঠনের সম্ভাব্যতা হল 1 IN 10 TO THE POWER 45(1/10^45)। সুতরাং সব মিলিয়ে ১৫০ টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১ টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রোটিন

অনু তৈরির সম্ভাব্যতা হল 1/10^74 * 1/10^45 * 1/10^45 = 1/10^164 (1 IN 10 TO THE POWER 164)**!**

এর আগের পর্বে ২০০ টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন প্রোটিন অণু তৈরির সম্ভাব্যতার হিসাব অন্য এক নিয়মে করা হয়েছিল এবং তখন সম্ভাব্যতা ছিল 1/10^260। কিন্তু এই হিসাবটি এতোই বড় যে SCIENTIIFIC CALCULATOR -এ এই হিসাব করতে গেলে MATH ERROR দেখায় এবং দুঃখের বিষয় হল যে ১৫০ টি অ্যামিনো এসিডের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়!

এটাতো গেলো শুধুমাত্র ১ টি প্রোটিনের কথা। স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ডব্লিউ গণনা মতে একটিমাত্র এনজাইম বা প্রোটিন অণু তৈরি হবার সম্ভাবনা হল 1 IN 10 TO THE POWER 20(1/10^20)। বর্তমান পৃথিবীতে জীবজগতে ২০০০ এরও বেশি এনজাইম আছে । স্যার ফ্রেড হোয়েল এবং চার্লস ডব্লিউ গণনা করেন যে RANDOM PROCESS এ CHANCE দ্বারা এই সমস্ত এনজাইম গঠিত হবার সম্ভাবনা হল 1 IN 10 TO THE POWER 40,000(1/10^40000)। কিন্তু যেহেতু বর্তমান জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটিমাত্র প্রোটিন সৃষ্টির সম্ভাবনাই এত মারাত্মক রকমের কম যা ক্যালকুলেটরেও হিসাব করা যায় না সেই ক্ষেত্রে **২০০০ এরও বেশি এনজাইম বা প্রোটিন তৈরির সম্ভাবনা যে কেমন ভয়াবহ রকমের কম হতে পারে তা তো চিন্তাও করা যায় না [(1/10^164)^2000 = 1/10^328000** যদি ২ হাজারটি প্রোটিনের প্রত্যেকটিকে আমরা ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রোটিন অণু হিসাবে ধরি!!!]। আর যদি সমগ্র পৃথিবীর পুরো জীব বৈচিত্র উদ্ভবের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা হিসাব করা হয় তাহলে তো ……..!!!!!

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৮: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৩ (ছক্কা বনাম প্রোটিন)

পূর্বের অংশে আমরা জেনেছি ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি প্রোটিন অনু তৈরির সম্ভাব্যতা হল ১/১০^১৬৪! এবারে ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভাব্যতার সাথে প্রোটিন সৃষ্টি হবার সম্ভাব্যতার ব্যাপারটির তুলনা করে দেখাই। প্রথমে ছক্কায় ছয় উঠার সম্ভাব্যতাটি হিসাব করে দেখা যাক। ব্যাপারটি ভালভাবে বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনাকে একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে মনোযোগ সহকারে লেখাটি ভালভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যদি আমরা ১টি ছক্কাকে চাল দিই তবে সেই ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভাবনা হল ১/৬ = ০.১৭। এর কারন হল ১টি ছক্কায় থাকে ৬টি দিক বা মুখ। সুতরাং প্রতিটি দিকেরই আসার সম্ভাবনা হল ৬ এর মধ্যে ১। তবে এর মানে এই নয় যে ৬ বার ছক্কা মারলে ষষ্ঠবারে ছক্কা উঠবেই। অথবা এর মানে এও নয় যে ছক্কা মারলে ৬ বারের মধ্যেই যেকোনো একবার ছক্কা উঠে যাবে। বরং এর মানে এই যে, ১টি ছক্কায় ৬ উঠার ঘটনাটি হল ৬টি সম্ভাব্য ঘটনার মধ্যে ১টি ঘটনা। এখন এই ৬টি ঘটনার মধ্যে যেকোনো ১টিই ঘটতে পারে। ছক্কার প্রতিটি দিকেরই আসার সম্ভাবনা সমান। ১টি ছক্কাকে যতবারই মারা হোক না কেন এর পিঠগুলো উঠার সম্ভাবনা সবসময় একই মানে ১/৬ ই থেকে যাবে। অর্থাৎ ছক্কা মারার সময় প্রতিবারই ছক্কার সম্ভাব্যতা একই থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। এখন ১টি ছক্কা মারলে হয়তো প্রথমবারেই ৬ উঠে যেতে পারে আবার ১০ বার বা এর বেশিবার পর্যন্ত মারলেও হয়তো নাও উঠতে পারে। তবে ১টি ছক্কার ক্ষেত্রে ৬ উঠাটা আসলে তেমন কোন ব্যাপারই নয়। কারন ১টি ছক্কার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা

খুবই কম থাকে। যেহেতু ১টি ছক্কার ৬টি দিক বা মুখ থাকে তাই ঘটনার সংখ্যাও থাকে মাত্র ৬টি! এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার শতকরা হিসাব [PERCENTAGE] হল (১/৬) X ১০০ = ১০০/৬ = ১৬.৬৬৬৬৬৭ = ১৬.৭% অর্থাৎ ১টি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভাব্যতা শতকরা ১০ এর বেশ উপরে [প্রায় ১৭ এর কাছাকাছি]। সুতরাং ঘটনাটি ঘটতেই পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে একটি ছক্কার প্রত্যেকটি দিকের আসার সম্ভাবনাই একদম সমান। তাই এর যেকোনোটিই আসতে পারে। তবে সমস্যা হয় তখন যখন ছক্কার সংখ্যা অনেক বেশি হয়। ছক্কার সংখ্যা যত বেশি হবে সকল ছক্কায় একই সংখ্যার বা একই পিঠের কম্বিনেশন পাওয়া ততই কঠিন হবে, যেহেতু সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সকল ঘটনার সম্ভাব্যতাও আর সমান থাকবে না। এখন প্রশ্ন হল, আমরা একাধিক ছক্কার ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভাব্যতার হিসাব বের করবো? এটা আসলে খুব একটা কঠিন কিছু নয়। ছক্কার সংখ্যা যতগুলো হবে ততগুলো ১/৬ পরস্পরের সাথে গুন করে দিতে হবে অথবা যতগুলো ছক্কা থাকবে ঠিক সেই সংখ্যাটি ১/৬ এর উপরে শক্তি (Power) হিসেবে বসাতে হবে।

এর মানে হল, ১টি নমুনা ক্ষেত্রে বা ১টি নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে ১২টি ছক্কায় একসাথে ১২টি ৬ উঠার সম্ভাবনা হল –

(১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) = (১/৬)^১২ = ১/২১৭৬৭৮২৩৩৬ = ৪.৫৯৩৯৩৬৫৮ X ১০^ -১০ = ০.০০০০০০৪৫৯ X ১০^-৩ = ০.০০০০০০০০০৪৫৯

এর অর্থ হল যে ১টি নমুনা ক্ষেত্রে ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠার সম্ভাবনা হল ২১৭৬৭৮২৩৩৬ (২১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৬) এর মধ্যে মাত্র ১! তবে তার মানে এই নয় যে, ১২টি ছক্কা ২১৭৬৭৮২৩৩৬ বার মারলেই সর্বশেষবারে একত্রে ১২টি ছয় উঠে যাবে অথবা এর মানে এও নয় যে, ২১৭৬৭৮২৩৩৬ বার ছক্কা মারলে এর মধ্যে যেকোনো একবার সবগুলোতে একত্রে ৬ উঠবেই। বরং এর মানে এই যে, ১২টি ছক্কা মারলে প্রত্যেকটিতে একইসাথে ৬ উঠার ঘটনাটি হল ২১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৬ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি ঘটনা!! আসলে ১২টি ছক্কা দিয়ে সব মিলিয়ে ২১৭৬৭৮২৩৩৬ ধরনের কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। যাই হোক, এবার ১২টি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভাবনাকে শতকরাতে (PERCENTAGE) হিসাব করে দেখানো যাক, (১/২১৭৬৭৮২৩৩৬) X ১০০ = ১০০/ ২১৭৬৭৮২৩৩৬ =

০.০০০০০০০০৪৫% অর্থাৎ ১২টি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে আমরা যদি ২১৭৬৭৮২৩৩৬ এর মধ্যে না হিসাব করে ১০০ এর মধ্যে ধরে হিসাব করি তাহলে ১০০ এর মধ্যে সম্ভাব্যতা হল ০.০০০০০০০৪৫। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে ১২টি ছক্কার প্রত্যেকটিতে একসাথে ৬ উঠার ঘটনাটি হল প্রতি ১০০টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ০.০০০০০০০৪৫টি ঘটনা!

গাণিতিক হিসাবের একটি স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম হল দশমিকের পর সাধারনত ২টি ঘর পর্যন্ত মান বসানো। দশমিকের পরে ৩ ঘর পর্যন্ত থাকলে ৩ ঘর পর্যন্তই লেখা হয় কিন্তু ৪ বা ৫ ঘর পর্যন্ত থাকলে আবার সাধারনত ২ ঘর পর্যন্তই লেখা হয়। যদি ৩য় ঘরের মান ৫ বা ৫ এর বেশি হয় তবে দশমিকের পরে ২য় ঘরটির সংখ্যার সাথে আরও ১ যোগ করা হয়। এর কারন হল দশমিকের ২ ঘরের পরের ঘর থেকে অর্থাৎ ৩য় ঘর থেকে শুরু করে পরবর্তী ঘরগুলোতে যেসকল মান পাওয়া যায় সেগুলো সমস্তই অত্যন্ত নগণ্য। বিশেষ করে সেগুলো যদি ৫ এর কম হয় তাহলে তো তাদেরকে নির্বিচারে ১ যোগ করা ছাড়াই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এই কারনেই এদেরকে গনায় না ধরলেও চলে। অবশ্য অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের জন্য দশমিকের পরের সকল ঘরেরই হিসাব রাখতে হয় কিন্তু বড় বড় বা সাধারণ হিসাবের ক্ষেত্রে সেগুলো না ধরলেও কিছু আসে যায় না। এই নিয়মটি গনিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান সর্বোপরি বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই অনুসরন করা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে দশমিকের পরে আমরা সাধারনত সর্বোচ্চ ২ ঘর অথবা কখনও কখনও ৩ ঘর পর্যন্ত মান নিই সেখানে ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠার শতকরা সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে দশমিকের পরে ৭ ঘর পর্যন্ত শূন্য রয়েছে! অর্থাৎ আমরা যদি গনিতের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম অনুসারে দশমিকের পর ২ বা ৩ ঘর পর্যন্ত মান নিই তাহলে একটি নমুনা ক্ষেত্রে ১২ টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠবার সম্ভাবনা হয় শতকরা শূন্য (০%)!! এমনকি আমরা যদি এই ক্ষেত্রে দশমিকের পরে ৭ ঘর পর্যন্তও মান নিই তাহলেও নির্দিষ্ট ১টি নমুনাক্ষেত্রে ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠবার সম্ভাবনা শতকরা শূন্যই থেকে যায় (০.০০০০০০০% = ০%)!!! আবার যেখানে আমরা দশমিকের পর ৪র্থ ঘরের মানকেই নগণ্য হিসেবে ধরি সেখানে দশমিকের পর ৮ম ঘরের মান আরও বেশি নগণ্য হবে। উপরন্তু ৮ম ঘরের মান ৫ এরও কম যা সংখ্যাটিকে আরও অত্যন্ত নগণ্য করে তুলেছে। এছাড়াও ১০০ এর বিপরীতে ০.০০০০০০০৪৫ সংখ্যাটি সত্যিই বেশ নগণ্য। আর আমরা যদি শতকরা সম্ভাবনা না ধরে সম্ভাবনার স্বাভাবিক হিসাবটিই অর্থাৎ ০.০০০০০০০০০৪৫৯

এই সংখ্যাটি দিয়ে হিসাব করি তাহলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। এক্ষেত্রে ৯টি শূন্যের পর পাওয়া যায় ৫ এরও কম একটি মান। অর্থাৎ ১২ টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠবার সম্ভাবনাকে আসলে শূন্য হিসেবে প্রকাশ করা হলেও খুব একটা ভুল কিছু করা হবে না। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট গাণিতিক হিসাবের মধ্যে যখন অনেকগুলো শূন্যের পরে একটি মান আসে তখন তাকে শূন্য না লিখে সেভাবেই প্রকাশ করা হয় যাতে এর প্রচণ্ড ক্ষুদ্র মান সম্পর্কে আমরা ধারনা পেতে পারি। যেমন, ইলেকট্রনের ভর হল ৯.১১X১০^-২৮ গ্রাম। এটি প্রচণ্ড ক্ষুদ্র একটি ভর। কিন্তু তবুও এর ভরের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে ধারনা দেবার জন্য শূন্য না লিখে সরাসরি এই মানটিই লেখা হয় যেহেতু সামান্য হলেও এর একটি ধনাত্মক (POSITIVE) মান আছে। কিন্তু ১টি পরমাণুর মোট ভর হিসাব করার ক্ষেত্রে আবার ইলেকট্রনের ভরকে হিসাবে আনা হয় না। ১টি ইলেকট্রনের ভরের ক্ষুদ্রতা বোঝানোর জন্য এভাবে তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে যে, ১টি ইলেকট্রন হল ১টি প্রোটন বা নিউট্রন কনিকা অথবা ১টি হাইড্রোজেন পরমাণুর থেকে ১৮৩৮ গুন হালকা। ১টি হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে ১টি প্রোটন ও ১টি ইলেকট্রন। এই হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর এবং ১টি প্রোটনের ভর আসলে একই ধরা হয় যেহেতু ১টি ইলেকট্রনের ভর ১টি প্রোটনের ভরের তুলনায় অতি মাত্রায় নগণ্য। এছাড়াও ১টি পরমাণুতে যতগুলো ইলেকট্রনই থাকুক না কেন, এমনকি এদের সম্মিলিত ভরও এতই নগণ্য হয় যে পরমাণুর ভর মাপার সময় এদের সম্মিলিত ভরকেও সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েই হিসাব করা হয়। ইলেকট্রনের এই উদাহরণটি দেবার উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানোর জন্য যে বিশাল কোন মানের বিপরীতে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন কিছুর মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলে সেই ক্ষুদ্র মানকে উপেক্ষা করলেও কোন সমস্যা হয় না। অর্থাৎ সেই মানকে সহজেই আমরা শূন্য ধরতে পারি। এখানে অবশ্য আরও ১টি সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়- সমুদ্রের পানিতে এক বালতি পানি ঢাললে যেমন সমুদ্রের পানির কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না ঠিক তেমনি হাজার বালতি পানি ঢাললেও কোন পরিবর্তন চোখে পড়বে না। কারন ১ বালতি বা হাজার বালতি পানি উভয়েই সমুদ্রের পানির পরিমাণের কাছে অত্যন্ত মাত্রায় নগণ্য। সুতরাং ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ উঠার সম্ভাব্যতাকে শূন্য ধরা সম্ভব যেহেতু ২১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৬ টি ঘটনার বিপরীতে ১টি ঘটনা অত্যন্ত স্বল্প মাত্রার মান বহন করে।

এমনকি আমরা যদি গাণিতিক হিসাব বাদ দিয়ে সাধারন জ্ঞান দিয়েও ব্যাপারটি চিন্তা করি তাহলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভবই হয়ে যায়। কারন "১২ টি ছক্কার প্রতিটিতে একত্রে ৬

উঠার সম্ভাবনা আছে কি নেই?" এধরনের কোন প্রশ্ন করা হলে সাধারণ কমন সেন্স আছে এমন যেকোনো নিরপেক্ষ মানুষই বলবে যে **এটি একটি অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার।**

তবে এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে এই যে, ১২টি ছক্কায় ছয় উঠার সম্ভাবনা যেহেতু ২১৭৬৭৮২৩৩৬টি ঘটনার মধ্যে ১টি ঘটনা সেহেতু কেন এই ঘটনাটি ঘটতে পারে না? এর উত্তর হল ১২টি ছক্কার মধ্যে সংখ্যার যেসকল কম্বিনেশন দেখা যেতে পারে তার মধ্যে অধিকাংশেরই আসার সম্ভাবনা ১২টি ৬ এর কম্বিনেশন আসার সম্ভাবনা থেকে অনেক বেশি। ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ উঠা হল ১২টি ছক্কার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতাসম্পন্ন কম্বিনেশন। এই সর্বনিম্ন সম্ভাব্যতাসম্পন্ন কম্বিনেশন সব মিলিয়ে আছে ৬টি অর্থাৎ এরকম সর্বনিম্ন সম্ভাব্যতাসম্পন্ন ঘটনা হল ৬টি। সেই কম্বিনেশন বা ঘটনাগুলো হল- (ক) ১২টি ১, (খ) ১২টি ২, (গ) ১২টি ৩, (ঘ) ১২টি ৪, (ঙ) ১২টি ৫ এবং (চ) ১২টি ৬। আর বাকি সকল কম্বিনেশনই অর্থাৎ বাকি ২১৭৬৭৮২৩৩০টি কম্বিনেশনই এই ৬টি কম্বিনেশন থেকে অনেক বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন। যেমন, ১২টি ছক্কার কিছু কিছু কম্বিনেশন আসার সম্ভাব্যতা হতে পারে ২১৭৬৭৮২৩৩৬টি ঘটনার মধ্যে ৮টি ঘটনা, আবার কিছু কিছু হতে পারে ২১৭৬৭৮২৩৩৬টি ঘটনার মধ্যে ১০টি বা ১২টি ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

এধরনের কম্বিনেশন অবশ্যই ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ আসার থেকে অনেক বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এধরনের বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কম্বিনেশনই দেখা যাবে। অর্থাৎ যেসকল কম্বিনেশন আসার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি সেগুলোকেই বেশি বেশি দেখা যাবে আর যেসকল কম্বিনেশন আসার সম্ভাবনা কিছুটা কম সেগুলোকে দেখাও যাবে কম। ১২টি ছক্কার ক্ষেত্রে দুটি ১, দুটি ২, দুটি ৩, দুটি ৪, দুটি ৫ ও দুটি ৬ এই কম্বিনেশনটি আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারন ১২টি ছক্কায় বিভিন্নভাবে এই কম্বিনেশন করা সম্ভব। এই কম্বিনেসনের মতো এতভাবে আর কোন কম্বিনেশন ১২টি ছক্কার ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়। তাই ১২টি ছক্কা অসংখ্যবার মারলে এই ঘটনাটিই বা এর কাছাকাছি ধরনের কোন ঘটনা বা কম্বিনেশন দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি। এই সকল অধিক সম্ভাব্বতাসম্পন্ন কম্বিনেসনের বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটার জন্যই ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ এর কম্বিনেশন কখনই দেখা যাবে না।

এই পর্যন্ত আমার এতগুলো কথাবার্তা লেখার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে এটা বোঝানো যে কেন ১২টি ছক্কায় একত্রে ১২টি ৬ উঠা সম্ভব নয়। এটি যদিও ১টি কমন সেন্সের ব্যাপার যে এটি অসম্ভব কিন্তু তবুও যারা কমন সেন্সের ধার না ধেরে এই অতি ক্ষুদ্র পজিটিভ সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক করতে চান তাদের উদ্দেশেই এই দীর্ঘ বর্ণনা। তাছাড়াও এই লেখার আর একটি উদ্দেশ্য হল মানুষকে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি সচ্ছ ধারনা দেওয়া।

তবে এই সম্পূর্ণ লেখাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব জীবনের একটি নিয়ন্ত্রণহীন ও এলোমেলো ঘটনার সাথে বিবর্তনবাদের গোড়ার দিকের এলোমেলো প্রক্রিয়ায় প্রাণ সৃষ্টির একটি তুলনা দেখানো। ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ এর কম্বিনেশন আসাটা RANDOM প্রক্রিয়াতে নিঃসন্দেহে একটি অসম্ভব ব্যাপার। আমরা আগেই জেনেছি, ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি প্রোটিন অণু তৈরির সম্ভাব্যতা ১/১০^১৬৪ বা ১০^১৬৪ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি! কিন্তু যেখানে ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ এর কম্বিনেশন আসার মতো ঘটনা ঘটা অসম্ভব সেখানে কিভাবে এর থেকেও আরও জিলিওন জিলিওন (!) বা কোটি কোটি কোটি কোটি (!) গুণ কম সম্ভাব্যতা নিয়েও ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি প্রোটিন অনু গঠিত হতে পারে **[আসল হিসাবটি হল ৪.৫৯ X ১০^১৫৪ গুন]**? তার উপরে আবার বর্তমানে পৃথিবীতে ২০০০ এরও বেশি এনজাইম বা জৈব প্রভাবক (এক বিশেষ গঠনের গ্লোবিউলার প্রোটিন) পাওয়া যায়। যদি আমরা একে রাউণ্ড ফিগারের জন্য ২০০০ ধরে নিই তাহলে ২০০০টি এনজাইম সৃষ্টির সম্ভাব্যতা দাঁড়ায় (১/১০^১৬৪)^২০০০ = ১/১০^৩৩৬০০০! মানে ২০০০টি এনজাইম সৃষ্টি হল ১০^৩৩৬০০০টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি ঘটনা!! ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ উঠার মতই প্রোটিনও অ্যামিনো এসিডের কম্বিনেশনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কম্বিনেশন। কিন্তু ১২টি ছক্কার মতো এত বেশি (!!!) সম্ভাব্যতাসম্পন্ন ঘটনা যেখানে চান্স দ্বারা ঘটতে দেখা যায় না সেখানে প্রোটিন সৃষ্টির মতো এত ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা নিয়েও কিভাবে চান্স দ্বারা কারও কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণের উৎপত্তি হবে? অথচ এখনও প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল সম্ভাব্যতার ফ্যাক্টরগুলো হিসাব করে যোগই করে দেখানো হয়নি!

সহায়ক তথ্যসূত্রসমূহ:

১। উচ্চ মাধ্যমিক বলবিদ্যা ও বিচ্ছিন্ন গণিত; ৭ম সংস্করণ; লেখক – এম এ জব্বার (২য় অধ্যায় – সম্ভাব্যতা)

২। উচ্চ মাধ্যমিক বলবিদ্যা ও বিচ্ছিন্ন গণিত; দশম সংস্করণ; লেখক – মোজাম্মেল হক ও হারুনুর রশীদ (২য় অধ্যায় – সম্ভাব্যতা)

৩। উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন প্রথম পত্র; অষ্টম সংস্করণ; লেখক – ডঃ গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, ডঃ মোঃ মনিমুল হক, ডঃ মোঃ রবিউল ইসলাম (২য় অধ্যায় – পরমাণুর গঠন)

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–৯: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৪ (সুনির্দিষ্ট জটিলতা)

পূর্বের অংশে ১২টি ছক্কায় একত্রে ১২টি ৬ আসার সম্ভাব্যতার সাথে ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি প্রোটিন অণু সৃষ্টি হবার সম্ভাব্যতাকে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। এখন বিবর্তনবাদের একজন অন্যতম সমালোচকের একটি তত্ত্বের কথা তুলে ধরে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই এই গবেষকের একটি সর্ট বায়োগ্রাফি দিয়ে শুরু করি।

উইলিয়াম আলবার্ট "বিল" ডেম্বস্কি (William Dembski) অনিয়ন্ত্রিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের বিকাশ এবং সেখান থেকে বিবর্তনের তত্ত্বের একজন অন্যতম সমালোচক। তিনি ১৯৬০ সালে শিকাগোর ইলিনয়ে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মা একজন আর্ট ডিলার (art dealer) ছিলেন এবং তাঁর বাবা ছিলেন কলেজের প্রফেসর এবং লেকচারার। ডেম্বস্কির পিতা ইউনিভার্সিটি অফ এরল্যাংগেন-নুরেমবারগ (University of Erlangen-Nuremberg) থেকে জীববিজ্ঞানের উপরে ডক্টর অফ সাইন্স বা ডি.এসসি (D.Sc) লাভ করেন। তিনি বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (evolutionary biology) শিক্ষা দিতেন। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই ডেম্বস্কি ইভল্যুশন ফ্রেন্ডলি একটি পরিবেশে বড় হয়েছেন। ডেম্বস্কি ১৯৮১ সালে শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় (University of Illinois) থেকে মনোবিজ্ঞানের উপর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮৩ সালে পরিসংখ্যানের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এরপরে ১৯৮৫ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো (University of Chicago) থেকে গণিতের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় থেকে দর্শন শাস্ত্রের উপরও একটি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ সালে প্রিন্সটন থিওলজিক্যাল সেমিনারি (Princeton Theological Seminary) থেকে থিওলজি (theology) বা ধর্ম তত্ত্বের উপর মাস্টার অফ ডিভিনিটি (Master of Divinity)

লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি ১৯৯৯ সালে বেইলর ইউনিভার্সিটির (Baylor University) তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রবার্ট বি. স্লোন (Robert B. Sloan) কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। বেইলর ইউনিভার্সিটিতে রবার্ট স্লোন "মাইকেল পোলানি সেন্টার" (Michael Polanyi Center) প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ডেম্বস্কিকে আমন্ত্রন জানান। ১৯৯৯ সালে ডেম্বস্কি একজন পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসেবে ডিসকভারি ইন্সটিটিউটের (Discovery Institute) সাইন্স এন্ড কালচার (Center for Science and Culture) বিভাগে যোগদান করেন। ২০০৮ সাল থেকে তিনি সেখানকার একজন সিনিয়র ফেলো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এছাড়াও ডেম্বস্কি বর্তমানে উত্তর ক্যারোলিনার ম্যাথিউসে অবস্থিত সাউদারন ইভেঞ্জেলিকাল সেমিনারির (Southern Evangelical Seminary) কালচার এন্ড সাইন্স এর ফিলিপ ই. জনসন রিসার্চ প্রফেসর হিসেবে কর্মরত অবস্থায় আছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ডেম্বস্কি প্রবাবিলিটি, চান্স, কমপ্লেক্সিটি, ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ের উপরে ৫টি বই লিখেছেন এবং তিনি আরও ৭টি বইয়ের সহ লেখক। এছাড়াও তিনি আরও ৬টি বইয়ের সম্পাদক বা সহায়ক ছিলেন।

[ডেম্বস্কির এই সংক্ষিপ্ত বায়োগ্রাফি এখানে দেবার উদ্দেশ্য হল এই যে, কারও মনে যেন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও পারিবারিক ব্যাকগ্রাউনড নিয়ে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে।]

ডেম্বস্কি বলেন যে জীবজগতের এই অসাধারন জীব বৈচিত্র্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ পরিসংখ্যানগতভাবে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন (natural selection) দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। তিনি অনিয়ন্ত্রিত বিবর্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উদ্ভবের বিপক্ষে গণিত ও ইনফরমেশন থিওরির (information theory) উপর ভিত্তি করে স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি বা সুনির্দিষ্ট জটিলতা (Specified complexity) নামে একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্বটি এলোমেলো একটি সিস্টেম থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের গাণিতিকভাবে বিরোধিতা করে। তাঁর মতে এই তত্ত্বটি একজন প্রচন্ড বুদ্ধিমান ডিজাইনার বা স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে নির্দেশ করে। এই তত্ত্বটি ডিসকভারি ইন্সটিটিউট এবং বুদ্ধিমান ডিজাইনের (intelligent design) সমর্থকদের একটি অন্যতম প্রমাণ। এই তত্ত্বের সরাসরি কোন ব্যাবহার গনিত বা ইনফরমেশন থিওরিতে করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তাই বিজ্ঞান মহলের এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করার এটি একটি কারণ। অবশ্য সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে বিবর্তনবাদেরও কোন ব্যাবহারিকতা বা উপকারিতা নেই! বরং ক্ষেত্র বিশেষে

আছে অপকারিতাই!! তবে সেটি পরের বিষয়। ডেম্বস্কির দেওয়া তত্ত্বটিকে ইন্টালিজেনট ডিজাইনের সমর্থক একাডেমিক ও বিজ্ঞানীরা একযোগে মেনে নিলেও তাঁর তত্ত্বটি মিডিয়াতে তেমনভাবে প্রচার পায়নি। এছাড়াও ডেম্বস্কির সকল লেখাতেই বিজ্ঞান ও দর্শনকে একত্রে উপস্থাপন করার কারনেও অনেকের কাছে তাঁর লেখা গ্রহণযোগ্য হয়নি যেহেতু অনেক বিজ্ঞানীর কাছেই দর্শন তত্ত্ব খুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ফলে তার তত্ত্বকেও তারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।

স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি টার্মটি সর্বপ্রথম লেসলি অরগেল (Leslie Orgel) নামক প্রাণের উদ্ভবের (origin of life) একজন গবেষক ব্যাবহার করেন জীবকে জড় বস্তু হতে পৃথক করার জন্য। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞানুসারে স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি:

সংক্ষেপে, জীবদেরকে তাদের সুনির্দিষ্ট জটিলতা দ্বারা পার্থক্য করা যায়। ক্রিস্টালকে সাধারনত সরল ও সুনির্দিষ্ট গঠনের নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়, কারন ক্রিস্টালে অনেকগুলো একইরকম অণু একত্রে একই অবস্থায় থাকে। গ্রানাইটের স্তূপ বা পলিমারের এলোমেলো মিশ্রণ হল জটিল কিন্তু তারা সুনির্দিষ্ট নয়। ক্রিস্টাল জীবন্ত হবার যোগ্য নয় কারন তার মধ্যে জটিলতা কম; আর পলিমারের মিশ্রণ জীবন্ত হবার যোগ্য নয় কারন তার মধ্যে সুনির্দিষ্টতা কম।

পরবর্তীতে এই টার্মটি পল ডেভিস (Paul Davies) নামের একজন পদার্থবিদ দ্বারা ব্যাবহৃত হয়:

জীবরা তাদের জটিলতার কারনে রহস্যময় নয়, বরং তাদের দৃঢ় সুনির্দিষ্ট জটিলতার কারনে রহস্যময়।

ডেম্বস্কি টার্মটিকে বর্ণনা করেন এভাবে:
স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি সে সকল কনফিগারেশনে অবস্থান করে যেসকল কনফিগারেশনকে এমন কোন ধরনের প্যাটার্ন দ্বারা বর্ণনা করা যায় যা কিনা বিশাল আকারের জটিল এবং একই সাথে সুনির্দিষ্ট তথ্যকে স্বাধীনভাবে প্রদর্শন করে।

ডেম্বস্কি বিষয়টি আরও পরিষ্কার করার জন্য একটি সহজ ও সাধারণ উদাহরণ দেন:
বর্ণমালার কোনো অক্ষরই জটিল নয় কিন্তু সুনির্দিষ্ট। আবার এলোমেলো কতগুলো অক্ষর দ্বারা সৃষ্ট একটি দীর্ঘ বাক্য সুনির্দিষ্ট নয় কিন্তু জটিল। তবে শেক্সপিয়ারের একটি সনেট একই সাথে জটিল এবং সুনির্দিষ্ট।

বাস্তব ক্ষেত্রে এমন আরও অনেক ধরনের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমনঃ "I HAVE A PEN" এই বাক্যের প্রতিটি অক্ষরই সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের কাজ একদম সুনির্দিষ্ট কিন্তু এই অক্ষরগুলোর কোনটিই জটিল নয়। আবার এই অক্ষরগুলোকে একত্রে ইচ্ছামতো সাজানো হলে সেটি জটিল হবে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ বহন করবে না। যেমন – "AENP IAH EV" বাক্যটি কোন অর্থ বহন না করলেও এর গঠন কিছুটা জটিল। তবে যখন এই অক্ষরগুলো দিয়ে "I HAVE A PEN" বাক্যটি রচনা করা হয়, তখন কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যাবহার করার কারনে সেটি জটিল তো হবেই সেই সাথে আবার এই বাক্যটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্যাটার্ন বা সিকোয়েন্স অনুসরণ করে সাজিয়ে নির্দিষ্ট একটি অর্থ প্রকাশ করা যায় বলে এটি সুনির্দিষ্টও। কোন বানরকে যদি একটি টাইপ রাইটার বা কোন ধরনের টাইপিং মেশিন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং বানরটি যদি সেই টাইপ রাইটারে ইচ্ছামতো বাটন চাপতে থাকে (অর্থাৎ টাইপিং যদি অপরিকল্পিত ও এলোমেলোভাবে হয়ে থাকে) তাহলে "I HAVE A PEN" এই বাক্যটি তৈরি হয়ে যাওয়া সম্ভব না। এর কারন হল ইংরেজি বর্ণমালাতে ২৬টি বর্ণ রয়েছে। এর সবগুলো বাটনই ওই টাইপ রাইটারে থাকবে। এছাড়াও এক থেকে শূন্য পর্যন্ত আরও মোট ১০টি বাটন সংখ্যার জন্য বরাদ্দ থাকে। অর্থাৎ মোট বাটন সংখ্যা হয় ৩৬টি। এই ৩৬টি বাটন ছাড়াও টাইপ রাইটারে আরও অনেক বাটন থাকে, যেমন – স্পেস বার, ক্যাপস লক ইত্যাদি। টাইপিং মেশিনের সকল বাটন হিসাব করলে দেখা যায় যে "I HAVE A PEN" বাক্যটি গঠন করতে যে কয়টি অক্ষর প্রয়োজন হয়েছে বানরটির আঙ্গুলের চাপ সেসকল বাটনে পড়ার সম্ভাবনা তুলনামুলকভাবে কম, তবে অসম্ভব না। কিন্তু বাটনে চাপ পড়লেই শুধু হবে না। বানরের এলোমেলো চাপগুলো প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলোর উপরে পরপর পড়তে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমানে স্পেসও প্রয়োজনীয় স্থানে থাকতে হবে। অর্থাৎ ইংরেজি – A, E, H, I, N, P, V এই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অক্ষরের সুনির্দিষ্ট একটি এলাইনমেনট বা বিন্যাস ও সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহে সুনির্দিষ্ট পরিমান স্পেসের কম্বিনেশনের ফলেই "I HAVE A PEN" এই বাক্যটির সৃষ্টি হবে। তবে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যটির ভিতরে আবার A এবং E এই

অক্ষর দুটি ২ বার করে আছে এবং স্পেস আছে তিনবার অর্থাৎ এখানে রিপিটেসন বা পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট এলাইনমেনট এবং কম্বিনেশনের সাথে আবার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ রিপিটেসনও যুক্ত হয়েছে।

এখন আমরা একটি টাইপিং মেশিনের কথা চিন্তা করি যেখানে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরের জন্য ২৬টি, ১ থেকে শূন্য পর্যন্ত ১০টি সংখ্যার জন্য ১০টি, স্পেসের জন্য ১টি বাটন এবং একটি এন্টার বাটন বিদ্যমান। তাহলে আমরা ৩৮টি বাটন বিশিষ্ট একটি টাইপিং মেশিন পেলাম (যদিও একটি টাইপিং মেশিনে সাধারনত আরও কিছু বাটন থাকে)।

<u>এবার আমরা দেখবো যে এধরনের একটি টাইপিং মেশিনের বাটন প্রেস করার মাধ্যমে ঠিক কতো প্রকারের কম্বিনেশন প্রস্তুত করা যেতে পারে:</u>
৩৮টি বাটন দ্বারা সর্বমোট কম্বিনেসন তৈরি করা যেতে পারে, n^r = ৩৮^৩৮ = ১০^৭০টি [10 to the power 70] (প্রায়)

এখানে n = ৩৮ হল মোট বাটন বা চয়েস সংখ্যা এবং r = ৩৮ হল প্রতিবারে টাইপিং মেশিনে যত সংখ্যক বার বাটন প্রেস করা হয় তার সংখ্যা। অর্থাৎ ১ এর পরে আরও ৭০টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই হল মোটামোটি ভাবে ৩৮টি বাটন দ্বারা সৃষ্ট কম্বিনেশন সংখ্যা। এখন এই ১০^৭০ সংখ্যাটির ভিতরে রিপিটেসন বা পুনরাবৃত্তি সহ এবং রিপিটেসন ছাড়া সব ধরনের কম্বিনেশনই রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ওই কল্পিত টাইপিং মেশিনের ৩৮টি বাটন এলোমেলোভাবে ৩৮ বার বা তার থেকে কম সংখ্যক বার চেপে গেলে যে কম্বিনেশন আসবে তা ১০^৭০টি কম্বিনেশনের মধ্যেই থাকবে।

এই হিসাবটি হল সঠিক হিসাবের প্রায় কাছাকাছি একটি হিসাব। যারা এই হিসাবটি বুঝতে পারেনি তাদের বোঝার সুবিধার্থে ২টি উদাহরণ:

<u>১ম উদাহরণ:</u> ধরি, ২টি অক্ষর ‘ক’ ও ‘খ’ দ্বারা রিপিটেসন বা পুনরাবৃত্তিসহ ২টি অক্ষর বিশিষ্ট কতটি কম্বিনেসন তৈরি করা সম্ভব তা আমাদের জানতে হবে।
সেক্ষেত্রে আমরা অক্ষর দুটিকে সাজিয়ে দেখি,

কখ, খক, কক, খখ

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা দুটি অক্ষর বা চয়েস থেকে রিপিটেসনসহ দুই অক্ষর বিশিষ্ট চার ধরনের কম্বিনেশন তৈরি করতে পারি। দেখা যাক যদি আমরা রিপিটেসন সহ কম্বিনেশন বের করার সূত্রটি প্রয়োগ করি তাহলে কি পাওয়া যায়,

$$n^r = ২^২ = ২ X ২ = ৪টি$$

অর্থাৎ কম্বিনেশন সংখ্যা হচ্ছে চার যা আমাদের উপরে সাজানো কম্বিনেশন সংখ্যার সাথে মিলে গেলো। এখানে মোট অক্ষর বা চয়েস সংখ্যা হচ্ছে n = ২ এবং যত সংখ্যক অক্ষর ব্যাবহার করে কম্বিনেশন তৈরি করবো তা হচ্ছে r = ২।

২য় উদাহরণ: ধরি, তিনটি অক্ষর ক, খ এবং গ দেওয়া আছে। এই অক্ষর তিনটি দিয়ে রিপিটেসন সহ ২ অক্ষর বিশিষ্ট কতগুলো কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব তা আমাদের জানতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা অক্ষর তিনটিকে ২টি অক্ষরের কম্বিনেশনে সাজিয়ে দেখি,

কখ, কগ, খগ, খক, গক, গখ, কক, খখ, গগ

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এখানে তিনটি অক্ষর বা চয়েস থেকে রিপিটেসনসহ দুটি অক্ষর বিশিষ্ট কম্বিনেশন গঠন করা যায় ৯টি।

এবারে আমরা পুনরায় রিপিটেসনসহ কম্বিনেশন বের করবার সূত্রটি প্রয়োগ করে পাই,

$$n^r = ৩^২ = ৩ X ৩ = ৯টি$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখানেও আমাদের উপরে বের করা কম্বিনেশন সংখ্যার সাথে সূত্রের সাহায্যে বের করা ফলাফল মিলে গিয়েছে। এখানে মোট অক্ষর বা চয়েস সংখ্যা হচ্ছে n = ৩ এবং যত সংখ্যক অক্ষর ব্যাবহার করে প্রতিটি কম্বিনেশন তৈরি করবো তা হচ্ছে r = ২।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা টাইপিং মেশিনের ৩৮টি বাটনকে এলোমেলোভাবে ৩৮ বার চাপলে সম্ভাব্য যত সংখ্যক কম্বিনেশন আসতে পারে তার সংখ্যা বের করেছি সূত্রের সাহায্যে। কিন্তু ৩৮ বার এর থেকে কম সংখ্যক বার বাটন চাপার ব্যাপারটির তাহলে কি হল? আসলে আমাদের টাইপিং মেশিনে স্পেসের ব্যাবহার করার কারনে ১০^৭০ সংখ্যক কম্বিনেশনের ভিতরেই অন্যান্য সকল কম্বিনেশনও পেয়ে যাবো। তবে এক্ষেত্রে "I HAVE A PEN" বাক্যটির আশেপাশে স্পেস দিয়ে অন্য কোন সিকোয়েন্সও থাকতে পারে। অর্থাৎ আমরা আমাদের

কাঙ্খিত সিকোয়েন্স ঠিকই পাবো তবে তার পাশাপাশি অন্যান্য কিছু কম্বিনেশন বা সিকোয়েন্সও থাকবে। তবে এটা অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয় হতে পারে যে কিভাবে ১০^৭০টি [১ এর পরে ৭০টি শূন্য] কম্বিনেশনের মধ্যে "I HAVE A PEN" এর মতো একটি সুনির্দিষ্ট এবং একই সাথে জটিল একটি বাক্য এলোমেলো চাপের ফলে এসে পড়তে পারে? তবে আমরা ধারনা করতে পারি যে, সেই টাইপিং মেশিন হয়তো আরও সরলতর ছিল। তাহলে আমরা একটু দেখি ওই টাইপিং মেশিন কি পরিমান সরল হতে পারে! আমরা সরলতার সুবিধার্থে টাইপিং মেশিন থেকে সমস্ত সংখ্যা এবং এন্টার এর বাটনগুলো বাদ দিয়ে দিই।

তাহলে শুধুমাত্র বাকি সকল ইংরেজি বর্ণ এবং স্পেস বাটন সহ মোট বাটন সংখ্যা হয় ২৭টি। সেক্ষেত্রে মোট কম্বিনেশন সংখ্যা হবে:

$$n^r = ২৭^২৭ = ২৭ X ২৭ = ১০^৪৮টি [১ এর পরে আরও ৪৮টি শূন্য]$$

২৭টি বাটন বিশিষ্ট টাইপিং মেশিনের এই কম্বিনেশন সংখ্যা ৩৮টি বাটন বিশিষ্ট টাইপিং মেশিনের থেকে তুলনামুলকভাবে অনেক কম। কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তবুও অনেক বিশাল একটি সংখ্যা। এমনকি এই বিশাল একটি সংখ্যা থেকেও এলোমেলোভাবে কোন অর্থবোধক বাক্য তৈরি হওয়াটা অসম্ভব দেখায়। সেক্ষেত্রে আমরা টাইপিং মেশিনের জটিলতা আরও একটু হ্রাস করতে পারি।

"I HAVE A PEN" এই বাক্যটিতে সর্বমোট ১২টি অক্ষর আছে (স্পেস ও রিপিটেশন সহ)। এখানে হিসাবের সুবিধার জন্য স্পেসকেও একটি নির্দিষ্ট অক্ষর হিসেবে ধরা হয়েছে যেহেতু বাক্যটি তৈরি করার জন্য স্পেস বাটনেও চাপ দেওয়া লাগবে। এখন আমরা দেখবো এই ২৭টি বাটন বিশিষ্ট টাইপিং মেশিন দ্বারা ১২ অক্ষর বিশিষ্ট কয় ধরনের বাক্য বা কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে আমাদের এলোমেলো সিস্টেম বা টাইপ করার জন্য যে বানর ব্যাবহার করা হয়েছে সেই এলোমেলো সিস্টেম বা বানর কোন কারনে প্রতিবারে ১২টি অক্ষরের সিকোয়েন্স তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে!

তাহলে ২৭টি বাটন দ্বারা সৃষ্ট ১২ অক্ষর বিশিষ্ট কম্বিনেশন সংখ্যা –

n^r = ২৭^১২ = ১৫০০৯৪৬৩৫২৯৬৯৯৯১২১টি [১ হাজার ৫০০ কোটি কোটি ৯৪ লক্ষ কোটি ৬৩ হাজার কোটি ৫২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২১]

এবারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কম্বিনেশনের সংখ্যা আগের বের করা দুটি কম্বিনেশন সংখ্যা থেকে অনেক কমে গিয়েছে যার ফলে আমাদের ফলাফলকে এখন আমরা সরাসরি সংখ্যায় প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারার ফলে এখন এসকল কম্বিনেশন সংখ্যার বিশালত্ব আরও সহজে উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে। নিরপেক্ষ ও কমন সেন্স সম্পন্ন যেকোনো মানুষই বলতে বাধ্য হবে যে এতগুলো কম্বিনেশন সংখ্যার মধ্য থেকে একটি সুনির্দিষ্ট ও অর্থবোধক বাক্য এলোমেলো ভাবে তৈরি হওয়াটা অসম্ভব একটি ব্যাপার। তবে সমস্যা নেই, কারন আমরা টাইপিং মেশিনের জটিলতাকে আরও অনেক কমাতে পারবো।

আমরা এখন এমন ১টি টাইপিং মেশিনের কথা চিন্তা করি যেখানে শুধুমাত্র ইংরেজি – A, E, H, I, N, P, V এই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অক্ষর এবং স্পেস বাটনটি আছে। অর্থাৎ এখানে বাটন সংখ্যা হল সর্বমোট ৮টি।

<u>তাহলে ৮টি বাটনকে প্রতিবারে ইচ্ছামতো ১২ বার চাপ দিয়ে সর্বমোট কম্বিনেশন সংখ্যা পাওয়া যাবে:</u>

n^r = ৮^১২ = ৬৮৭১৯৪৭৬৭৩৬টি [৬ হাজার ৮৭১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৩৬]

যদিও এর আগের হিসাবের তুলনায় অত্যন্ত ছোট একটি সংখ্যা কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এই সংখ্যাকে কারও পক্ষেই ছোট বলা সম্ভব না। তাহলে এবার আমরা সমগ্র সিস্টেমের জটিলতা আরও কমানোর চেষ্টা করব। কারন একটি টাইপিং মেশিন ব্যাবহার করলে এলোমেলো সিস্টেম থেকে কোন অর্থবোধক বাক্য সৃষ্টি হবার কথা না। এর কারন, টাইপিং মেশিনে শুধু ১টি বাক্য তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বাটনের তুলনায় অনেক বেশি বাটন অর্থাৎ বেশি চয়েস আছে যার কারনে প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় বাটনে চাপ পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে। এছাড়াও ১টি বাটনে একাধিকবার চাপ পড়ার ফলে রিপিটেশন বা পুনরাবৃত্তিও ঘটে। সমস্যা হল যে প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রয়োজনীয় সংখ্যকবার পুনরাবৃত্তি না হওয়া। এসকল কারনেই একটি টাইপিং মেশিন থেকে কখনই একটি বানরের দ্বারা তথা একটি এলোমেলো

প্রক্রিয়া দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক বাক্য বা সিকোয়েন্স সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। তবে আমরা যদি টাইপিং মেশিনের পরিবর্তে কয়েকটি কাঠের বা প্লাস্টিকের ব্লকের কথা চিন্তা করি তাহলে হয়তো ব্যাপারটি সম্ভব হলেও হতে পারে! "I HAVE A PEN" বাক্যটিতে রিপিটেশন ও স্পেস সহ যে কয়টি অক্ষর আছে আমরা সে কয়টি ব্লকের কথা চিন্তা করি। অর্থাৎ ১টি 'I', ১টি 'H', ২টি 'A', ১টি 'V', ২টি 'E', ১টি 'P', ১টি 'N' এবং ৩টি স্পেস ব্লক এর কথা আমরা চিন্তা করি। তাহলে ব্লক সংখ্যা হয় সর্বমোট ১২টি। এখন আমরা এই দেখবো যে এই ১২টি ব্লককে সর্বমোট কতরকমভাবে সাজানো সম্ভব হতে পারে?

আমরা যদি এই ১২টি ব্লক ১টি বানরের হাতে তথা ১টি এলোমেলো সিস্টেমের কাছে সাজানোর জন্য সমর্পণ করে দিই তাহলে সম্ভাব্য মোট কম্বিনেশন সংখ্যা হবে:

১২!/(২! X ২! X ৩!) = ১৯৯৫৮৪০০টি [১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪০০]

এখানে "!" চিহ্নটি হল ফ্যাক্টরিয়াল চিহ্ন। মোট অক্ষর বা ব্লকের সংখ্যা ১২টি হওয়ার কারনে ১২! লেখা হয়েছে। ২টি 'A', ২টি 'E' এবং ৩টি স্পেসের জন্য অর্থাৎ এসকল রিপিটেশনের জন্য ১২! কে ২! X ২! X ৩! দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়েছে।

[বোঝার সুবিধার জন্য: ২! = ২ X ১, ৩! = ৩ X ২ X ১, ৪! = ৪ X ৩ X ২ X ১ ইত্যাদি।]

এটি আমাদের হিসাবের মধ্যে আসা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, অথচ কারও পক্ষেই এই সংখ্যাকে ক্ষুদ্র বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়! অর্থাৎ আমরা এলোমেলো সিস্টেমের কাছে প্রতিবারে সিকোয়েন্স তৈরির সময়েই অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সময়ে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় রিপিটেশন সহ) তুলে দিলেও এমনকি সেই অনিয়ন্ত্রিত এলোমেলো সিস্টেমের পক্ষে "I HAVE A PEN" বাক্যটি তৈরি করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। কারন বিশাল সংখ্যক অসংখ্য চয়েস থেকে ১টি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন সম্পন্ন সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে হবে। তবে সত্যি কথা হল যে এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিবারে সিকোয়েন্স তৈরির সময়ে কেউই সিস্টেমের কাছে এভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তুলে দেয় না। যদি কোনভাবে এই ঘটনা ঘটে তাহলে সেটি আর অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থাকে না। এ কারনেই সত্যিকারের হিসাব আসলে ৩৮টি বাটন সমৃদ্ধ

টাইপিং মেশিনেও সঠিক হবে না। কারন ১টি পুরনাঙ্গ টাইপিং মেশিন হতে হলে সেখানে ৩৮টি বাটনের বাহিরেও কমা, ফুল স্টপ, ক্যাপস লক, বিভিন্ন নিউমেরিক্যাল অপারেন্ড যেমন- প্লাস (+), মাইনাস (-), ইকুএল (=) ইত্যাদি আরও অনেক বাটন থাকে। এ সকল বাটন হিসাব করা হলে এটি চিন্তা করাটা অতি স্বাভাবিক হয়ে যায় যে "I HAVE A PEN" বাক্যটি কোনক্রমেই ১টি এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত সিস্টেমের কাছ থেকে বা ১টি বানরের কাছ থেকে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়াও একটি টাইপিং মেশিন থেকে সত্যিকার অর্থে অসীম সংখ্যক কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব। ব্যাপারটি নির্ভর করে সময় আর বাটন প্রেসের পরিমানের উপরে। এই অসীম সংখ্যক কম্বিনেশন থেকে একটি জটিল, সুনির্দিষ্ট ও অর্থবোধক বাক্য যা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে সেরকম ১টি বাক্য একটি এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থেকে তৈরি হবার চিন্তা করাটাও বোকামি। এক্ষেত্রে স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটির জন্য ডেম্বস্কির দেওয়া উদাহরনটি অর্থাৎ সেক্সপিয়ারের যেকোনো ১টি সনেট যা কিনা **"I HAVE A PEN"** বাক্যটির থেকে হাজার হাজার গুন বেশি জটিল ও সুনির্দিষ্ট তাতো তৈরির প্রশ্নই আসে না।

আশা করি সকলের পক্ষেই এখন বোঝা সম্ভব হয়েছে, কেন স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি বা সুনির্দিষ্ট জটিলতা ১টি অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলো সিস্টেম থেকে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সেক্সপিয়ারের ১টি সনেট এভাবে আসা সম্ভব নয় সেখানে কিভাবে তার থেকেও আরও কোটি কোটি গুন বেশি জটিল এবং একই সাথে সুনির্দিষ্ট জীবদেহ বা কোন একটি অঙ্গাণু এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত ১টি সিস্টেম থেকে তৈরি হবার কল্পনা আমরা করতে পারি?

বর্তমান পৃথিবীর অসংখ্য জীবদেহের প্রত্যেকটির বিশাল আকারের জটিলতা এবং প্রচন্ড রকমের সুনির্দিষ্টতা অবশ্যই কোন এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত সিস্টেম থেকে আসা সম্ভব নয়। এদের এই সুনির্দিষ্ট জটিলতা বা স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি একজন সুমহান ডিজাইনারের অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

সহায়ক তথ্যসূত্রসমূহ:

১) http://en.wikipedia.org/wiki/William_Dembski

২) http://en.wikipedia.org/wiki/Specified_complexity

৩) উচ্চ মাধ্যমিক বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি; নবম সংস্করণ; লেখক – এস, ইউ, আহাম্মদ (ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিন্যাস ও সমাবেশ)

৪) উচ্চ মাধ্যমিক বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি; দ্বাদশ সংস্করণ; লেখক – আফসার উজ-জামান (ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিন্যাস ও সমাবেশ)

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–১০: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৫ (বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা)

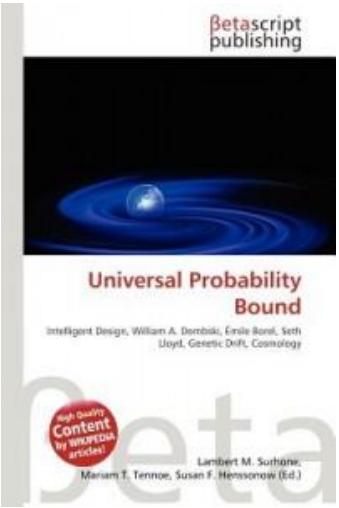

পূর্বের অংশে অনিয়ন্ত্রিত বিবর্তনবাদের একজন অন্যতম সমালোচক উইলিয়াম আলবার্ট "বিল" ডেম্বস্কি (William Dembski) সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি (Specified complexity) বা সুনির্দিষ্ট জটিলতা নামক একটি তত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছিলো। এই স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি অনুসারে একই সাথে জটিল এবং সুনির্দিষ্ট কোন কিছুই কোন এলোমেলো প্রক্রিয়া থেকে তৈরি হতে পারে না। আর যেহেতু পৃথিবীর সকল জীবদেহই একই সাথে জটিল এবং সুনির্দিষ্ট সেহেতু এই সকল জীবদেহ কোনভাবেই এলোমেলো বা অনিয়ন্ত্রিত কোন প্রক্রিয়া থেকে তৈরি হতে পারে না। যাই হোক এবারে বিল ডেম্বস্কির দেওয়া অন্য একটি গাণিতিক হিসাব সম্পর্কে আলোকপাত করবো। এই হিসাবটিও এলোমেলো একটি প্রক্রিয়া থেকে প্রাণের সৃষ্টি হওয়া এবং অনিয়ন্ত্রিত বিবর্তনের বিরোধিতা করে।

ইউনিভার্সাল প্রোবাবিলিটি বাউন্ড (Universal probability bound) বা বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা দ্বারা ডেম্বস্কি সম্ভাব্যতার সর্বোচ্চ একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন। ডেম্বস্কি বলেন, যে কেউ ফলপ্রসূভাবে বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমার একটি ধনাত্মক মান বের করতে পারবে। এ ধরনের একটি সীমার অস্তিত্ব থাকার অর্থ হচ্ছে, কোন একটি অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলো ঘটনা কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ঘটতে পারবে কি পারবে না তা নিশ্চিত করা। যদি ওই এলোমেলো ঘটনার সম্ভাব্যতা ইউনিভার্সাল প্রবাবিলিটি বাউন্ডের বাহিরে চলে যায় তবে বুঝতে হবে, সেই ঘটনাটি অনিয়ন্ত্রিত কোন প্রক্রিয়া দ্বারা ঘটা অসম্ভব। এই সীমাটি ব্যাবহার করে ডেম্বস্কি বলেন, প্রকৃতিতে ঘটা কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাকে আমরা শুধুমাত্র চান্স বা ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিতে পারবো না। অর্থাৎ এই তত্ত্বকে আমরা এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রাণের সূচনা এবং একই সাথে এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত বিবর্তনের বিরুদ্ধেও

কাজে লাগাতে পারবো। কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা ধনাত্মক বা পজিটিভ এবং একই সাথে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলে সেই ঘটনাকে বা ঘটনার সম্ভাব্যতাকে যে উপেক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে সর্ব প্রথম আলোচনা করেন ফ্রেঞ্চ গণিতবিদ ইমাইল বোরেল (Émile Borel)। ডেম্বস্কি মূলত তাঁর এই আলোচনাকেই কাজে লাগান। এবারে একটু দেখা যাক যে ডেম্বস্কি এই তত্ত্বটিতে যে বাউন্ড বা সীমার কথা উল্লেখ করেছেন তা আসলে কী?

ডেম্বস্কির এই বাউন্ড বা সীমার হিসাবটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন হিসাব বা মাত্রা থেকে পাওয়া যায়। মাত্রা তিনটি হল:

1. ১০^৮০[10 to the power 80], যা হল আমাদের অবজারভেবল ইউনিভার্স বা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের (observable universe) অ্যাপ্রক্সিমেটলি সর্বোচ্চ এলিমেন্টারি পার্টিকেল বা প্রাথমিক উপাদান সংখ্যা।
2. ১০^৪৫[10 to the power 45], যা হল প্রতি সেকেন্ডে পদার্থের রূপান্তরের সর্বোচ্চ পরিমাণ অথবা প্ল্যাঙ্ক টাইমের (Planck time) ইনভারস বা বিপরীত।
3. ১০^২৫ [10 to the power 25], যা হল আমাদের মহাবিশ্বের বয়স সেকেন্ডে হিসাব করলে যে মান হয় তার থেকে ১ বিলিওন গুন বেশি একটি মান।

১ম হিসাবটি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নিই। আমাদের এই পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে আছে প্রায় ১০^৮০টি বেসিক বা প্রাথমিক কণা। ১০^৮০ এর মানে হল ১ এর পরে ৮০টি শূন্য আছে

এমন একটি সংখ্যা। আর পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব মানে এই নয় যে, আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি দ্বারা আমরা মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ কতটুকু দেখতে বা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছি। বরং পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব এটাই বোঝায় যে, আলো এবং অথবা অন্যান্য সিগনালসমূহ মহাবিশ্বের দূরতম বস্তুসমূহ থেকে পৃথিবীর কোন পর্যবেক্ষকের কাছে পৌছাতে পারবে কিনা। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা মহাবিশ্বের কতটুকু দেখতে বা পর্যবেক্ষণ করতে পারবো তার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যেহেতু মহাবিশ্ব এখনও পর্যন্ত প্রসারিত হচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত বহু দূরের বস্তুর আলো বা সিগন্যালই আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।

২য় হিসাবটি হল প্ল্যাঙ্ক টাইমের ইনভারস বা বিপরীত। এটি নির্দেশ করে যে, প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ঠিক কি পরিমাণ বা কয়টি পরিবর্তন ঘটতে পারে কোন পদার্থের মধ্যে। প্ল্যাঙ্ক টাইম হল শূন্যস্থানে ১ প্ল্যাঙ্ক দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোর যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণ সময়। এটি সময়ের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি একক। কিছু কিছু পদার্থবিদ একে সময়ের সর্বনিম্ন একক হিসাবেও উল্লেখ করে থাকেন। এই ২য় হিসাবটিকে আবার অন্যভাবেও বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি এলিমেন্টারি পদার্থের রূপান্তরের সর্বনিম্ন সময় হল এক প্লাঙ্ক টাইম।

৩য় হিসাবটি হল আমাদের মহাবিশ্বের বয়স অর্থাৎ বিগ ব্যাং (big bang) বা মহা বিস্ফোরণের পরে ঠিক কত সময় পার হয়েছে তার হিসাব যা সেকেন্ড একক দ্বারা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা মহাবিশ্বের যে হিসাবগুলো করি সেগুলো হচ্ছে আনুমানিক বা কাছাকাছি হিসাব। এত বিশাল স্কেলে হিসাব করতে গেলে আসলে কখনই সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। এই কারণেই ডেম্বস্কি সময়ের হিসাবের এই অপূর্ণতার কথা চিন্তা করে মহাবিশ্বের স্বাভাবিকভাবে হিসাব করা বয়সকে ১ বিলিওন দ্বারা গুন করে যে উত্তর পাওয়া যায় সে সংখ্যাটি দ্বারা হিসাব করেন। তিনি এই কাজ করেন যাতে প্রাণের উৎপত্তিকে আরও বেশি চান্স ও সময় দেওয়া যায়!

যাই হোক, এখন আমরা দেখব এই তিনটি মাত্রা থেকে কিভাবে ইউনিভার্সাল প্রোবাবিলিটি বাউন্ড পাওয়া যায়। তেমন কিছুই না, এটি সোজা একটি গাণিতিক হিসাব।

ইউনিভার্সাল প্রোবাবিলিটি বাউন্ড = অবজারভেবল ইউনিভার্সের সর্বোচ্চ অ্যাপ্রক্সিমেট এলিমেন্টারি পার্টিকেল x প্রতি সেকেন্ডে পদার্থের রূপান্তরের সর্বোচ্চ পরিমাণ X সেকেন্ডের হিসাবে আমাদের মহাবিশ্বের বয়স:

= ১০^৮০ X ১০^৪৫ X ১০^২৫

= ১০^১৫০

এই হিসাবটি দ্বারা আসলে কী বোঝা যায়? এই হিসাবটি দ্বারা আসলে বোঝা যায় যে আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রতি সেকেন্ডে যদি পদার্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ রূপান্তর বা পরিবর্তন হয় অর্থাৎ প্রতিটি কণা যদি প্ল্যাঙ্ক সেকেন্ডে পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) করে তাহলে তারা বর্তমান সময় পর্যন্ত অ্যাপ্রক্সিমেটলি সর্বোচ্চ ১০^১৫০টি মিথস্ক্রিয়া (interaction) ঘটাতে পারবে। তার মানে মহাবিশ্বে এখনও পর্যন্ত মোট প্রায় ১০^১৫০টি বেসিক ঘটনা ঘটেছে।

তবে ২০০৫ সালে ডেম্বস্কি তাঁর হিসাবে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে ৩টি মাত্রার পরিবর্তে ২টি মাত্রা দিয়ে হিসাব করেন। মাত্রা দুটি হল:

১) সমগ্র মহাবিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া কম্পিউটেশনাল রিসোর্স (Computational resource) বা গণন সম্পদের উপর দেওয়া একটি উচ্চতর সীমা। সীমার এই হিসাবটি পাওয়া যায় এমআইটি (Massachusetts Institute of Technology) এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (mechanical engineering) এর একজন প্রফেসর (professor) সেথ লয়েড (Seth Lloyd) এর কাছ থেকে। হিসাবটি হল ১০^৯০ বিটের (Bit) একটি রেজিস্টারে (Register) করা ১০^১২০টি লজিক অপারেশন।

এখানে ১০^৯০ বিটের একটি রেজিস্টারে করা ১০^১২০টি লজিক অপারেশন হল মহাবিশ্বের সমগ্র সময়ের মধ্যে পাওয়া কম্পিউটেশনাল রিসোর্স বা গণন সম্পদের উচ্চতর বা সর্বোচ্চ সীমা। কম্পিউটেশনাল রিসোর্স মানে হল মূলত কম্পিউটেশন টাইম (computation time) বা গনন সময়, সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেপ বা ধাপ সংখ্যা, মেমোরি (Memory) স্পেস এবং সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় স্টোরেজ (storage) বা

জায়গা ইত্যাদি এবং আরও কিছু জিনিস। অর্থাৎ সেথ লয়েডের করা হিসাব অনুসারে আমাদের মহাবিশ্বে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাই দেখা যায়।

সেথ লয়েড আমাদের মহাবিশ্বকে একটি বিশাল আকারের কোয়ান্টাম কম্পিউটারের (quantum computer) সাথে তুলনা দিয়ে পদার্থের এলোমেলো সংগঠন হিসাবে না দেখে সমস্ত কিছুকেই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন (information) বা তথ্য হিসাবে হিসাব করেছেন।

বিট মানে হল ইনফরমেশন বা তথ্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং কম্পিউটিং (computing) ও ডিজিটাল কমিউনিকেশনের (communications) একদম বেসিক একটি একক। বিটের মান শুধুমাত্র বাইনারি সংখ্যা (Binary number) শূন্য এবং এক দ্বারা তৈরি হতে পারে।

আবার রেজিস্টার হল কম্পিউটারের মূল অংশ অর্থাৎ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ (CPU) এর একটি অংশ যা কিনা একটি ক্ষুদ্র স্টোরেজ বা জায়গা হিসেবে কাজ করে।

২) বিবেচনাধীন ঘটনার পরিবর্তনশীল বিন্যাস জটিলতা বা রেঙ্ক কমপ্লেক্সিটি। অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বিন্যস্ত হওয়া বা ঘটা কী পরিমাণ জটিল।

এখন ২য় মাত্রা বা হিসাবটি যদি ১০^১৫০ হয় তাহলে কম্পিউটেশনাল হিসাব দ্বারা প্রাপ্ত মান বা প্রোবাবিলিটি বাউন্ড আসল প্রোবাবিলিটি বাউন্ডের হিসাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

এবারে আশা যাক এই বিষয়ে যে, এটি কিভাবে এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত প্রাণের বিকাশ ঘটাকে অসম্ভব হিসাবে প্রমাণ করে।

যেসকল ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা ডেম্বস্কির দেওয়া এই লিমিটের বাহিরে চলে যাবে সেসকল ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে হওয়াটা অসম্ভব বলে নির্দিষ্ট করা যাবে। অর্থাৎ কোন কিছু ঘটার সম্ভাব্যতাকে আমরা সর্বনিম্নে ১০^-১৫০ পর্যন্ত হলে বলতে পারবো যে, হ্যাঁ ঘটনাটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে হয়তো ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি এর নিচে নেমে আসে অর্থাৎ যদি কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা এমনকি ১০^-১৫১ ও হয় তবুও ওই ঘটনাকে আমরা

অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটার যোগ্য হিসাবে বলতে পারবো না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কেন এই হিসাব গ্রহণযোগ্য হবে? বিশেষ করে যেহেতু বিজ্ঞান মহলের বহু মানুষই একে মেনে নেয়নি। এ প্রশ্নের একটি ছোটোখাটো উত্তর বের করার চেষ্টা করি।

ইউনিভার্সাল প্রোবাবিলিটি বাউন্ডের মান দ্বারা আসলে বোঝায়, মহাবিশ্ব জন্ম হবার পর থেকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। আর এই মানটি হল ১০^১৫০। অর্থাৎ মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ প্রায় ১০^১৫০টি ঘটনা ঘটেছে। আমার ৭ম লেখা অর্থাৎ *বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা– সম্ভাব্যতার অসম্ভাব্যতা ২ (প্রাণরসায়ন ও সম্ভাব্যতা)* লেখাটিতে ডগলাস এক্স এর করা হিসাব থেকে দেখানো হয়েছিল যে ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন একটি মাত্র প্রোটিন অণুকে এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে তৈরি হতে সম্ভাব্যতা হল ১/১০^১৬৪ বা ১০^-১৬৪। অর্থাৎ ১৫০টি অ্যামিনো এসিড দ্বারা একটি প্রোটিন অণু তৈরি হওয়াটা হল ১০^১৬৪টি ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র ঘটনা। এতোগুলো ঘটনার মধ্যে থেকে প্রোটিন অণু গঠিত হবার ঘটনাটি হল সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতাসম্পন্ন ঘটনা। এখন আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাটি সবার আগে ঘটবে এবং সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাটি সবার পরে ঘটবে তাহলে মহাবিশ্বের বয়স ১ বিলিয়ন গুন বেশি ধরে এবং প্রতিবারেই পদার্থের রূপান্তরের হারকে সর্বোচ্চ মান দ্বারা ধরে হিসাব করলেও ১৫০টি অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট একটি প্রোটিন অণুও গঠিত হবার কথা নয়, এত জটিল ও ব্যাপক প্রাণিজগৎ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া তো দূরে থাক! কেন ঘটবে না? কারণ প্রোটিন অণু গঠিত হবার ঘটনাটি হল ১০^১৬৪টি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা। যদি সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাটি সবার পরে ঘটে এবং বাকি অন্য সমস্ত ঘটনাগুলি মাত্র একবার করেই কোন রকমের রিপিটেসন ছাড়াই ঘটে থাকে তবুও ঘটনার সংখ্যা হয় ১০^১৬৪টি যেখানে মহাবিশ্বের জন্ম হবার পর থেকে মোট ঘটা ঘটনার সংখ্যা হল প্রায় ১০^১৫০টি। অর্থাৎ মহাবিশ্বে এখনও পর্যন্ত ঘটা ঘটনার থেকেও অনেক বেশি পরিমাণ ঘটনা লাগবে সেক্ষেত্রে। আমরা জানি যে, অসংখ্য ঘটনা ঘটলে সেখানে বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাগুলোই সাধারণত আগে ঘটে। আর ১০^১৬৪ এর মতো এত ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনা যে সবার আগে বা শুরুর দিকে ঘটতে পারবে না সে ব্যাপারে সহজেই বোঝা যায়। বরং এর পরিবর্তে আরও অসংখ্য অধিক সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাগুলোই প্রথম দিকে ঘটার কথা এবং ঘটেও। এছাড়াও আমরা এও জানি যে, অসংখ্য ঘটনার মধ্যে অধিক সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাগুলোরই আসার

কথা বেশি এবং তাদের রিপিটেশনও হয়ে থাকে। ঘটনার সম্ভাব্যতা যতই বেশি হবে রিপিটেশন বা পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে। আবার একইভাবে সম্ভাব্যতা যত কমে যাবে রিপিটেশনে ঘটার সম্ভাব্যতাও ততই কমে যাবে। এখন ১০^১৬৪টি ঘটনার মধ্যে এ ধরণের অসংখ্য অধিক সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনা আছে যাদের স্বাভাবিকভাবেই রিপিটেশন হবার কথা। সুতরাং মোট ঘটনার সংখ্যা এবং রিপিটেশনের দিক থেকে চিন্তা করলে ১/১০^১৬৪ সম্ভাব্যতা সম্পন্ন একটি প্রোটিন তৈরি হয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনমতেই মহাবিশ্বের ইতিহাসের ১০^১৫০টি ঘটনার মধ্যে একটি হতে পারে না, যদি না বাহির থেকে কেউ হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ কেউ যদি নিজে থেকে এই প্রোটিনকে ডিজাইন না করে দেয় তবে সম্ভাব্যতা এবং প্রোবাবিলিটি বাউন্ড অনুসারে এমনকি এই মুহূর্তেও ১৫০টি অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট ১টি প্রোটিন অণু সৃষ্টি হবার কথা নয়, প্রাণ সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা। আর যদি এত কম সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রোবাবিলিটি বাউন্ডের বাহিরে থাকা সত্ত্বেও কোন ভাবে প্রোটিন সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রাণের বিকাশ হয়েও যায় তবুও আমাদের জানা আছে, এসকল ঘটনাগুলোর অর্থাৎ প্রতিটি ধাপই ঘটার সম্ভাব্যতা অনেক ক্ষুদ্র। সুতরাং ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা সম্পন্ন প্রোটিন সৃষ্টি থেকে শুরু করে এতোগুলো ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ধাপ নিয়ে ধাপে ধাপে প্রথম সরল (!) কোষের অস্তিত্ব আসাটা এতই কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন এবং এর ফলে প্রথম সরল কোষ আসাটা এতই সময়সাপেক্ষ হবার কথা যে এখনও পর্যন্ত আসলে এক কোষী প্রাণীর বাহিরে কোন কিছুরই উদ্ভব হবার কথা নয়। এখানে কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগার কথা বলা হয়েছে কারণ সকল বিবর্তনবাদীরাই সম্ভাব্যতাকে এলিমিনেট করার বা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিশাল পরিমাণের সময়ের কথা উল্লেখ করেন। তারা সাধারণত এধরণের কিছু যুক্তি দেন যাতে করে মনে হয় যে সময়ের সাথে সাথে সম্ভাব্যতার পরিমাণও কমে যায়!

সবশেষে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে, যদি মহাবিশ্বের বয়সকে আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ বিলিওন গুন বড় করে হিসাব করি, মহাবিশ্বের সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত পদার্থের রূপান্তরের হারকে সর্বোচ্চ মান দ্বারা বা প্ল্যাঙ্ক টাইম দ্বারা হিসাব করি এবং এমনকি ১৫০টি অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট ১টি প্রোটিন অণু তৈরির ঘটনাকে একদম মহাবিশ্বের শুরু থেকেই শুরু হয়েছে বলে হিসাব করি, তাহলেও ১৫০টি অ্যামিনো এসিড দ্বারা সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের মোট ঘটনা সংখ্যা থেকে অনেক বেশি থাকে! ফলে ঘটনাটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে অসম্ভব বলে ঘোষণা করলে তেমন কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই

চলে। আর আমরা যদি স্বাভাবিকভাবেই হিসাব করি অর্থাৎ মহাবিশ্বের স্বাভাবিক বয়স ব্যাবহার করে এবং পদার্থের রূপান্তরের গড় হার হিসাব করে প্রোটিন সৃষ্টির ঘটনাটিকে যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টির কয়েক বিলিওন বছর পরে শুরু হয়েছে বলে হিসাব করি তাহলে হিসাবটি কীরকম দাঁড়াতে পারে! আর যদি স্বাভাবিক হিসাবের সাথে প্রাণী জগৎ সৃষ্টি হবার ক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভাব্যতার ফ্যাক্টরকে বিবেচনা করি তাহলে হিসাবটি কেমন দাঁড়াতে পারে?

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা–১১: সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৬ (সম্মিলিত হিসাব)

পূর্বের অংশে বিল ডেম্বস্কির (William Dembski) করা হিসাব থেকে ইউনিভার্সাল প্রবাবিলিটি বাউন্ড অর্থাৎ বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা দেখানো হয়েছে। কোন নিয়ন্ত্রণহীন ও এলোমেলো ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা যদি এই সীমার বাহিরে চলে যায় তাহলে আমরা সেই ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে একে শূন্য হিসাবে ধরতে পারি।

এবারের পর্বে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে পূর্বের লেখাগুলোকে একত্রিত করে উপস্থাপন করা! *বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৫* লেখাটিতে সবচেয়ে সরলতম কোষের ১টি কাল্পনিক মডেল তৈরি করে দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সংক্ষেপে সেই লেখার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। সেই লেখাটিতে সৃষ্টির প্রথম কোষের কাল্পনিক মডেলটিকে মূলত ৩টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিলো। সেগুলো হল:

১) কোষ আবরণী
২) কোষ দেহ এবং
৩) কোষ অঙ্গাণুসমূহ

এই কাল্পনিক মডেলটি যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় তার জন্য এর যেসকল ক্রিয়াকলাপ বা সিস্টেমের প্রয়োজন সেগুলো হল:

১) সুরক্ষা সিস্টেম
২) শক্তি উৎপাদন সিস্টেম
৩) শক্তি সংরক্ষণ সিস্টেম
৪) বর্জ্য অপসারণ সিস্টেম
৫) শক্তি বণ্টন সিস্টেম
৬) কোষ বিভাজন সিস্টেম
৭) নিয়ন্ত্রক ও সমন্বয়কারি সিস্টেম।

শক্তি উৎপাদন সিস্টেমের অভ্যন্তরে আবার কতগুলো পৃথক পৃথক সিস্টেম থাকবে। সেগুলো হল:

১) খাদ্য বা শক্তি উৎপাদক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণ সিস্টেম
২) খাদ্য সনাক্তকরন সিস্টেম
৩) খাদ্য গ্রহন সিস্টেম
৪) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সিস্টেম।

এখানে যেসকল সিস্টেমের কথা বলা হল সবগুলো সিস্টেমই কোষের জন্য অপরিহার্য। ১টি সিস্টেমও যদি কোষ থেকে বাদ পড়ে যায় তবে বংশবৃদ্ধি করা ছাড়াই কোষের মডেল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। [বিস্তারিত: বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা :কোষের জটিলতা-৪ (সরলতম কোষের জটিলতম সমস্যা)]

অর্থাৎ সবচেয়ে সরলতম কোষটি হল অনেকগুলো সরল এবং জটিল সিস্টেমের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ১টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল সিস্টেম। বিবর্তনবাদীরা বলে থাকেন, বিশাল পরিমাণের সময়ের ব্যাবধানে অসংখ্য ধরনের কম্বিনেশন হতে হতে হঠাৎ চান্স দ্বারা তথাকথিত সরল (!)

১ম কোষটির উদ্ভব হয়ে যায়। তাহলে আমরা এবার তাদের এই দাবীটি যাচাই করার চেষ্টা করি।

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৯ -লেখাটিতে উইলিয়াম বিল ডেম্বস্কির ১টি থিওরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যিনি একই সাথে একজন মনোবিদ, গণিতবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, দার্শনিক এবং ধর্ম তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। সেখানে দেখানো হয়েছিলো যে, কোন কিছুর গঠন যদি একই সাথে জটিল ও সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে তা কোন অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলো পদ্ধতি থেকে শুধুমাত্র চান্স দ্বারা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে না। একে বলা হয় স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি। ডেম্বস্কি স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি বা সুনির্দিষ্ট জটিলতা থিওরির ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এভাবে দিয়েছিলেন-

বর্ণমালার কোনো অক্ষরই জটিল নয় কিন্তু সুনির্দিষ্ট। আবার এলোমেলো কতগুলো অক্ষর দ্বারা সৃষ্ট ১টি দীর্ঘ বাক্য সুনির্দিষ্ট নয় কিন্তু জটিল। তবে শেক্সপিয়ারের ১টি সনেট একই সাথে জটিল এবং সুনির্দিষ্ট।

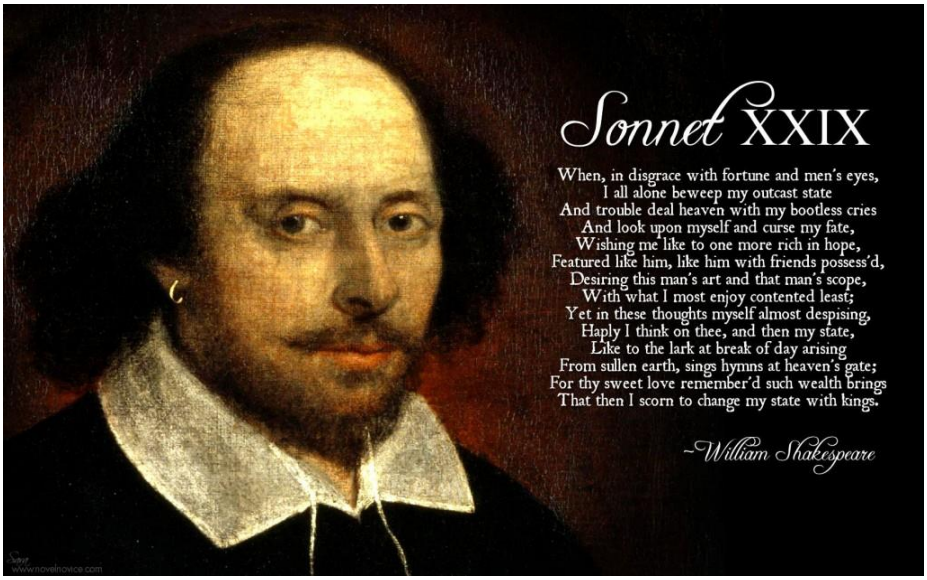

বাস্তব ক্ষেত্রে এমন আরও অনেক ধরনের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমনঃ "I HAVE A PEN" বাক্যের প্রতিটি অক্ষরই সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের অর্থ এবং কাজ হবে একদম নির্দিষ্ট কিন্তু এই অক্ষরগুলোর কোনটিই জটিল নয়। আবার এই অক্ষরগুলোকে একত্রে ইচ্ছামতো সাজানো হলে সেটি জটিল হবে কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ বহন করবে না [উদা: "AENP IAH EV"]। তবে যখন এই অক্ষরগুলো দিয়ে "I HAVE A PEN" বাক্যটি রচনা করা হয় তখন কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ব্যাবহার করার কারনে সেটি জটিল তো হবেই সেই সাথে আবার এই বাক্যটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা সিকোয়েন্স অনুসারে সাজিয়ে নির্দিষ্ট গঠন ও অর্থ প্রকাশ করা যায় বলে এটি সুনির্দিষ্টও।

এখন, আমরা জানি যে, আমাদের সর্বপ্রথম সরলতম কোষের কাল্পনিক মডেলটি হল অনেকগুলো সরল এবং জটিল সিস্টেমের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া ১টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল সিস্টেম। আবার আমাদের সরলতম কোষের জন্য যেসকল অঙ্গাণু, সিস্টেম, ফাংশন রয়েছে তাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত স্পেসিফিক বা সুনির্দিষ্ট এবং এরা একত্রে যে কোষ গঠন করে তাও আবার অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। এদেরকে স্পেসিফিক বলা হয়েছে কারন এরা সবসময়ই নির্দিষ্ট প্রকারের গঠন এবং ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে এবং এদের গঠন যদি ভিন্ন হয় তাহলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে তারা সক্ষম হবে না। এছাড়াও কোষের অঙ্গাণুসমূহ শুধুমাত্র ১টি নির্দিষ্ট বিন্যাস অনুসারে সজ্জিত হয়েই কোষ তৈরি করতে পারে।

এই ব্যাপারটিকে একটি কম্পিউটার মাদারবোর্ডের সাথে তুলনা দেওয়া যায়। মাদারবোর্ডের ইলেক্ট্রনিক কম্পোনেন্ট গুলোর প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সুনির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। একটু ব্যাতিক্রম হলেই মাদারবোর্ড কাঙ্খিত কাজ করতে পারবে না বা সর্ট সার্কিট হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আর মাদারবোর্ডের গঠন যে অত্যন্ত জটিল তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং কম্পিউটারের মাদারবোর্ড হল একই সাথে সুনির্দিষ্ট এবং জটিল একটি গঠন। অর্থাৎ মাদারবোর্ডের মধ্যে সুনির্দিষ্ট জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়। ১টি কোষও এর অঙ্গাণুসমূহ নিয়ে ঠিক একইভাবেই কাজ করে থাকে (যদিও বর্তমান সময়ের যেকোনো কোষই ১টি মাদারবোর্ডের থেকে বহুগুনে বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল)। তার মানে আমাদের সরলতম কোষের কাল্পনিক মডেলটি অবশ্যই একই সাথে সুনির্দিষ্ট এবং জটিল।

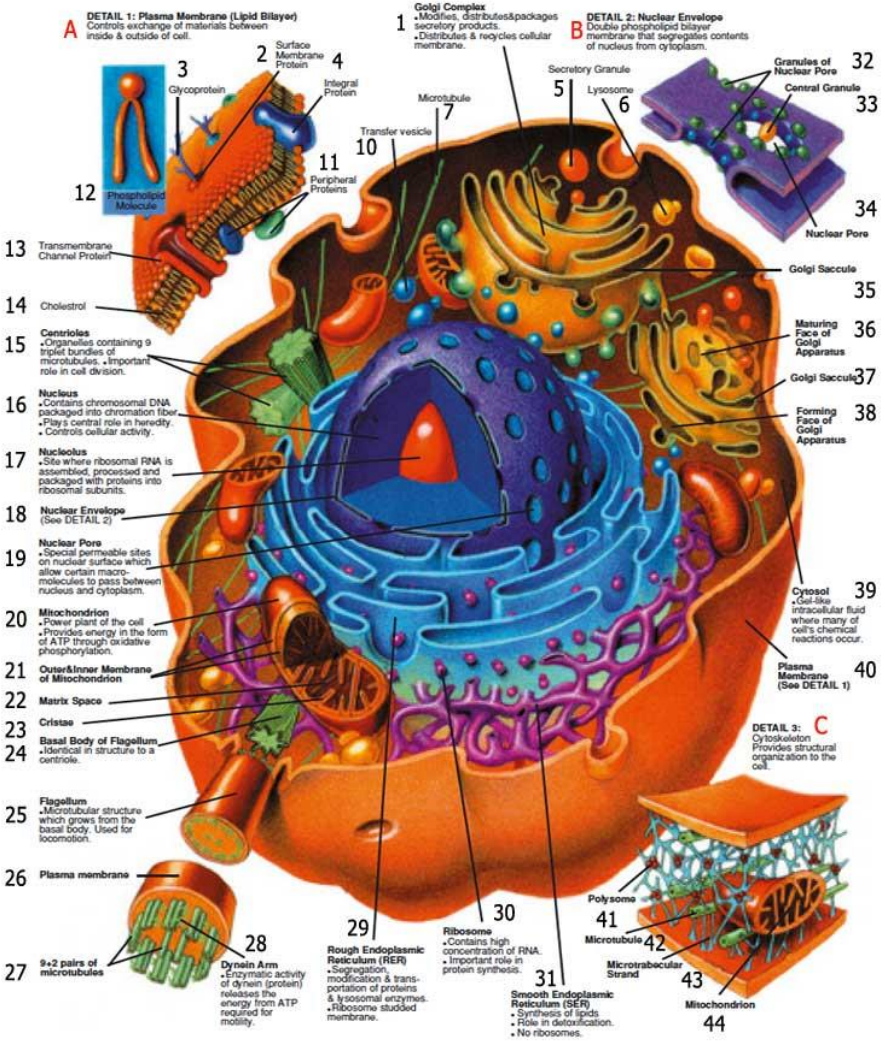

তবে সকল জীবই যে একই সাথে সুনির্দিষ্ট এবং জটিল এই সত্যটি প্রাণের উদ্ভবের গবেষক লেসলি অরগেল এবং পদার্থবিদ পল ডেভিসের বর্ণনা থেকেই জানা যায়। [বিস্তারিত: বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা : সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা ৪ (সুনির্দিষ্ট জটিলতা)]

তাহলে স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি থিওরি অনুসারে শেক্সপিয়ারের ১টি সনেট যেমন বিশাল সময় যাবৎ কি বোর্ডের বাটনের এলোমেলো চাপের ফলে তৈরি হতে পারে না, ঠিক তেমনি এর থেকেও আরও বহুগুনে বেশি জটিল বিন্যাসের অধিকারী সরলতম কোষটিও **এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত কোন সিস্টেম থেকে তৈরি হতে পারে না।**

এবারে আমরা একটু প্রাণের উদ্ভব হবার সম্ভাব্যতাকে গণনা করে দেখানোর চেষ্টা করি।

বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৭ -লেখাটিতে প্রাণ সৃষ্টির সমগ্র সম্ভাব্যতাকে গণনা করে দেখানো হয়নি। শুধুমাত্র দেখানো হয়েছিলো যে, মাত্র ১৫০ টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি মাত্র প্রোটিন অণু এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত ১টি সিস্টেম থেকে সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ঠিক কতটুকু।

ডগলাস এক্স একজন ক্যালটেক পিএইচডি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যিনি কেম্ব্রিজে ১৪ বছর যাবৎ কর্মরত ছিলেন। তাঁর হিসাব থেকে দেখা যায় যে, এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত ১টি সিস্টেম থেকে মাত্র ১৫০ টি অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট ১টি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারের প্রোটিন অণু গঠিত হতে পারার সম্ভাবনা হল ১/১০^১৬৪!

অর্থাৎ ১টি কর্মক্ষম প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারার ঘটনা হল ১০^১৬৪টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি ঘটনা। ১০^১৬৪ এর মানে হল ১ এর পরে ১৬৪টি শূন্য আছে এমন একটি সংখ্যা। [বিস্তারিত: বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা : সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা ২ (প্রাণরসায়ন ও সম্ভাব্যতা)]

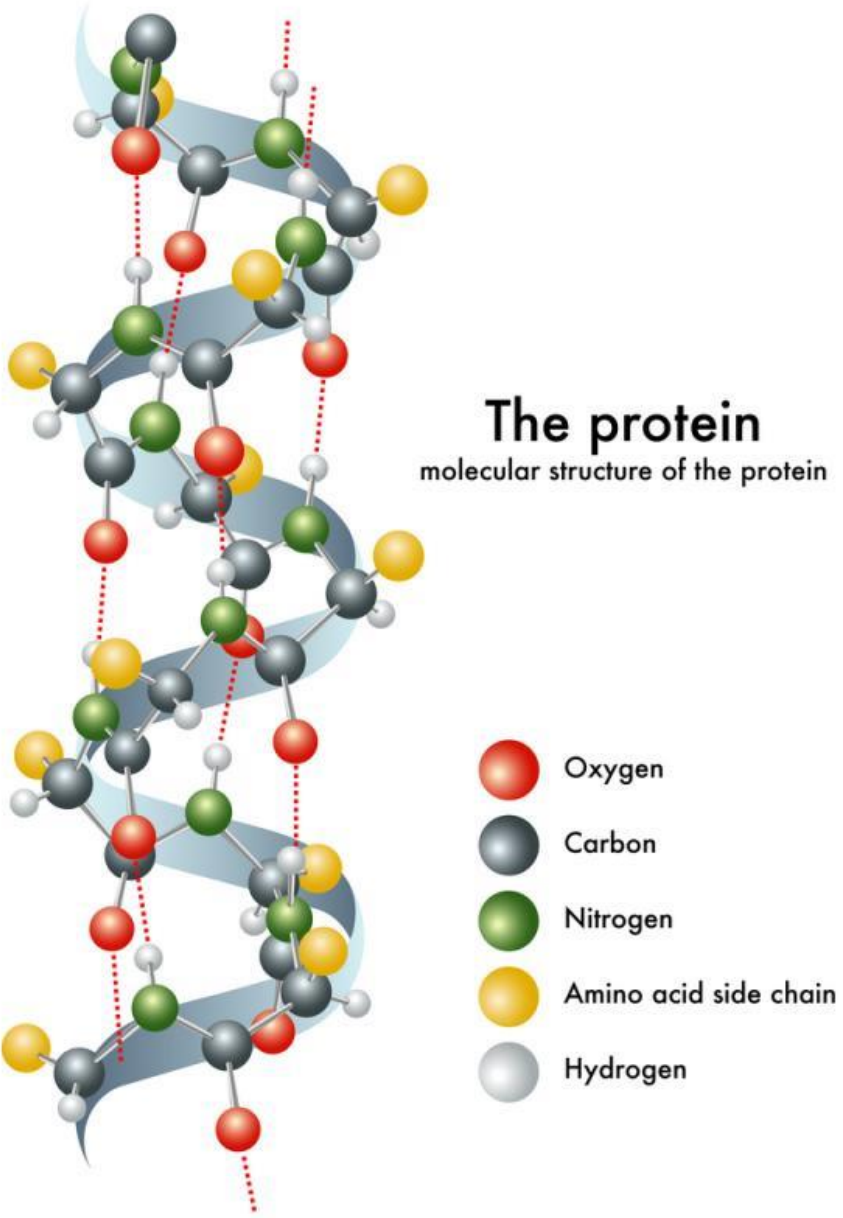
The protein
molecular structure of the protein
Oxygen
Carbon
Nitrogen
Amino acid side chain
Hydrogen

সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন যে, কোন মানুষই বলতে পারবে যে এত ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা নিয়ে কখনই কোন কিছু ঘটা সম্ভব নয়। তবে যখনই এই সম্ভাব্যতাকে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয় ঠিক তখনই অনেকের মত বদলে যায়। তখন বিশাল সময় এবং বিশাল আকারের মহাবিশ্বের কথা তুলে বলা হয় - এই বিশাল সময়ের মধ্যে এত বড় মহাবিশ্বে অবশ্যই সেই ঘটনাটি ঘটার সম্ভাব্যতা বেড়ে যাবে যেহেতু বিশাল সময়ের মধ্যে অসংখ্য স্থানে অসংখ্যবার ট্রায়াল হবে এবং সেখানে অসংখ্য ধরনের কম্বিনেশন সম্পন্ন হবে। কিন্তু গাণিতিকভাবে সত্যিকার অর্থে এমন কোন ধরনের সূত্র বা প্রমান নেই যা দ্বারা এমনটা বলা যায় যে, বিশাল সময় ধরে পাশাপাশি অসংখ্য ট্রায়াল হলে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা বেড়ে যায়। বরং এটাই দেখা যায় যে, বাহির থেকে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব না আসলে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা কখনই পরিবর্তিত হয় না এবং এটি গাণিতিক ও পর্যবেক্ষণগত উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত। কারন প্রত্যেক ঘটন স্থানে সম্ভাব্যতা আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে। এক স্থানের কম্বিনেশনের কোন প্রভাব অপর স্থানে পড়বে না সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে। কারন যদি এমনকি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ১০০ হাজার কোটি স্থানেও অ্যামিনো এসিডের বিক্রিয়া চলতে থাকে তাহলেও তাদের প্রত্যেকটিই হবে একেকটি স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা।

অনির্ভরশীল ঘটনার সংজ্ঞা হল –
যদি একাধিক ঘটনার মধ্য থেকে কোনটি ঘটার সম্ভাব্যতাই অপর ঘটনাগুলোর উপর নির্ভর না করে তখন ঘটনাগুলিকে পরস্পর স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা বলা হয়। যেমন- দুটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে ১টি মুদ্রার উপরের দিকে হেড বা টেইল পাওয়ার সম্ভাবনা অপর মুদ্রার উপরের দিকে হেড বা টেইল পাওয়ার সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করে না। তাই দুটি মুদ্রায় হেড বা টেইল আসার ঘটনা পরস্পর স্বাধীন বা অনির্ভরশীল।

একইভাবে অ্যামিনো এসিডের বিক্রিয়াসমূহ যত জিলিওন জিলিওন স্থানেই হোক না কেন তাদের কারও উপর কারও কোন প্রভাব থাকবে না কারন তারা পরস্পর স্বাধীন ঘটনা।

সম্ভাব্যতা কিভাবে কাজ করে তার কিছুটা ব্যাখ্যা *বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ৮* লেখাটিতে দেওয়া হয়েছে। লেখাটি অনুসারে ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্বলিত ১টি প্রোটিন অণু গঠন হবার সম্ভাব্যতা ১/১০^১৬৪ দ্বারা এটাই বোঝায় যে, ১৫০টি অ্যামিনো এসিড দিয়ে আসলে ১০^১৬৪ সংখ্যক কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব এবং এর মধ্যে থেকে প্রোটিন সৃষ্টির কম্বিনেশনটি হল সবচেয়ে কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কম্বিনেশনগুলোর একটি। বাকি কম্বিনেশনগুলোর মধ্য থেকে সিংহভাগ কম্বিনেশনই প্রোটিন তৈরির সম্ভাব্যতা থেকে বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন। যার কারনে অ্যামিনো এসিডের কম্বিনেশন এলোমেলো কোন সিস্টেমে তৈরি হতে গেলে অধিক সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কম্বিনেশনগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখা যাবে।

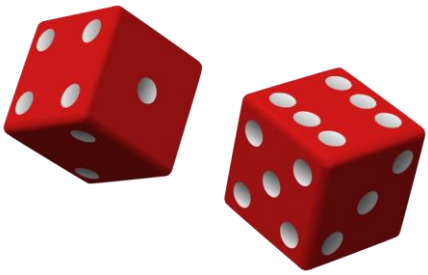

যেমন: ১২টি ছক্কা ছোঁড়ার পরে এদের প্রত্যেকটিতে ১২টি ৬ একত্রে আসার সম্ভাব্যতা হল ২১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৬টি বা প্রায় ১০^৯টি [লগারিদম (log) করে] ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি ঘটনা। শতকরায় হিসাব করলে পাওয়া যায় মাত্র ০.০০০০০০০৪৫% সম্ভাবনা যাকে আমরা শূন্য হিসাবে ধরে নিতে পারি। স্বাভাবিকভাবে এই সম্ভাব্যতাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ঘটনাটি ঘটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এছাড়াও আমরা কখনও আমাদের মহাবিশ্বে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ১২টি ছক্কায় ১২টি ৬ আসার ঘটনাটি ঘটতে দেখিনি। অথবা এধরনের কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনাও কখনও আমরা মহাবিশ্বে ঘটতে দেখিনি। যেখানে ১০^৯ এর মতো এত বেশি (!) সম্ভাব্যতা নিয়েও কোন একটি ঘটনা বিশ্বে কখনই ঘটেনি এবং ঘটতে পারবেও না বলেই ধারনা করা যায় সেখানে ১০^১৬৪ এর মতো এত ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা নিয়ে কিভাবে কোন ঘটনা ঘটতে পারে?

তাহলে এখন মূল প্রশ্ন হল যে ১/১০^১৬৪ সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কোন ঘটনা কি ঘটা সম্ভব? এর উত্তর বের করার জন্য ১০০% একুরেট কোন প্রমান বা থিওরি নেই। অবশ্য সম্ভাব্যতার গাণিতিক রূপ তৈরি হয়েছিলো এজন্যই যেন কোন ঘটনা ঘটতে পারবে আর কোনটি পারবে না তা নির্ধারণ করা যায়। সম্ভাব্যতা বেশি হলে বোঝা যায়, এই ঘটনাটি হয়তো ঘটতে পারে

এবং অসংখ্য ট্রায়ালের মধ্যে বেশি সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ঘটনার রিপিটেশনই বেশি বেশি করে হয়। [বিস্তারিত: বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা : সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা ৩ (ছক্কা বনাম প্রোটিন)]। তবে কোন এক অদ্ভুত কারনে শুধুমাত্র প্রাণের উদ্ভব এবং বিবর্তন সংক্রান্ত প্রশ্নে সম্ভাব্যতাকে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। যদিও এত কম সম্ভাব্যতা সম্পন্ন কোন ঘটনা এখনও পর্যন্তও আমরা ঘটতে দেখিনি কিন্তু বিবর্তনবাদীদের ব্যাখ্যা অনুসারে বিশাল পরিমান একটা সময় জুড়ে পাশাপাশি অসংখ্য স্থানে ট্রায়াল ঘটতে থাকলে যত কম সম্ভাব্যতাই থাকুক না কেন, যেকোন ঘটনাই ঘটা সম্ভব! তবে এখানেও বিল ডেম্বস্কি একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করেছিলেন। *বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা ১০* লেখাটিতে ইউনিভার্সাল প্রবাবিলিটি বাউন্ড বা বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা নামক একটি টার্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিলো। ডেম্বস্কি মূলত ফ্রেঞ্চ গণিতবিদ ইমাইল বোরেলের (Émile Borel) আলোচনা থেকেই এই টার্মটি পান।

ডেম্বস্কির মতে এই লিমিট বা সীমার বাহিরে যদি কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা চলে যায় তাহলে সেই সম্ভাব্যতাকে তার নগণ্যতার জন্য আমরা শূন্য হিসাবে ধরতে পারি বা উপেক্ষা করতে পারি।

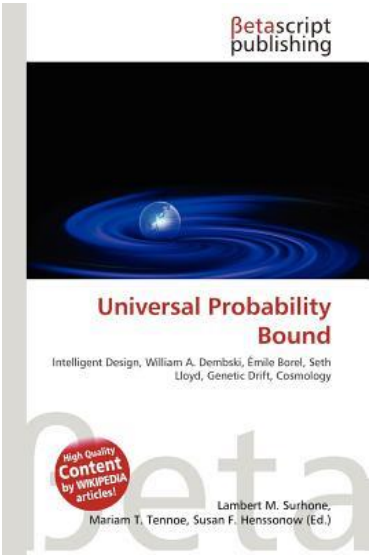

ডেম্বস্কি কিছু গাণিতিক প্রোপার্টি ব্যাবহার করে সম্ভাব্যতার যে লিমিট নির্ধারণ করেন তা হচ্ছে ১০^১৫০। তার মানে হল আমাদের এই মহাবিশ্বের কোন এলোমেলো ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা যদি সর্বোচ্চ ১/১০^১৫০ হয় তাহলে সেই ঘটনাটি ঘটা সম্ভব হলেও হয়তো হতে পারে। কিন্তু যদি সম্ভাব্যতা এর বাহিরে চলে যায় অর্থাৎ কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা যদি ১/১০^১৫১ ও হয় তাহলেও এমনকি এই সম্ভাব্যতাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারবো। কারন সত্যিকার অর্থে সম্ভাব্যতার সীমাকে এমনকি ১০^১৫০ হিসাবে ধরাটাও অনেক কম হয়ে যায়। [বিস্তারিত: বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা : সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতা–৫ (বিশ্বজনীন সম্ভাব্যতার সীমা)]

আমরা ডগলাস এক্সের হিসাব থেকে পেয়েছিলাম যে ১৫০টি অ্যামিনো এসিডের অণু বিশিষ্ট ১টি মাত্র প্রোটিন অণু গঠিত হবার সম্ভাবনা হল ১/১০^১৬৪। কিন্তু এই সম্ভাবনাটি প্রবাবিলিটি বাউন্ড অর্থাৎ ১০^১৫০ এর অনেক বেশি বাহিরে চলে যায়। সম্ভাব্যতার সীমা অথবা ১৫০ অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট প্রোটিন গঠিত হবার সম্ভাব্যতা অন্ততপক্ষে আরও ১০^১৪ গুন বা ১ কোটি কোটি গুন [১০০০০০০০০০০০০০০] বেশি হলে হয়তোবা ১৫০টি অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন ১টি প্রোটিন অণু তৈরি হলেও হতে পারে। সুতরাং আমরা খুব সহজেই ১৫০টি অ্যামিনো এসিড বিশিষ্ট ১টি প্রোটিন অণু সৃষ্টির সম্ভাব্যতাকে উপেক্ষা করে শূন্য হিসাবে ধরতে পারি।

এখন ১২টি ছক্কায় ৬ আসার ঘটনাটির সম্ভাব্যতা প্রায় ১/১০^৯ [০.০০০০০০০৪৫%] এবং এটি ইউনিভার্সাল প্রবাবিলিটি বাউন্ডের ভিতরেই রয়েছে। কিন্তু প্রবাবিলিটি বাউন্ডের এতো ভিতরে থাকা সত্ত্বেও এই ঘটনাটি আমরা আমাদের মহাবিশ্বে অনিয়ন্ত্রিত কোন পরিবেশে ঘটতে দেখা যায় না। তাহলে প্রোটিন সৃষ্টির মতো মাত্র ১/১০^১৬৪ সম্ভাব্যতা সম্পন্ন একটি ঘটনা যা কিনা প্রবাবিলিটি বাউন্ডের ১০^১৪ গুন বেশি বাহিরে তা কিভাবে ঘটার আশা আমরা করতে পারি? এখানে বিবর্তনবাদীদের যুক্তি অবশ্য থাকতে পারে যে প্রথম প্রোটিন আরও ছোট আকারের ছিল। হ্যাঁ আমরা জানি যে, যদি অ্যামিনো এসিডের ১০০ বা তার অধিক অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয় তাহলে যে পলিমার উৎপন্ন হয় তাকেই প্রোটিন বলে। অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড হিসাব অনুসারে সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন হল মাত্র ১০০ অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন। আর ১০০ অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন প্রোটিনের সম্ভাব্যতা হিসাব করলে দেখা যায় যে সেটি প্রবাবিলিটি বাউন্ডের অনেক ভিতরে চলে আসে। যদিও সেই সম্ভাবনা তারপরও অনেক ক্ষুদ্র থাকে এবং ১২টি ছক্কায় একত্রে ৬ আসার ঘটনা থেকেও জিলিওন জিলিওন গুন বেশি ক্ষুদ্র, কিন্তু যেহেতু প্রবাবিলিটি বাউন্ডের ভিতরে তাই একে আমরা ফেলে দিতে পারি না।

অবশ্য ৫০ অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন প্রোটিনও রয়েছে যেগুলো আসলে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের এবং সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা তুলনামুলকভাবে অনেক কম। যেমন: প্যারামিক্সোভাইরাস পরিবারের (family) মাম্পস ভাইরাসে (MuV) ৫৭ অ্যামিনো এসিড দীর্ঘ এক ধরনের প্রোটিন দেখা যায়। এই প্রোটিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু একটা জানা যায়নি।

কিন্তু এটা জানা গেছে যে এই ভাইরাসের টিস্যু কালচারের বৃদ্ধির জন্য এই প্রোটিনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।[5]

তবে এখানে একটা কথা রয়েছে। আর সেটা হল, আমাদের জানা মতে প্রোটিন সর্বোচ্চ ১০০০টি পর্যন্ত বা তার কিছু বেশি অ্যামিনো এসিড দ্বারা গঠিত হতে পারে। গাণিতিকভাবে হিসাব করলে পৃথিবীতে পাওয়া ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিড দিয়ে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত মোট ২০^১০০০ [২ এর পরে ১ হাজারটি শূন্য] ধরনের প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে।[6]

অনেকের মতে মানুষের দেহে এখনও পর্যন্ত পাওয়া বিভিন্ন ধরনের মোট প্রোটিনের সংখ্যা হল ১ লক্ষ।[7]

তাই সকল ধরনের অ্যামিনো এসিডের কথা চিন্তা করে আমরা গড় হিসেবে ১৫০ অ্যামিনো এসিড সম্পন্ন প্রোটিনের কথা চিন্তা করছি যা আসলে বেশীরভাগ প্রোটিনের তুলনায় আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। যদি আমরা প্রোটিনের সর্বমোট প্রকারভেদ ১ লক্ষ হিসাবেও ধরি এবং গড়ে প্রত্যেকটিকে ১৫০ অ্যামিনো এসিড দীর্ঘ হিসাবে ধরি তাহলে এলোমেলো পরিবেশ থেকে এই ১ লক্ষ প্রোটিনের আসার সম্ভাবনা হল (১/১০^১৬৪)^১০০০০০ = ১/১০^১৬৪০০০০০! অর্থাৎ ১০^১৬৪০০০০০ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ১টি ঘটনা। ১০^১৬৪০০০০০ মানে ১ এর পরে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ শূন্য থাকবে! আর যদি প্রোটিনের সংখ্যা ২০^১০০০টি অর্থাৎ ১০^১৩০১টি [১ এর পরে ১৩০১টি শূন্য] হয় তাহলে এতোগুলো প্রোটিন প্রকৃতি থেকে এলোমেলো পদ্ধতি দ্বারা আসার সম্ভাব্যতা হল – (১/১০^১৬৪)^১০^১৩০১!

এবার তাহলে প্রশ্ন হল যে, এত কমপ্লেক্স গঠন, ক্ষুদ্র প্রবাবিলিটি, স্পেসিফাইড কমপ্লেক্সিটি এবং প্রবাবিলিটি বাউন্ড এতোগুলো সমস্যা পার হয়ে নিয়ন্ত্রণহীন একটি পরিবেশ থেকে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার বিলিওন বা ১০ লক্ষ কোটি প্রজাতির উদ্ভব কিভাবে হল?

[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16439527 , http://jvi.asm.org/content/80/4/1700.short
[6] http://wiki.answers.com/Q/Why_do_so_many_different_types_of_proteins_exist#slide2
[7] http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101002165123AAsqpUw

এবারে একটি নতুন সংবাদের দিকে যাচ্ছি। নাসা (NASA) আমাদেরকে জানিয়েছে যে ২০৩২ সালে 2013 TV135 নামের একটি গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে আসবে। তবে তারা বলেছে আমাদের চিন্তার কোন কারন নেই! কেন কারন নেই? এর কারন হল যে এটি পৃথিবীতে আঘাত হানবে না!! এখন প্রশ্ন হল, তারা কিভাবে এত নিশ্চিত হল যে এটি আঘাত হানবে না? আসলে তারা সেই গ্রহাণুটির গতিপথ, গতিবেগ ইত্যাদি হিসাব করে দেখেছেন যে, এটি পৃথিবীতে আঘাত হানার সম্ভাবনা হল ৬৩০০০ বারের মধ্যে মাত্র ১ বার। এটি আঘাত না হানার সম্ভাবনা হল ৯৯.৯৯৮%। তার মানে আঘাত হানার সম্ভাবনা হল ০.০০২%![8]

চিন্তা করা যায়? এত বিশাল (!) একটি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নাসার "স্পেসগার্ড" এর মতো এত বড় একটি প্রোগ্রাম একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলো! যেহেতু তারা ০.০০২% এর মতো এত বড় সম্ভাব্যতাকে উপেক্ষা করতে পারছে তার মানে অবশ্যই ০.০০০০০০০৪৫% সম্ভাবনাকেও খুব সহজেই উপেক্ষা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ১২টি ছক্কায় একত্রে ১২টি ছয় উঠার সম্ভাবনাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারবো। তাহলে এর থেকেও জিলিওন জিলিওন গুন ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা সম্পন্ন ১৫০ অ্যামিনো এসিড দীর্ঘ ১টি প্রোটিন তৈরি হবার সম্ভাবনাকে আমরা কি করতে পারি? এছাড়াও আমাদেরকে চান্স দ্বারা গড়ে একই আকৃতির অন্ততপক্ষে আরও ১ লক্ষ প্রোটিন উদ্ভবের চিন্তা তো করতেই হবে! তবে তার আগে অবশ্য অত্যন্ত জটিল গঠনের অধিকারী সর্বপ্রথম সরল (!) কোষটির উৎপন্ন হবার ব্যাপারে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, যে কোষের কাল্পনিক মডেলের কথা এই লেখার শুরুর দিকে বলা হয়েছিলো!

যেখানে ক্ষুদ্র সম্ভাব্যতা নিয়ে সম্ভাব্যতার সীমা পার হয়ে মাত্র ১৫০ অ্যামিনো এসিড দীর্ঘ একটি প্রোটিনের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয় সেখানে কিভাবে জটিল একটি যন্ত্রের মতো গঠনের অধিকারী প্রাথমিক কোষের উদ্ভব হতে পারে?

[8] http://news.msn.com/science-technology/nasa-asteroid-coming-back-but-we-dont-need-to-worry

তাহলে আমরা আমাদের সমগ্র আলোচনা থেকে খুব সহজেই এই উপসংহারে আসতে পারি যে অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলো কোন পরিবেশ থেকে কখনই প্রাণের উদ্ভব হতে পারে না এবং এলোমেলো পদ্ধতি দ্বারা এই ঘটনা ঘটার মতো যথেষ্ট সময় এখনও পর্যন্ত আমাদের মহাবিশ্বকে দেওয়া হয়নি...

এভাবেই আমরা বিবর্তনবাদের গোড়ার কথা অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত ও এলোমেলো পরিবেশে ১টি সরল কোষ থেকে ধাপে ধাপে জীবজগতের উৎপত্তির মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে বাদ করে দিলাম।

সহায়ক তথ্যসূত্রসমূহ:

১। ILLUSTRATED FAMILY ENCYCLOPEDIA **– CELLS, Page – 190. (First published in Great Briten in 1997 as** MILLENNIUM FAMILY ENCYCLOPEDIA**, Reprint – 2008)**

২। উচ্চ মাধ্যমিক বলবিদ্যা ও বিচ্ছিন্ন গণিত; ৭ম সংস্করণ; লেখক – এম এ জব্বার (২য় অধ্যায় – সম্ভাব্যতা)

৩। উচ্চ মাধ্যমিক বলবিদ্যা ও বিচ্ছিন্ন গণিত; দশম সংস্করণ; লেখক – মোজাম্মেল হক ও হারুনুর রশীদ (২য় অধ্যায় – সম্ভাব্যতা)

৪। উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান ২য় পত্র; একাদশ সংস্করণ; লেখক – ডঃ সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী ও হারাধন নাগ (অধ্যায় ১১ – বায়ো অণুসমূহের রসায়ন)

‘Junk DNA’ -এর পতন

বিবর্তনবাদীদের নিকট 'homology' খুব প্রিয় জিনিস। এজন্যই দেখা যায় ডারউইনিজমের প্রমাণ দেখাতে গিয়ে ডারউইনিস্টরা দেখতে সদৃশ কয়েকটি কঙ্কাল কল্পিত ক্রমানুসারে উপস্থাপন করে। এরা হল ধীরে ধীরে বিবর্তনে বিশ্বাসী। আবার যারা মনে করে ধীরে ধীরে বিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বিবর্তন দিয়েই প্রজাতির উদ্ভবের ব্যাখ্যা করতে হবে, তারা হল নিওডারউইনিস্ট। এরা মনে করে পাঙ্কচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময় একটি প্রজাতি থেকে এক লাফে বিশাল জেনেটিক শিফট এর মাধ্যমে আরেকটি প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখা গেল কোষের ভেতরকার গঠন যে রকম সহজ ভাবা হয়েছিল সে রকম নয় । তখন সৃষ্টি করা হয় নিওডারউইনিজম তত্ত্বের।

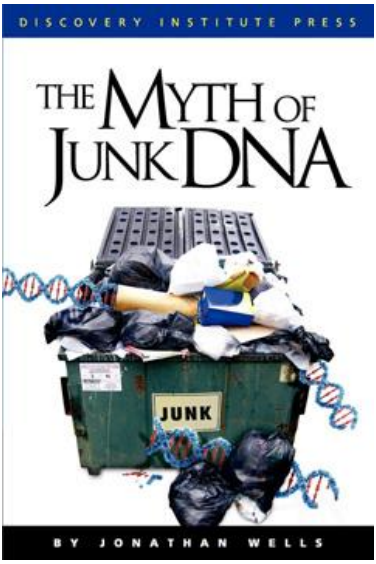

এরপর যখন ডিএনএ আবিস্কার হল এবং বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, মানুষের ডিএনএ’র প্রায় ৯৮% নন-কোডিং। অর্থাৎ এরা প্রোটিনের তথ্য ধারণ করে না। ব্যাস! বিবর্তনবাদীরা তো মহাখুশি। ইভোলিউশনিস্টরা বলে বসলেন এগুলো হল Junk DNA. বিবর্তনের বিভিন্ন সময়ে মিউটেশনের ফলে এগুলো নাকি রয়ে গেছে। এর উপর ভিত্তি করে দাড় করানো হল Phylogenetics এর তত্ত্ব সৃষ্টি হল মলিকিউলার ইভোলিউশন শাখা। এদের কাজ হল বিভিন্ন প্রজাতির ডিএনএ তে moleculer homology খুজে বের করা এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি বিবর্তনের ক্রমবিন্যাস তৈরী করা। বর্তমানে, মলিকিউলার ইভোলিউনিস্টরা বিবর্তনের phylogenetic tree তৈরী করছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে paleontology তথা কঙ্কালের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তৈরী evolutionary tree এর মধ্যে বিশাল তফাৎ। ব্যাস! চলছে, কোন 'tree' টি গ্রহন করা হবে সেটা নিয়ে যুদ্ধ। এছাড়া step by step ইভোলিউশন এর সাথে punctuated equilibrium এর যুদ্ধ তো লেগেই আছে।

In the mean time, যতই দিন যাচ্ছে গবেষণায় বের হয়ে আসছে ডিএনএর কোন অংশই 'Junk' নয়। বিশেষ করে এপিজেনেটিক্স এর গবেষণা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সম্প্রতি ENCODE প্রজেক্টের গবেষনায় বের হয়ে এসেছে যে ৮০% জিনের বায়োকেমিকাল ফাংশন আছে।[9] অধিকন্তু ENCODE প্রজেক্ট পরীক্ষা করেছে মানুষের শরীরে '১৪৭' প্রকারের কোষ নিয়ে, যেখানে মানুষের শরীরে কোষ আছে কয়েক হাজার প্রকারের! অর্থাৎ শীঘ্রই এই হিসেবটা ১০০% এ উন্নীত হবে সন্দেহ নেই। তবে যথারীতি বিবর্তনবাদীরা এখন নতুন কোন তত্ত্ব দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। এমনকি এর মধ্যে 'ফাংশন' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে শুরু হয়েছে বাকবিতন্ডা[10]। মূল তত্ত্বে হেরে গেলেও এট লিস্ট 'শব্দ' টির অর্থ পাল্টে দিয়ে যদি টিকে থাকা যায়, you know!

যেখানে ডিএনএর কোন অংশই অহেতুক নয়, সেখানে 'Phylogenetic' এর গবেষণা যে, দুটো 'Software' এর মধ্যে কত শতাংশ কোডের মিল রয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না সেটা বলাই বাহুল্য।

রিচার্ড ডাকিন্স 'Junk DNA' এর গুরুত্ব নিয়ে 'The Selfish Gene' নামক বই লিখেছেন। বইও বাজারে আছে, আছে ডকিন্স এবং আছে নতুন গবেষণায় প্রাপ্ত 'Junk DNA' এর 'Reality'। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

[9] http://www.evolutionnews.org/2012/09/junk_no_more_en_1064001.html
[10] http://www.evolutionnews.org/2012/09/perspectives_on064741.html

মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো ইভলুশন: আদৌ কি সম্ভব?

বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনের উদাহরণ দিতে গিয়ে এমন কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেন যেগুলোকে মাইক্রোইভলুশন বলা যায়। কোন সন্দেহ নেই যে, ন্যাচারাল সিলেকশন এবং মিউটেশনের মধ্য দিয়ে মাইক্রোইভলুশন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই দৃশ্যমান উদাহরণগুলো থেকে মাইক্রোইভলুশন ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ম্যাক্রোইভলুশন করে - এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে কি-না? চলুন, কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করি।

প্রথমেই জেনে নিই মাইক্রোইভলুশন এবং ম্যাক্রোইভলুশন কী? নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে আগেরটি ছোট ছোট পরিবর্তনকে বুঝায় এবং পরেরটি বড় পরিবর্তনকে বোঝায়। (সে হিসেবে আমরা এ প্রবন্ধে মাইক্রোইভলুশনকে ছোট-বিবর্তন এবং ম্যাক্রোইভলুশনকে বড়-বিবর্তন হিসেবে উল্লেখ করব।)

এককোষী ও বহুকোষী জীবের সাপেক্ষে এ দু' টো প্রক্রিয়ার উদাহরণে পার্থক্য আছে। এককোষী জীব যেমন- ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ক্ষেত্রে ছোট-বিবর্তনের উদাহরণ হল, ব্যাকটেরিয়ায় ড্রাগ রেজিস্টেন্স তৈরী, এইচআইভি কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন-এর আগমন। অন্যদিকে, এককোষী জীবে বড়-বিবর্তনের উদাহরণ হবে, ফ্ল্যাজেলামবিহীন ব্যাকটেরিয়াতে ফ্ল্যাজেলার আগমন, কিংবা একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটি প্রজাতির (তথা ভিন্ন বাহ্যিক গঠনের) ব্যাকটেরিয়া তৈরী।

প্রসঙ্গত, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের তথা এককোষী জীব ও বহুকোষী জীব যাদের যৌন প্রজনন হয় না তাদের ক্ষেত্রে 'প্রজাতি' চেনা হয় গাঠনিক আকার, আকৃতি, কোষপ্রাচীরের আনবিক উপাদানের সাদৃশ্য ও গ্লাইকোক্যালিক্স এবং ফ্ল্যাজেলামের উপস্থিতি (ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি উপায়ে। বহুকোষী জীবের মধ্যে যাদের যৌন প্রজনন হয় তাদের ক্ষেত্রে 'প্রজাতি' চেনা হয় 'যৌন প্রজনন' করতে পারার যোগ্যতার

ভিত্তিতে, অর্থাৎ উক্ত জীব সমগোত্রীয় যে জীবগুলোর সাথে যৌন প্রজনন করতে পারে তাদের নিয়ে তৈরী করে একটি ‘ প্রজাতি’ ।

কিন্তু, বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে ছোট-বিবর্তনের উদাহরণ হল- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ক্ষুদ্র পরিবর্তন। যেমন: গায়ের রং এবং ডিজাইন, পশমের পরিমাণ, চোখের মনির রঙ, উচ্চতা, মাংসপেশীর তারতম্য, কণ্ঠ ও সুরের ধরণ ইত্যাদি। অন্যদিকে, বহুকোষী প্রাণীর ক্ষেত্রে বড়-বিবর্তনের উদাহরণ হল: স্পঞ্জ-এর ক্ষেত্রে নিডোসাইট নামক কোষের আগমন, সরিসৃপে পাখার আগমন, মাছের পাখনা থেকে পা-এর আগমন ইত্যাদি।

মজার ব্যপার হল, এককোষী জীব, যেমন: ব্যাকেটিরিয়ার ক্ষেত্রে মাইক্রোইভলুশন প্রজাতির পরিবর্তন করছে না, বরং নতুন স্ট্রেইন তৈরী করছে। অন্যদিকে, যৌন প্রজননের ভিত্তিতে প্রজাতির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ছোট-বিবর্তন দিয়েই প্রজাতি বা উপপ্রজাতি তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় বিবর্তনবাদীদের উপস্থাপিত প্রজাতি (তাদের মতে, আসলে হবে উপ-প্রজাতি) তৈরীর (যাকে স্পেশিয়েশন বলে) সবচেয়ে বড় উদাহরণ দিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার সালামান্দার সার্কেল দিয়ে প্রজাতির (উপ-প্রজাতি) উদ্ভব ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

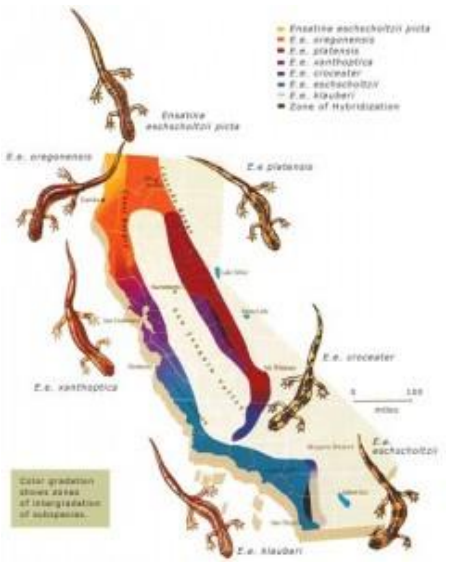

পাশের ছবিটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সালামান্দার প্রজাতি *Ensatina eschschoitzi*-এর ৭টি উপপ্রজাতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী স্যান জাওকিন ভ্যালির আশেপাশে বাস করে। উপ-প্রজাতিগুলোর মূল পার্থক্য তাদের গায়ের

রঙ-এর নকশা (প্যাটার্ন) এবং সম্ভবত ফেরোমোন। সালামান্দারের গায়ের রং-এর নকশা পরিবর্তন হয় হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন-এর মাধ্যমে। সহজ কথায়, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈরী হওয়ার এক পর্যায়ে এক জোড়া ক্রোমোজামের মধ্যে ক্রসিংওভার নামক একটি ঘটনা ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় জিনোমের কিছু সুনির্দিষ্ট অংশের আদান প্রদান এবং পুনঃবিন্যাস হয়। মনে রাখা দরকার, এ প্রক্রিয়াটি কিছু বৈশিষ্ট্যে ভ্যারিয়েশন তৈরী করতে প্রাণীর কোষে নির্মিত সুনিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া। যদিও রিকম্বিনেশন হচ্ছে র‍্যান্ডমভাবে, কিন্তু তা হচ্ছে একটি নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে।

বিবর্তনবাদীদের ইন্টারপ্রিটেশন অনুযায়ী, এভাবে সৃষ্ট ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে ভ্যালীর উত্তরে অবস্থিত *Ensatina eschschoitzi picta* উপ-প্রজাতিটি দক্ষিণ দিকে এসে এমন দুটো উপ-প্রজাতি *Ensatina eschschoitzi klauberi* এবং *Ensatina eschschoitzi eschschoitzii* –তে পরিণত হয়েছে, যারা পরস্পর যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না। সালামান্দার প্রজাতি যৌনক্রিয়ার জন্য বিপরীত লিঙ্গ বাছাই করতে সাধারণত ফেরোমোন নামক শরীর থেকে নিঃসৃত বিশেষ গন্ধ উৎপাদনকারী পদার্থ ব্যবহার করে। (এছাড়া, কোন কোন প্রজাতি স্পর্শ এবং কোন কোন প্রজাতি দৃষ্টি-সম্বন্ধীয় সূত্র তথা ভিজুয়্যাল কিউ ব্যবহার করে থাকে)। সে হিসেবে *Eschschoitzi klauberi* এবং *Ensatina eschschoitzi eschschoitzii* উপ-প্রজাতি দুটোতে ক্রসিং ওভারের মধ্য দিয়ে রং এবং ফেরোমোনের যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে যাওয়ায় তারা প্রজাতির সংজ্ঞানুযায়ী আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। (আবার, এ-ও হতে পারে যে তাদের রিপ্রোডাকশন না করার কারণ আচরণগত।)

পাঠক, লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে কার্যত ছোট-বিবর্তন সংঘটিত হল এবং ছোট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি প্রজাতি (উপ-প্রজাতি) দুটো প্রজাতিতে (উপ-প্রজাতিতে) পরিণত হল। অন্যদিকে, এককোষী জীবে নতুন প্রজাতি আসতে হলে এর মূল গঠনের মধ্যে পরিবর্তন আসতে হবে।

বিবর্তনবাদীরা ছোট-বিবর্তনের উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে বলতে চাচ্ছে যে, মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে এই ধরণের ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন গঠনের বড়-বিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু আসলেই কি তা সম্ভব? আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখলাম, এককোষী জীব এবং বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে প্রজাতির সংজ্ঞা ভিন্ন হওয়ায় বিষয়টি পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। (আলোচনার সুবিধার্তে ধরে নিচ্ছি বহুকোষী জীব মাত্রই যৌন প্রজনন করে এবং ভাইরাস এককোষী জীবের মত আচরণ করে)।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে পাঠকের জন্য একটি চিন্তার খোরাক দেয়া যাক। ধরুন, আপনি সমুদ্রতীরে আছেন। তীরে হাটার সময় আপনি লক্ষ্য করলেন দূরে বালুর একটি স্তুপ তৈরী হয়েছে। আপনি স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করবেন ওখানে কেউ একজন বালুর স্তুপ জমা করে রেখেছে অথবা হঠাৎ কোন ঘূর্ণায়মান বায়ুর প্রবাহ ওদিকে দিয়ে যাওয়ায় স্তুপ তৈরী হয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে ভাবতে পারতেন যে, সমুদ্রের ঢেউ ধীরে ধীরে বালু জমা করতে করতে স্তুপ তৈরী করেছে। কিন্তু আপনি তা ভাবলেন না। কেন? কারণ, আপনি দেখছেন সমুদ্রের ঢেউ অনেকটা জায়গা জুড়ে আসছে। অতএব, ঢেউয়ের কারণে বালুর বিন্যাস হলে তীরে ঘেষে অনেকখানি জায়গা জুরে হতো। অতঃপর, আপনি যখন বালুর স্তুপটির আরও কাছে গেলেন, আপনি দেখতে পেলেন ওখানে বালুর স্তুপ নয় বরং বালু দিয়ে ঘরের মত তৈরী করা হয়েছে। এ অবস্থায় আপনার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হবে যে, এটি একজন দক্ষ মানুষ নির্মান করেছে, ঘুর্ণায়মান বায়ুর কারণে এটি তৈরী হয়নি। আপনাকে কেউ যদি জোড় করেও বলে যে, কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে আস্তে আস্তে এই ঘর তৈরী হয়েছে, তারপরও আপনি বিশ্বাস করবেন না। এমনকি, এর পক্ষে যদি পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী এক হয়ে যায় তারপরও আপনি তার বিপরীতে একা থাকবেন। কারণ, বালুর ঘরটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি অনিয়মিত (ইরেগুলার) আকৃতিসম্পন্ন এবং এই ইরেগুলারিটি এলোমেলো তথা র‍্যান্ডম নয়, সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখল। অর্থাৎ, সমুদ্রের ঢেউ এবং এ জাতীয় যে কোন জিনিস যা কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র মেনে চলে সেগুলো ক্রমে ক্রমে একটি

নিয়মিত গঠন (Order) তৈরী করতে পারে, কিন্তু অনিয়মিত সুশৃংখল গঠন (Organization) তৈরী করতে পারে না। আবার, র‍্যান্ডম প্রক্রিয়া হয়তো এলোমেলো জটিল গঠন (Complexity) তৈরী করতে পারে, কিন্তু অনিয়মিত সুশৃংখল ও জটিল গঠন (Organized Complexity) তৈরী করতে পারে না। যত সময়ই দেয়া হোক না কেন, সমুদ্র তীরে বালু জমে একা একা ঘর তৈরী হবে না। শীতলস্থানে পানি একা একা ঠান্ডা হয়ে বরফ হলেও কোটি বছরেও বরফের ভাস্কর্য তৈরী হবে না। ঠিক একই ভাবে, র‍্যান্ডম মিউটেশন ও ন্যাচারাল সিলেকশনের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানলেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন তা বড়-বিবর্তন ঘটাতে পারে না।

আমরা জানি, AIDS রোগের জন্য দায়ী HIV ভাইরাস এবং Flu রোগের জন্য দায়ী Influenza ভাইরাস এন্টিভাইরাল ঔষধ এবং মানুষের শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে এ ধরণের স্ট্রেইন দ্রুত তৈরী করে। বিবর্তনবাদীরা এ ঘটনাকে বিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে প্রচার করেন। দুটি ভাইরাসের ক্ষেত্রেই মিউটেশনের মধ্য দিয়ে এ ধরণের পরিবর্তন আসে। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, মিউটেশন হয় মূলত জিনোমের এমন একটি জায়গায় যা সংশ্লিষ্ট অণুটির গাঠনিক অখণ্ডতাকে নষ্ট করে না। এ ধরণের জায়গাকে বলে 'হাইপার ভ্যারিয়েবল' রিজিওন। যেমন: ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বেলায় এ ধরণের মিউটেশন হয় হিমাগ্লুটিনিন নামক অণুর হাইপারভ্যারিয়েবল রিজিওনে। কিন্তু একই অণুর অন্যান্য রিজিওনে মিউটেশন হলে গাঠনিক অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে না, তথা অকার্যকর হয়ে পড়ে। Jewetz, Melnick ও Adelberg তাদের Medical Microbiology বইয়ে হিমাগ্লুটিনিন (HA)-এর গঠন সম্পর্কে বলছেন:

The HA molecule is folded into a complex structure. Each linked HA 1 and HA 2 dimer forms an elongated stalk capped by a large globule. The base of the stalk anchors it is the membrane. Five antigenic sites on the HA molecule exhibit extensive mutations. These sites occur at regions

exposed on the surface of the structure, **are apparently not essential to the moleule's stability**, and are involved in viral neutralization. **Other regions of the HA molecule are conserved in all isolates, presumably because they are necessary for the molecules to retain its structure and function.**[11]

অর্থাৎ, মিউটেশন যদি গঠনের এমন জায়গায় হয় যেখানে মিউটেশন হলে ভাইরাস তার ইনফেকটিভিটি তথা আক্রমণ করার ক্ষমতা না হারিয়েও টিকে থাকতে পারে তখনই কেবল ভাইরাস উক্ত মিউটেশনের মধ্য দিয়ে রেজিসটেন্ট স্ট্রেইন তৈরী করতে পারবে। অথচ, আমরা উপরে জেনেছি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রজাতি সংজ্ঞায়িত হয় আকার, আকৃতি, গাঠনিক উপাদানের সাদৃশ্য দ্বারা। অর্থাৎ, ভাইরাসকে ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত করতে হলে তাকে ত্রিমাত্রিক গঠন পরিবর্তন করতে হবে।

অন্যদিকে, যে মিউটেশনগুলো গঠনকে পরিবর্তন করে দেয় সেগুলো ভাইরাসকে অকেজো করে ফেলে। ফলে, ভাইরাস ভিন্ন আকৃতি তৈরী করার জন্য বাঁচতে পারবে না।

এইডস ভাইরাসের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এইডস ভাইরাসের জিনোমে পাঁচটি হাইপারভ্যারিয়েবল রিজিওন আছে। এ কারণেই দেখা যায় র‍্যান্ডম মিউটেশন সব জায়গায় টোলারেট করতে পারলে, ভাইরাসে রিপ্রোডাকশন রেট বেশী হওয়ায় এইডস ভাইরাস এতদিনে পরিবর্তন হয়ে অন্য ভাইরাস হয়ে যেত, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং এর গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষা করে উচ্চমাত্রার ভিন্নতা তৈরীর ক্ষমতা (স্ট্রাকচারাল প্লাস্টিসিটি) থাকায় একটার পর একটা ড্রাগ রেজিসটেন্ট স্ট্রেইন তৈরী করে যাচ্ছে।

[11] Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 540 [Emphasis Added]

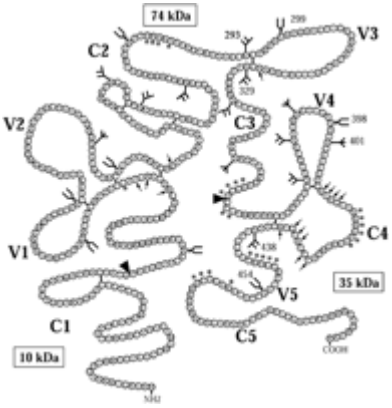

পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে এইচআইভি ভাইরাসের গ্লাইকোপ্রোটিন-১২০ প্রোটিনের পাঁচটি হাইভ্যারিয়েবল রিজিওন (V দিয়ে চিহ্নিত) এবং ৫টি অপরিবর্তনশীল তথা কনস্টেন্ট রিজিওন (C দিয়ে চিহ্নিত)।

এই উদাহরণ দুটো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, মিলিয়ন বছর সময় দিলেও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা এইডস ভাইরাস অন্য ভাইরাসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সিদ্ধান্তকে আরো পোক্ত করে এমন ভাইরাসের উদাহরণ যেগুলোকে বৈশ্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন ঘোষণা করা হয়েছে। ৮-ই মে ১৯৮০ সালে ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গ্যানাইজেশন স্মল পক্সকে নিশ্চিহ্ন ঘোষণা করেছে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হল? উত্তর: স্মল পক্সের জিনোমে হাইপারভ্যারিবেল রিজিওন নামে কোন স্থান ছিল না। ফলে স্মল পক্সের বিপরীতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে একে বিলুপ্ত করে দেয়া গেছে। বিবর্তন একে রক্ষা করতে পারেনি। ঠিক একইভাবে ইয়েলো ফিবার, পোলিও, মিজেলস ইত্যাদি ভাইরাসের বিপরীতে একবার ভ্যাক্সিনেশন করলে পুরো জীবন তা প্রোটেকশন দিতে পারে। কারণ, এই ভাইরাসগুলোর জিনোমেও এমন কোন রিজিওন নেই, যা গাঠনিক একাগ্রতা ঠিক রেখে ইনফেকভিটি মেইনটেইন করতে পারবে।

ব্যাকেটেরিয়া বিভিন্নভাবে ড্রাগ রেজিসটেন্ট স্ট্রেইন তৈরী করতে পারে। সংক্ষেপে এগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: ১. ড্রাগটিকে কোষ থেকে বের করে দেয়া, ২. ড্রাগটিকে এনজাইমের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া এবং ৩. ড্রাগটি কোষের যে স্থানে (তথা টার্গেটে) বন্ধন তৈরীর মাধ্যমে কাজ করে সে স্থানটিতে আকৃতির পরিবর্তন সাধন করা।

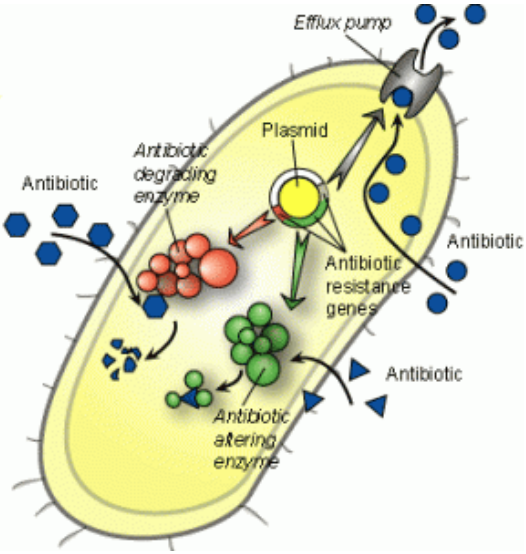

প্রথম দুটি পদ্ধতি সংঘটিত করার জন্য যে এনজাইমগুলো কাজ করে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় জেনেটিক তথ্য থাকে প্লাজমিডে। লক্ষ্যণীয়, প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার মূল জেনেটিক এলিমেন্ট থেকে পৃথক এবং ব্যাকটেরিয়া গঠনে কোন প্রভাব না ফেলে কাজ করতে পারে। তৃতীয় পদ্ধতিটি সংঘটিত হয় মিউটেশনের মাধ্যমে। যদি মিউটেশনের ফলে টার্গেট এনজাইমে এমন ধরণের পরিবর্তন আসে যা এনজাইমের মূল কাজকে অক্ষত রেখে ওষুধের সুনির্দিষ্ট আণবিক লক্ষ্যস্থলে সামান্য পরিবর্তন আনে তাহলে ওষুধটি আর কাজ করতে পারে না। কিন্তু, মিউটেশন যদি মূল এনজাইমের গঠন ও কর্মক্ষমতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়াটি ধ্বংস হবে এবং ড্রাগ রেজিস্টেন্ট স্ট্রেইন তৈরী হবে না। ব্যাকটেরিয়াতে যেকোনো এনজাইমের ফাংশন মূলত 'অপটিমাম' হয়। অর্থাৎ, এনজাইমটি খুব বেশী কাজও করে না আবার একেবারেই কম কাজও করে না। মিউটেশনের মাধ্যমে যে এনজাইমটি তৈরী হচ্ছে তা মূল এনজাইমটির মত কাজে দক্ষ হয় না। ফলে, ব্যাকটেরিয়ার ড্রাগ রেজিস্টেন্স স্ট্রেইন ওয়াইল্ড টাইপ স্ট্রেইন থেকে দুর্বল তথা কম ফিটনেস ফাংশন যুক্ত হয়।

প্রথম দুটো প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া যে রেজিসটেন্ট জিন ব্যবহার করছে তা মূলত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ শুরু হওয়ার আগে থেকেই ছিল। ব্যাকটেরিয়ার একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার। এ প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাকটেরিয়া অন্য ব্যাকটেরিয়া থেকে জিনোম সংগ্রহ করতে পারে। এভাবেই মূলত উপরোক্ত দু'ধরণের রেজিসটেন্ট জিন এক ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেক ব্যাকটেরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উক্ত জিনগুলো কীভাবে উদ্ভব হল, তা এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে না। অন্যদিকে, তৃতীয় প্রক্রিয়াটিকে প্রকৃত নিও-ডারউইনিয়ান প্রক্রিয়া বলা যায়। কারণ, মিউটেশনের মধ্য দিয়ে যে স্ট্রেইন তৈরী হচ্ছে, ওষুধ-যুক্ত পরিবেশে তা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিবর্তনের এই উদাহরণ থেকে কি ব্যাকটেরিয়ার আকার, আকৃতি ও আনবিক গঠনে কোন পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়? উত্তর: না। কারণ, গাঠনিক আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেলে ব্যাকটেরিয়া তার গাঠনিক একাগ্রতা হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর রিপ্রোডাকশন যদি না করতে পারে সে পরবর্তী প্রজন্মে পরিবর্তিত গঠন প্রবাহ করবে কীভাবে? নতুন প্রজাতি-ই বা গঠন করবে কীভাবে?

অর্থাৎ, ছোট-বিবর্তনের এই উদাহরণ থেকে বড়-বিবর্তনকে ইনফার করা যাচ্ছে না। তদুপরি, আমরা যদি ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলামের কথা চিন্তা করি, ফ্ল্যাজেলামে প্রায় চল্লিশটি ভিন্ন ধরণের প্রোটিন থাকে, তাহলে উপরোক্ত চল্লিশটি প্রোটিনের জিন সুনির্দিষ্টভাবে জিনোমে বিন্যস্ত হতে হবে। এই পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়াশীল প্রোটিনযুক্ত গঠনটির একটি প্রোটিনের অবর্তমানে সে তার কাজ সঠিকভাবে করতে পারবে না। অর্থাৎ ফ্ল্যাজেলামকে কাজ করতে হলে পুরোপুরি একসাথে আসতে হবে। কিন্তু, উপরের মিউটেশনের উদাহরণ থেকে আমরা দেখেছি, মিউটেশন শুধু ইতোমধ্যে বিদ্যমান জেনেটিক তথ্যকে কিছুটা ওলটপালট করতে পারে। কিন্তু, নতুন জেনেটিক তথ্য যোগ করতে পারে না।

এছাড়াও, ব্যাকটেরিয়া যেহেতু খুব দ্রুত রিপ্রোডাকশন করতে পারে, সেহেতু ব্যাকটেরিয়াতে মিউটেশনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনগুলোও দ্রুত হবে। যদি প্রতি এক

ঘন্টায় একটি রিপ্রোডাকশন হয়েছে ধরা হয়, এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ ব্যাকটেরিয়ার জেনারেশন তৈরী হয়েছে। মানুষের রিপ্রোডাকটিভ স্কেলে যা প্রায় ১০ মিলিয়ন বছরের ইকুইভ্যালেন্ট। অথচ, এই দীর্ঘ সময়ে ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রজাতি পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, নতুন প্রজাতি আসেনি।[12] রিচার্ড লেনস্কি ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ ইভলুশন এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫০০০০ জেনারেশন পার হয়েছে। ই. কোলাই-এর বিভিন্ন স্ট্রেইন তৈরী হয়েছে কিন্তু ই. কোলাই প্রজাতি পরিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে পরিণত হয়নি।[13]

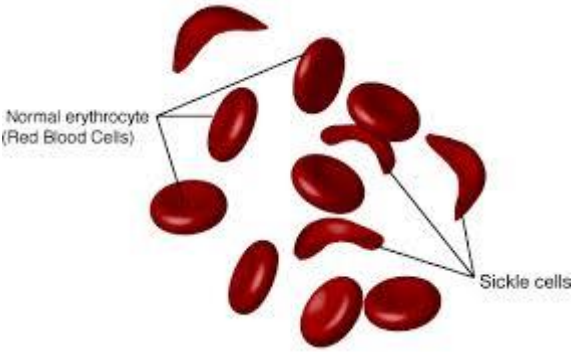

বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে আমরা উপরে দেখেছি যে, প্রজাতির সংজ্ঞা গঠনের উপর নির্ভর করে না। ফলে, ছোট পরিবর্তনও প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারে। একই সাথে আমরা এও দেখেছি যে, প্রজাতির জিনোমে যে ভ্যারিয়েশনগুলো হয়, তা ইতোমধ্যে বিদ্যমান তথ্যের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও মিউটেশনের মধ্য দিয়ে ভ্যারিয়েশন তৈরী হতে পারে। তবে সেটি হয় কোন একটি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। যেমন: একটি নির্দিষ্ট অ্যামাইনো এসিড পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাধারণ হিমোগ্লোবিন পরিবর্তন হয়ে হিমোগ্লোবিন এস তৈরী হয়। হিমোগ্লোবিন এস-এর বৈশিষ্ট্য হল এটি সুনির্দিষ্ট ট্রিগার পেলে কাঁচির মত আকৃতি ধারণ করে পাতিত হয় এবং সাথে উক্ত হিমোগ্লোবিনযুক্ত লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতিও কাঁচির মত হয়ে যায়। ফলে, লোহিত রক্ত কণিকাগুলো

[12] http://www.truthinscience.org.uk/tis2/index.php/evidence-for-evolution-mainmenu-65/175-development-of-biological-resistance.html
[13] http://myxo.css.msu.edu/ecoli/overview.html

অকেজো হয়ে পড়ে। মানবদেহের স্প্লিনের কাজ হল অকেজো রক্ত কণিকাকে গ্রহণ করে নষ্ট করে ফেলা। অন্যদিকে, ম্যালেরিয়া জীবাণু তার জীবনচক্রের একটি পর্যায় অতিক্রম করে লোহিত রক্ত কণিকায়। এমতাবস্থায় লোহিত রক্তকণিকাগুলো মারা যাওয়া অর্থ হলো ম্যালেরিয়ার জীবাণু মারা যাওয়া। এভাবে, যে সকল সিকল সেল এনেমিয়া ট্রেইটের রুগীদের জিনোমে হিমোগ্লোবিন এস-এর একটি অ্যালিলি থাকে তারা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরণের প্রাকৃতিক রেজিসটেন্স তৈরী করে এবং সাধারণ মানুষদের তুলনায় বেশী বেঁচে থাকে এবং রিপ্রোডাকশন করতে পারে। কিন্তু, স্পষ্টতই সিকল সেল এনেমিয়া পরিবর্তিত পরিবেশে রুগীদের সামান্য উপকার করতে পারলেও, সাধারণ মানুষদের তুলনায় এরা প্রকৃতপক্ষে কম যোগ্য (ফিট)।

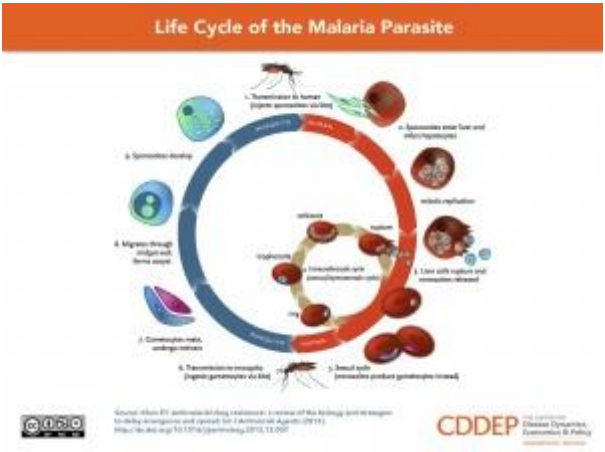

তবে বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে বড়-বিবর্তন হতে হলে ব্যাখ্যা করতে হবে সম্পূর্ণ নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের আগমন। যেমন: পাখির ডানা। পাখির ডানা আসতে গেলে আসতে হবে পাখির ডানার সুনির্দিষ্ট গঠন, যেমন: পালক; ডানার সাথে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী, রক্তসংবাহী নালী, নার্ভের জাল ও তার সাথে মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন এবং পাখার গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যালগরিদম। স্বাভাবিকভাবেই, এগুলো আসার অর্থ হল জিনোমে সুনির্দিষ্ট ও সুশংখলভাবে নতুন জেনেটিক তথ্য আসা। সুতরাং, বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে ছোট-বিবর্তনের যে উদাহরণ আনা হচ্ছে, যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন তা উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট জেনেটিক তথ্যের সমাগম ব্যাখ্যা

করতে পারে না। অর্থাৎ এই ধরণের ছোট-বিবর্তন কোটি বছর ধরে হলেও বড়-বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

পাঠক, আমরা উপরের দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে কয়েকটি জিনিস বুঝতে পারলাম। এক, প্রজাতির সংজ্ঞা এককোষী জীব এবং বহুকোষী জীব যা যৌন প্রজনন করে তার ক্ষেত্রে ভিন্ন। দুই, ছোট-বিবর্তন এককোষী জীবে প্রজাতি তৈরী করে না বরং একই প্রজাতির বিভিন্ন স্ট্রেইন তৈরী করে, অন্যদিকে বহুকোষী জীবে উপ-প্রজাতি তৈরী করে। সে হিসেবে একজন বিবর্তনবাদী যদি বলে বিবর্তন প্রজাতি তৈরী করছে তাহলে তার বক্তব্য মিথ্যা হবে না, তবে অস্পষ্ট হবে। তিন, ছোট-বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে বড়-বিবর্তনের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে না। ছোট-বিবর্তন শারীরিক গঠনের উপাদানে না হলে বড় পরিবর্তন আসার মাধ্যমে নতুন প্রজাতি আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু, ছোট-বিবর্তন শারীরিক উপাদানে হলে প্রজাতির মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বা কম-কর্মক্ষম প্রজাতি তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অথচ, প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু অধিকতর যোগ্য প্রজাতিকে নির্বাচিত করে। সে হিসেবে কম-কর্মক্ষম প্রজাতি প্রতিকূল পরিবেশে আপাত সুবিধে দিলেও পুরো পপুলেশনের সাপেক্ষে কোন উত্তম ভ্যারিয়েশন প্রবাহ করতে পারছে না। এ কারণে, কোটি কোটি বছর পার হলেও এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আগমন ঘটাতে সক্ষম নয়।

সর্বশেষ কথা হল, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা ছোট-বিবর্তনের উদাহরণ এনে 'কোটি বছরের' ধোঁয়াটে আবেদন দিয়ে বড়-বিবর্তনকে সত্য ধরে নিচ্ছেন এবং প্রচার করছেন। কিন্তু আদৌ এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ আছে কি না সেই বিশ্লেষণে গেলে তারা ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করছেন না। বরং, বিবর্তনবাদকে সত্য ধরে নিয়ে করা রিসার্চ দেখিয়ে তারা তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এর পেছনের উদ্দেশ্যটি কি বৈজ্ঞানিক? না-কি আদর্শিক?

আর্কিব্যাকটেরিয়া থেকে আর্কিয়া – বিবর্তনবাদীদের অস্বস্থি

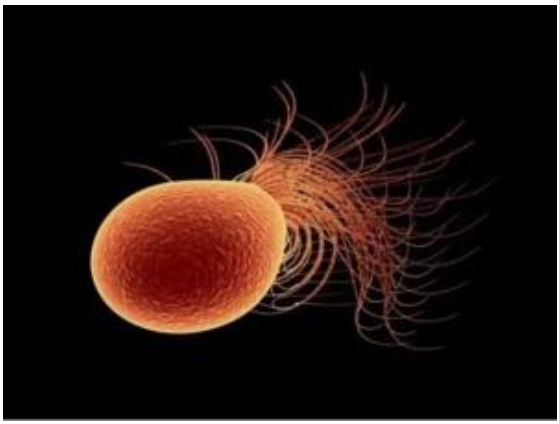

6. (Pyrococcus furiosus একটি আর্কিয়ন)

আর্কিয়া হল এক কোষী আনুবীক্ষণিক জীবের একটি গ্রুপ (ডোমেইন)। এই ডোমেইনের সদস্য হল ব্যাকটেরিয়ার মত এক কোষী অনুজীব যাদের কোন নিউক্লিয়াস ও মেমব্রেন বাউন্ড অর্গ্যানিলিস নেই। প্রথমে উত্তপ্ত ঝর্ণা, লবনাক্ত লেক এর মত কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় বলে এদেরকে ‘ এক্সট্রারমোফাইল’ বলা হত। পরবর্তীতে এদেরকে মাটি, সমুদ্র, জলাভূমি, এমনকি মানুষের কোলনেও পাওয়া গেছে।

যতদিন পর্যন্ত আর্কিয়নের আণবিক গঠন জানা যায় নি ততদিন এদেরকে বলা হত আর্কিব্যাকটেরিয়া। এদেরকে প্রক্যারিওটের মধ্যে রাখা হয়েছিল। পরে যখন গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখা গেল এরা ভিন্ন ধরণের স্ট্রাকচারাল মলিকিউল দিয়ে গঠিত তখন বিজ্ঞানিরা পরলেন বিপাকে। কেননা একদিকে এদের আনুবিক্ষনিক গঠন ব্যাকটেরিয়ার মত আবার অন্য দিকে এদের বেশ কিছু ‘জিন’ ও মেটাবলিক পাথওয়ে ইউক্যারিওটের মত। আবার, এদেরকে বিশাল সংখ্যায় প্রকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানিদের আর্কিয়া নামক একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ডোমেইন-ই তৈরী করতে হল।

উইকিপিডিয়াতে কথাগুলো এভাবে আছে:

‘In fact, the Archaea have an independent evolutionary history and show many differences in their biochemistry from other forms of life, and so they are now classified as a separate domain in the three-domain system.’

আসুন দেখি আর্কিয়ার সেল মেমব্রেনে কী পাওয়া গেল:

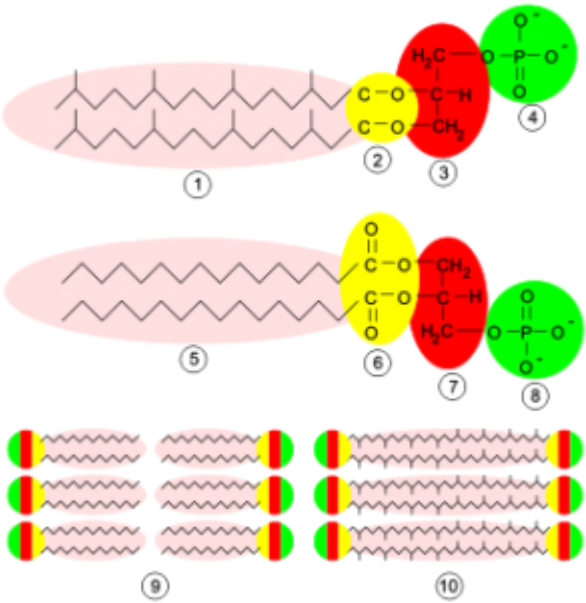

Membrane structures.

Top: an archaeal phospholipid: **1**, isoprene chains; **2**, ether linkages; **3**, L-glycerolmoiety; **4**, phosphate group.

Middle: a bacterial or eukaryotic phospholipid: **5**, fatty acid chains; **6**, ester linkages; **7**,. D-glycerol moiety; **8**, phosphate group.

Bottom: **9**, lipid bilayer of bacteria and eukaryotes; **10**, lipid monolayer of some archaea.

প্রতিটি কোষের সেল মেমব্রেন গঠিত হয় ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দিয়ে। এই ফসফোলিপিড অণু গুলো তৈরী হয় স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডের লম্বা চেইনের সাথে ফসফাটিডিক এসিড এর এস্টার বন্ধন(-COO-) দিয়ে।

কিন্তু, আর্কিয়নের আনবিক গঠন পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এক্ষেত্রে ফসফোলিপিডের লিপিড অংশটুকু আইসোপ্রিনাইল এলিফেটিক জৈব অণু দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ এর লিপিড অংশটুকু তে

এমন কিছু জৈব অণু আছে যেগুলোর আবার সাইডব্রানচিং আছে। অন্যদিকে এই অনুগুলো ব্যাকটেরিয়ার মত ফসফাটিডিক এসিডের সাথে এস্টার বন্ধনে যুক্ত না হয়ে ইথার (-CO-) বন্ধন দিয়ে যুক্ত। (ইথার বন্ধন এস্টার বন্ধনের চেয়ে বেশী রেসিলিয়েন্ট)

ফসফাটিডিক এসিডের গঠনে একটি গ্লিসারিন অণুর তিনটি হাইড্রোক্সাইড অনুর মধ্যে একটি হাইড্রোক্সাইড ফসফেট এর সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে। প্রকৃতিতে গ্লিসারিনের দুটি ময়েটি পাওয়া যায়। একটি ডান-হাতী, আরেকটি বা-হাতী। আর্কিয়নের স্টেরিওকেমিস্ট্রি তে দেখা গেছে যে, এদের গ্লিসারিন অণুটি প্রোক্যারিয়ট বা ইউক্যারিয়টের ঠিক উল্টো (মিরর ইমেজ)। এ বিষয়গুলো দেখে বোঝা যায়, আর্কিয়ন তার সেল মেমব্রেন তৈরীর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সেট অব এনজাইম্স ব্যাবহার করে। ভিন্ন এনজাইম অর্থ হল ভিন্ন জেনেটিক কোড। ফলে বিজ্ঞানীরা আর্কিয়নকে ব্যাকটেরিয়া বা প্রোটজোয়ার মাঝে না রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ডোমেইনে রাখতে বাধ্য হলেন এবং যথারীতি বিবর্তনবাদীরা 'ব্যাকটেরিয়া থেকে আর্কিব্যাকটেরিয়া ও তার থেকে প্রোটোজোয়া' না বলে তিনটি ডোমেইনের একটি 'কমন এনসেস্টর' খুজতে লেগে গেলেন।

আর্কিয়নের খাবারের বৈচিত্রও অন্যরকম। যারা ফটোট্রফ তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করে সূর্যের আলোর সাহায্যে। যারা লিথোট্রফ তারা খায় অজৈব অণু। আর যারা অর্গেনোট্রফ তার খায় জৈব অণু।

7. গ্র্যান্ড প্রিজমেটিক স্প্রিং: এখানে থার্মোস্ট্যাবল আর্কিয়া পাওয়া যায়

কিছু আর্কিয়নের প্রজাতি বেঁচে থাকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে, তার প্রোটিনের কোন প্রকার ডিজেনারেশন ছাড়াই। আবার কিছু পাওয়া গেছে পোলার রিজিয়নে অত্যন্ত ঠান্ডার মধ্যে ফ্রিজিং হওয়া ছাড়াই। কিছু বাঁচে এক্সট্রিম এসিডিক বা এলক্যালাইন পরিবেশে। কিছু আবার একেবারে কম লবণযুক্ত পানিতে অসমোসিসের শক এবজর্ব করার মত থিক সেল মেমব্রেন নিয়ে বাঁচে।

চিন্তা করুণ, এদের প্রজাতির কত ভ্যারাইটি। এটা দেখে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা এখন আর্কিয়নের ডিফারেন্ট ও ইনডিপেন্ডেন্ট ইভোলিউশনারী হিস্ট্রি রচনা করছেন। এজন্য ওনাদের ট্রিতে এখন তিনটি কান্ড। (চিন্তা করে দেখুন, এককোষী অনুজীবের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইতিহাস)

ইভোলিউশনের ‘বিস্ময়’ মানুষ, যারা কিনা মাত্র ১.৫% শতাংশ জেনেটিক মেকআপে এপদের থেকে পৃথক (!), তারা আবার এই আর্কিয়নদের নিজেদের সুবিধাজনক স্থানে ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন (!) যেমন, মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কে ব্যবহার করা হচ্ছে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এ। আবার *Pyrococcus furiosus* এর মত এক্সটারমোফাইলকে ব্যবহার করা হচ্ছে PCR reaction-এ। কারণ এরা যে ডিএনএ পলিমারেজ তৈরী করে তা থার্মস্ট্যাবল। PCR এ মানুষের ডিএনএ এর ডাবল হেলিক্স এর প্রতিটি হেলিক্স কে পৃথক করার জন্য দ্রবণের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানো হয়। এ তাপমাত্রায় প্রোক্যারিয়ট বা ইউক্যারিয়টের উক্ত এনজাইমটির টারশিয়ারি স্ট্রাকচার হারিয়ে ডি ন্যাচার হয়ে যাবে। অথচ Pyrococcus furiosus এর ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম এ তাপমাত্রায় ডিন্যাচার হয় না।

আসলে বিবর্তববাদীদের লক্ষ্য হল, তাদের মত করে পৃথিবীর ইতিহাসকে সাজানো। (শুধুমাত্র উইকিপিডিয়া পড়লেও এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়) যদিও পৃথিবীর ইতিহাস ও জীব সমূহের গঠন বৈচিত্র এর উল্টোটাই সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

১) http://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
২) http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane
৩) Lippincot’s Illustrated Reviews of Biochemistry, Chapter: Protein structure and function
৪) Davidson’s Principles and Practice of Medicine, Chapter: Molecular and genetic factors in disease
৫) Tafhim Ebook

বিবর্তনের বড় প্রমাণ ‘জিরাফের লম্বা গলা’

8. Male Giraffe

লামার্কের যুক্তি হল, জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে উঁচু গাছের পাতা খুঁজতে গিয়ে। ডারউইনবাদের যুক্তি হল, জেনেটিক মিউটেশনের ফলে যে জিরাফগুলোর গলা লম্বা হয়ে ছিল সেগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে যায়, কারণ উঁচু গাছগুলোর পাতা খেতে লম্বা গলা বিশিষ্ট জিরাফগুলোর সুবিধা হচ্ছিল। এভাবে ক্রমান্বয়ে 'ডারউইনিয়ান সিলেকশন প্রেসার' এর মধ্য দিয়ে জিরাফের গলা লম্বা হয়।

In the early 19th century, Jean-Baptiste Lamarck believed that the giraffe's long neck was an "acquired characteristic", developed as generations of ancestral giraffes strived to reach the leaves of tall trees. This theory was eventually rejected, and scientists now believe that the giraffe's neck arose through Darwinian natural selection—that ancestral giraffes with long necks thereby had a competitive advantage that better enabled them to reproduce and pass on their genes.

অর্থাৎ মিউটেশন যদিও একটি রেনডম প্রক্রিয়া তথাপি 'ডিএনএ' একটি বুদ্ধিমান সত্ত্বার মত বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে পর্যায়ক্রমে শুধু উঁচু গলা বিশিষ্ট জিরাফের দিকে মিউটেশন ঘটাতে হবে। কেননা তা না হয়ে এলোপাতাড়িভাবে প্রতিবার শুধু নিচু গলা বিশিষ্ট জিরাফের জন্ম হলে বা একবার উঁচু গলা এবং একবার নিচু গলা বিশিষ্ট জিরাফের জন্ম হলে, জিরাফ বাঁচবে না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে, ফিমেল জিরাফের ডিম্বানু এবং মেল জিরাফের শুক্রানুতে অবস্থিত ডিএনএ। কেননা তারা তাদের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ে থাকা অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করল যে তাদের ধারক মেল জিরাফটি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এ কারণে তারা পরবর্তী বংশধরের গলা যেন লম্বা হয় এমন ভাবে মিউটেশন ঘটালো।

তবে, এভাবে চলতে থাকলে এক সময় ফিমেল জিরাফগুলো বিলুপ্ত হবে। কেননা সমবয়সের ও গঠনের একটি মেল জিরাফ একটি ফিমেল জিরাফ থেকে সবসময়ই লম্বা হয়, যেমন মেল জিরাফটি যদি ১৯ ফুট লম্বা হয় সেক্ষেত্রে ফিমেল জিরাফটি ১৬ ফুট লম্বা হয়। প্রায় ৩ ফুট ছোট। সুতরাং একটি ২০ ফুট উঁচু গাছ থেকে ফিমেল জিরাফটি কিভাবে পাতা খাবে সেটাই ভাবনার বিষয়? যদিও এতদিনে হিসেবে ফিমেল জিরাফগুলোর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং এদের বিবর্তন নিয়ে নতুন গবেষণা দরকার। যেমন: হতে পারে যে ফিমেল জিরাফটি তার খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলছে। হয়ত ভবিষ্যতে তারা এতদিনের মেল ডমিনেন্ট ওয়ার্ল্ড থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ডিএনএ কিভাবে তাদেরকে মিউটেশনের মাধ্যমে সহযোগিতা করে সেটাই দেখার বিষয়। অন্যদিকে Giraffoidea গোত্রের অন্য Genus, Okapi-র ডিএনএ আবার তাদের মাথা বর্ধনের দিকে চিন্তা নিবিষ্ট করেনি। যদিও, গাছের পাতা খাবার প্রতিযোগিতায় Giraffe-এর সাথে Okapi-এর প্রতিযোগিতা হয়ে থাকলে, Okapi-এর বিলুপ্ত হওয়ার কথা। কেননা- Okapi-এর মাথা তো আর লম্বা হয়নি। আবার, Giraffe-এর সাথে যে প্রাণীগুলোর প্রতিযোগিতার কথা ডারউইন ভেবেছিলেন, সেই Kudu এবং Bovidae গোত্রের Impala, Steenbok-ও তাদের আগের গলা নিয়েই দিব্যি বেঁচে আছে।

11. Okapi

10. Steenbok

9. Impala

এ কারণে জিরাফ এর গলা কেন লম্বা হল তার বিবর্তনীয় সমাধান এখনো হাইপোথিসিস পর্যায়ে রয়েছে, যেমন হাইপোথিসিস পর্যায়ে আছে Palaeomerycidae থেকে বিবর্তিত হয়ে Giraffoidea এবং Antilocapridae হওয়ার হাইপোথিসিস। তবে, বিবর্তনবাদীদের কাছে এই হাইপোথিসিসগুলোই বড় প্রমাণ। যেটার উদাহরণ তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝা যায়-

12. Kudu

There are two main hypotheses regarding the evolutionary origin and maintenance of elongation in giraffe necks. The "competing browsers hypothesis" was originally suggested by Charles Darwin and only challenged recently.

The other main theory, the sexual selection hypothesis, proposes that the long necks evolved as a secondary sexual characteristic, giving males an advantage in "necking" contests to establish dominance and obtain access to sexually receptive females……However, one objection is that it fails to explain why female giraffes also have long necks.

তদুপরি, এই হাইপোথিসিসগুলো সম্ভবত নিচের প্রশ্নগুলোরও ব্যাখ্যা প্রদান করছে-

1. জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে তার মাথায় রক্ত পৌছানোর জন্য ক্যারোটিড আর্টারিও লম্বা হল।
2. জিরাফের গলা লম্বা হওয়াকালীন কিভাবে হার্টও এত উঁচুতে রক্ত সঞ্চালনের জন্য বিবর্তিত হয়ে ম্যাসিভ (11 kg, 2 feet long) হয়ে গেল।
3. জিরাফের গলা যখন লম্বা হল তখন এর মাথা থেকে রক্ত হার্টে নিয়ে আসার রক্তনালী 'জুগুলার ভেইন' এর ভিতর ভাল্ভ তৈরী হল, যেন পানি পান করতে মাথা নিচু করার সময় Huge Volume এর রক্তের প্রেসার মাথায় রক্তক্ষরণ না করতে পারে।
4. কিভাবে জিরাফের বিশাল দেহে উৎপন্ন অতিরিক্ত তাপ অপসারিত হওয়ার জন্য ঠিক স্কিনের কালো স্পটগুলোর নিচে 'Complex Blood Vessel এবং Large Sweet Glands' তৈরী হল।

5. কিভাবে উঁচুতে পৌছে যাওয়া জিরাফের ব্রেইনের সাথে দেহের অন্যান্য অঙ্গের সংযোগ রক্ষার জন্য এর নার্ভ ফাইবারগুলোও বিবর্তিত হয়ে লম্বা হয়ে গেল।
6. বিশালাকৃতির জিরাফের ওজন ধারণের জন্য কিভাবে তার পায়ের হুফ বিবর্তিত হল।
7. এবং এতগুলো পরিবর্তন আনার জন্য জিরাফের শুক্রানু ও ডিম্বানুর 'ডিএনএ'-তে যে বিশাল পরিমাণ কোডিং এর পরিবর্তন হওয়ার দরকার কিভাবে সেটা 'Random Mutation' এর মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হল ইত্যাদি।

নতুন নতুন ফ্লু ভাইরাসের আগমন কি বিবর্তনের উদাহরণ?

বার্ডফ্লু, সোয়াইন ফ্লু ও মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক ভাইরাস দিয়ে। যাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আরএনএ-র গঠন এবং জেনেটিক ড্রিফট সম্পর্কে ধারণা নেই তারাই কেবল নতুন নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা স্ট্রেইন তৈরী হওয়াকে ডারউইনীয় বিবর্তন বলবে। তবে হ্যাঁ, বিবর্তন বলতে যদি শুধুমাত্র একই প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন বুঝায় তথা একটি প্রজাতির মধ্যে ভ্যারাইটি তৈরী হওয়া বুঝায় তাহলে এটাকে বিবর্তন বলা যায়। তবে এই বিবর্তন কখনোই ডারউইনীয় এককোষ থেকে মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। অন্য কথায় মাইক্রোইভোলিউশন ম্যাক্রোইভোলিউশনকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জেনেটিক এলিমেন্ট হিসেবে আরএনএ থাকে (লক্ষ্যণীয়, ভাইরাসে জেনেটিক এলিমেন্ট হিসেবে ডিএনএ-র পরিবর্তে আরএনএ থাকতে পারে); মজার বিষয় হল এই ভাইরাসে আরএনএ একটি অবিচ্ছিন্ন চেইন হিসেবে থাকে না, বরং ৮টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। এই ভাইরাসের আক্রমণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে হিমাগ্লুটিনিন ও নিউরামিনিডেজ নামক দুটি প্রোটিনের উপর। যে এন্টিভাইরাল ঔষধগুলো তৈরী করা হয় তা মূলত কাজ করে এদের উপর।[14] কোন কারণে যদি এই প্রোটিনদ্বয়ের এমাইনো এসিডের সিকোয়েন্সে সামান্য পরিবর্তন আসে তবে উক্ত ঔষধ আর কাজ করতে পারে না। আমরা বলেছি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ৮টি আরএনএ খণ্ড নিয়ে গঠিত। এই আরএনএ খণ্ডগুলোই হিমাগ্লুটিনিন ও নিউরামিনিডেজ প্রোটিনের জেনেটিক তথ্য ধারণ করে। বংশবৃদ্ধিকালীন আরএনএ রেপ্লিকেশনের সময় মিউটেশন (জেনেটিক এরর) হয়। মিউটেশন হওয়ার সময় যদি এ্যামাইনো এসিড সিকোয়েন্সে এমন ক্ষুদ্র পরিবর্তন আসে যে তা হিমাগ্লুটিনিন ও নিউরামিনিডেজ-এর মূল গঠনকে ব্যহত না করে শুধুমাত্র যেই অংশটুকু ভাইরাসের আক্রমণের কাজে লাগে (এপিটোপ) তাতে সামান্য পরিবর্তন আনে তাহলে ভাইরাসটি আক্রমণ ক্ষমতা (ভিরুলেন্স) অক্ষুণ্ণ রেখে ঔষধের বিপরীতে রেজিস্টেন্স হয়ে যাবে। কারণ এই ভাইরাসের বিপরীতে যে ঔষধগুলো কাজ করে, সেগুলো ভাইরাসের উক্ত প্রোটিনদ্বয়ের নির্দিষ্ট অংশের সাথে ত্রিমাত্রিক গঠনে সম্পূরক ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে। তবে এ প্রক্রিয়ায় কোন অবস্থাতেই ভাইরাসটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকে অন্য ভাইরাসে পরিণত হবে না। কারণ যে মিউটেশনগুলো উক্ত প্রোটিনদ্বয়ে বা

[14] Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 536

ভাইরাসের অন্যান্য গঠনে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন এনে ফেলে সেগুলোতে প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসগুলো মারা যায় (এটাকে বলে জেনেটিক এররের লিমিট ক্রস করে যাওয়া); Jewetz, Melnick ও Adelberg, তাদের Medical Microbiology বইতে হিমাগ্লুটিনিন (HA) এর গঠন সম্পর্কে এভাবে বলছেন: The HA molecule is folded into a complex structure. Each linked HA 1 and HA 2 dimer forms an elongated stalk capped by a large globule. The base of the staclk anchors it is the membrane. Five antigenic sites on the HA molecule exhibit extensive mutations. These sites occur at regions exposed on the surface of the structure, **are apparently not essential to the moleule's stability**, and are involved in viral neutralization. **Other regions of the HA molecule are conserved in all isolates, presumably because they are necessary for the molecules to retain its structure and function.**[15]

অর্থাৎ একটি ভাইরাসকে অন্য ভাইরাসে পরিণত করতে হলে শুধু একটি বা দুটি প্রোটিন নয়, পুরো স্ট্রাকচারের পরিবর্তন আনতে হবে। আসলে এ্যামাইনো এসিড পরিবর্তনের এই ঘটনাকে বলে মাইক্রোইভোলিউশন, কিন্তু এ ঘটনা কোন অবস্থাতেই

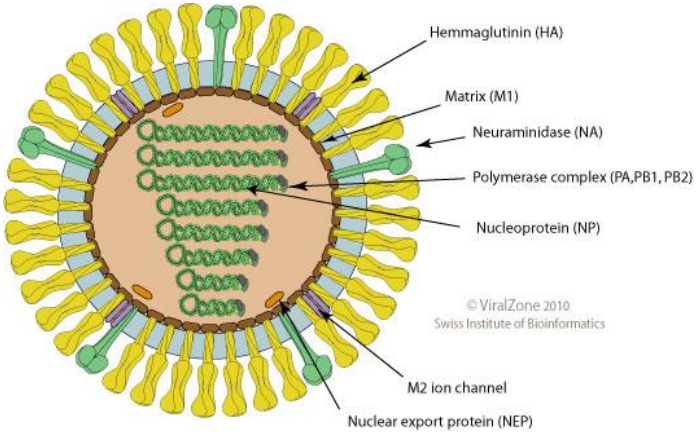

13. ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভিরিয়ন

[15] 2. Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 540 [Emphasis Added]

ম্যাক্রোইভোলিউশনের (অর্থাৎ মেজর ফাংশনাল চেঞ্জ) দাবীকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এজন্য অসংখ্য নতুন তথ্য জিনোমে যোগ হতে হবে।

আমরা মাঝে মাঝে খবর পাই যে, চীনে সোয়াইন ফ্লু আক্রমণ করেছে, কিংবা বাংলাদেশের অমুক জায়গায় বার্ড ফ্লু আক্রমণ করেছে। যারা সচেতন তারা খেয়াল করে থাকবেন- এই সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নতুন 'স্ট্রেইন' পাওয়া যায়, যেটার বিরুদ্ধে আগের ঔষধ কাজ করে না। এই নতুন স্ট্রেইন পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে জেনেটিক ড্রিফট হয়েছে। আসলে কী হয় জেনেটিক ড্রিফট-এ? আমরা জেনেছিলাম এই ভাইরাসের আরএনএ (তথা জিনোমিক এলেমেন্ট) খণ্ডিত। মোট ৮টি খণ্ড নিয়ে জেনেটিক এলেমেন্ট গঠিত। লক্ষ্য করে দেখবেন ইনফ্লুয়েঞ্জা যেমন- পাখিকে আক্রমণ করে আবার শুকরকেও আক্রান্ত করে। পাখিকে আক্রমণকারী ভাইরাসের 'স্ট্রেইন' এবং শুকরকে আক্রমণকারী ভাইরাসের 'স্ট্রেইন' ভিন্ন। এদের হিমাগ্লুটিনিন (H) এবং নিউরামিনিডেজ (N) প্রোটিনের ধরণের উপর ভিত্তি করে এদের বিভিন্ন নাম দেয়া হয়। যেমন ধরুন H1N1, H2N3 ইত্যাদি। মনে করুন, কোন ভাবে দুটো ভাইরাসই একটি হাঁসকে আক্রমণ করল। সুতরাং একটি ভাইরাসের ৮ খণ্ড আরএনএ যেমন হাঁসটিতে আছে তেমনি আরেকটি ভাইরাসের ৮ খণ্ড আরএনএ-ও আছে।[16] তবে এদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে। এখন উক্ত হাঁসে ভাইরাসটি যখন বংশবৃদ্ধি করছে তখন প্রথমটার ৪টি খণ্ড ও পরেরটার ৪টি খণ্ড নিয়ে গঠিত হলো এবং প্রথমটার H1 এবং দ্বিতীয়টার N3 নিয়ে নতুন একটি স্ট্রেইন H1N3 তৈরী হল। এই স্ট্রেইনটির বিরুদ্ধে যেহেতু কোন ঔষধ নেই, এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক তৈরী করতে পারে। এ ঘটনাটাই আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই এবং এটাই হল জেনেটিক ড্রিফট।[17] লক্ষ্য করুন, এই পদ্ধতিতে ভাইরাসটি নতুন কোন ভাইরাসে পরিণত হলো না। কেননা H ও N কে তাদের পূর্ণাঙ্গ জেনেটিক তথ্য দিয়ে তৈরী করে না দেয়া পর্যন্ত জেনেটিক ড্রিফট ঘটার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যারা এই উদাহরণ দিয়ে একটি কোষ থেকে ধাপে ধাপে মানুষ আসার গালগল্প শুনায় তাদের 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে আমাদের ধারণা পেতে কোন কষ্ট হয় না। আপনারা কী বলেন?

[16] http://www.virology.ws/2013/04/16/avian-influenza-h7n9-viruses-isolated-from-humans-what-do-the-gene-sequences-mean/

[17] http://www.virology.ws/2009/05/12/viral-quasispecies-and-bottlenecks/

মস্তিষ্কের আকার ও বিবর্তন

মানবজাতির ইতিহাসে মিথ্যাচার, প্রতারণা ও তথ্যগোপনের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে বর্তমান সময়ের চেয়ে বেশী সমগ্র ইতিহাসকে একত্রিত করলেও পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র বিজ্ঞানেই বিবর্তনবাদের ভূত যে পরিমাণ মিথ্যাচার, প্রতারণা ও তথ্যগোপন করেছে এবং করে চলেছে তা-ই বর্ণনাতীত।

বিবর্তনবাদীরা এপ থেকে মানুষ আসার দাবী করতে গিয়ে তাদের ব্রেইনের আকারের পার্থক্যকে হাইলাইট করে। বিষয়টি যেহেতু সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য নয় সেহেতু ব্রেইনের আকারের পার্থক্য দিয়ে ধোঁকা দেয়াটা সহজ।

কারণ, ব্রেইনের পার্থক্যটা হয় মূলত অর্গ্যানাইজেশনে, আকারে নয়।[18] হ্যাঁ, আকার বড় হয় ততটুকু, যতটুকু অর্গ্যানাইজেশন পরিবর্তন করতে গিয়ে। কিন্ত আকার ছোট রেখেও অর্গ্যানাইজেশন এক রাখলে বিচারবুদ্ধিও একই থাকে। মানুষের ব্রেইনের আকার সর্বনিম্ন ৮০০ সিসি থেকে ২২০০ সিসি পর্যন্ত হতে পারে।[19] তার মানে এই না যে ৮০০ সিসি আকারের মাথার বুদ্ধি কম।

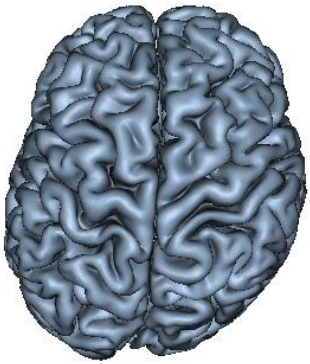

মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির ব্রেইনের মূল পার্থক্য ফ্রন্টালকর্টেক্স নামক ব্রেইনের অগ্রভাগের অংশে স্পষ্ট। কিন্তু শুধু ফ্রন্টালকর্টেক্সের আকার যদি বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলেই কি এপ জাতীয় প্রাণী

[18] *Primate Brain Organization, Not Size, Key To Human Intelligence, Study Says.* http://www.huffingtonpost.com/2013/03/29/primate-brain-organization-human_n_2971873.html

[19] Casey Luskin, Human origins and the Fossil Record, *Science and Human Origin,* Discovery Institute Press, Seattle, WA, p-71.

মানুষে পরিণত হবে? না। যারা এই ধরণের দাবী করেন তারা ' তথ্যগোপন' করেন বা এড়িয়ে যান।

ফ্রন্টাল কর্টেক্স বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলে তারা ফ্রন্টাল কর্টেক্সের সাথে ব্রেইনের অন্যান্য অংশের সুসংগঠিত যোগাযোগগুলোর কথা বলেন না। ফ্রন্টাল কর্টেক্স মানুষের ব্রেইনের কমপ্লেক্স ফাংশন করতে গিয়ে, প্রাইমারী ও সাপ্লিমেন্টারী মোটর এরিয়া ও সেনসরি এরিয়া, ভিজুয়েল কর্টেক্স, অডিটরি কর্টেক্স, ভারনিক্স এরিয়া, লিম্বিক সিস্টেম, কর্পাস স্ট্রায়েটাম, ডায়েনসেফালন এবং পেছনের ব্রেইনের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং ব্রেইনের এই জটিল গঠন তৈরী করতে যে জটিল রিঅর্গ্যানাইজেশন প্রয়োজন, অনিয়ন্ত্রিত (unguided) বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গেলে এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে।

আর বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুসারে আনগাইডেড বিবর্তন হয় ' র‍্যাণ্ডম মিউটেশন' এর ফলে যদি কোন ' নতুন ফাংশনাল ভ্যারিয়েশন' তৈরী হয় তার ' প্রাকৃতিক নির্বাচন' এর মধ্য দিয়ে। সমস্যা হলো, প্রাণীদেহের অধিকাংশ ফাংশনই ' জিন' -এর সাথে ' ওয়ান টু ওয়ান' সম্পর্কযুক্ত না। অর্থাৎ একটি জিন একটি ফাংশন নিয়ন্ত্রণ করছে (মনোজেনিক) এ রকম নয়। বরং অনেকগুলো জিন একত্রে একটি বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় (পলিজেনিক)। সুতরাং উপরোক্ত দাবী ব্যাখ্যা করতে গেলে অসংখ্য Simultaneous এবং Exact মিউটেশন একসঙ্গে হতে হবে। তদুপরি এমব্রায়ো থেকে ডেভেলপমেন্টের সময় জেনেটিক সুইচ (ডিএনএ মিথাইলেশন প্যাটার্ন)-ও বিভিন্ন হওয়ায় ব্যাখ্যা করতে হবে এপিজেনেটিক রিঅর্গ্যানাইজেশন।[20]

অথচ এরিক ডেভিডসনের ডেভেলপমেন্টাল জিন রেগুলেটরী নেটওয়ার্কে (dGRN) মিউটেশন নিয়ে পরীক্ষা থেকে আমরা জানি এগুলো হাইলি কনজার্ভড, অর্থাৎ সামান্য মিউটেশন মারাত্মক জেনেটিক ডিফেক্ট তৈরী করে।[21] অন্যদিকে মাইকেল বিহের স্টাডি থেকে আমরা জানি, একই সাথে চারটির বেশী মিউটেশন প্রয়োজন হলে এবং তা র‍্যাণ্ডমলি হতে হলে পৃথিবীর বয়স সীমা পার হয়ে যায়।[22] আবার ডগলাস এক্স ও এন গজার দেখিয়েছেন একটি ফাংশনাল

[20] Brian Thomas, *Stark Differences Between Human and Chimp Brains.* http://www.icr.org/article/7067/372/

[21] Stephen C. Meyer, *Darwin's Doubt,* HarperCollins publishers, Seattle, WA, 2013, p-265.

[22] Michael Behe, *Edge of Evolution*, FreePress, NY, 2008, p-142.

এনজাইমকে আরেকটি ফাংশনাল এনজাইমে পরিণত করতে ৫টি বা তার অধিক সাইমালটেনিয়াস ও স্পেসিফিক মিউটেশন লাগবে।[23] কিন্তু কোষের নতুন কোন কাজ একটি এনজাইমের উপরতো নির্ভর করে না। অনেকগুলো এনজাইমের সামগ্রিক সহযোগিতায় একটি নতুন ফাংশন তৈরী হয়। এরূপ অনেকগুলো নতুন ফাংশনযুক্ত কোষের সমন্বয়ে তৈরী হয় নতুন ফাংশন বা বৈশিষ্ট্য-যুক্ত টিস্যু। আর এ ধরণের টিস্যুগুলোর পারস্পরিক সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত যোগাযোগের মাধ্যমেই শুধু হবে রিঅর্গ্যানাইজেনশ।

সুতরাং, পাঠক বুঝে নিন, বিবর্তনবাদীদের দাবী কোন পর্যায়ের ‘ বিজ্ঞান’ !

[23] Gauger, A., Axe, D.. The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin Pathway. BIO-Complexity, North America, 2011, apr. 2011. Available at: http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2011.1.

‘অ্যাপেন্ডিক্স’ অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়

সেক্যুলার স্কুলগুলোতে এবং ডাক্তারি বইগুলোতে এখনও পড়ানো হয় যে, মানুষের দেহে কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ রয়েছে, যেগুলো বানর থেকে মানুষ বিবর্তন হওয়ার সময় মানুষের দেহে রয়ে গেছে। দেখানো হয় যে, অ্যাপেন্ডিক্স, এডেনয়েড, টনসিল—এগুলো সব অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। যদি সত্যি সৃষ্টিকর্তা থাকতেন, তাহলে এই অপ্রয়োজনীয় অঙ্গগুলো থাকত না। মানুষের বিবর্তন প্রকৃতির এক ত্রুটিপূর্ণ খেলা দেখেই এ ধরনের বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ এখনও দেখা যায়।

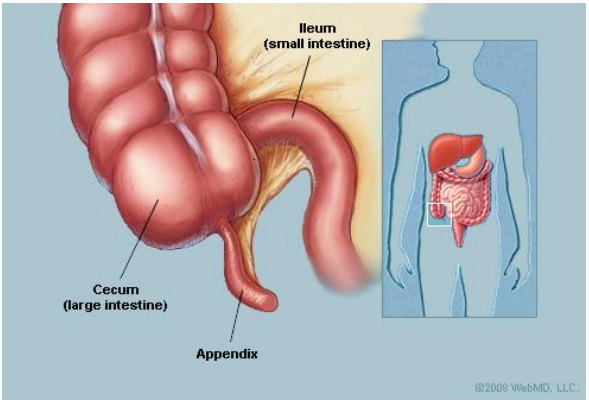

তবে ২০১০ সালে চারজন বিবর্তনবাদীই এটা প্রমাণ করেছেন যে, এডেনয়িড এবং টনসিল হচ্ছে লিম্ফয়েড টিস্যুর ভাণ্ডার, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়। বিখ্যাত Grolier Encyclopedia-তে বলা হয়েছে যে, অ্যাপেন্ডিক্সকে এতদিন মনে করা হতো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ, কিন্তু এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য অন্যতম অঙ্গ।

সাইন্স ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা দল প্রমাণ করেছেন: কমপক্ষে ৩২ বার অ্যাপেন্ডিক্স-এর বিবর্তন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে, যেই প্রাণীগুলো একে অন্য থেকে বিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ অ্যাপেন্ডিক্স অঙ্গটি প্রকৃতির কোনো ভুল নয়, এটি একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত অঙ্গ, যা বিশেষ কিছু প্রাণীকেই দেওয়া হয়েছে।

তারা প্রস্তাব করেছেন যে, এই অঙ্গটি মানুষের পরিপাকতন্ত্রে হজমে সুবিধা হবার জন্য প্রয়োজনীয় ভালো ব্যাকটেরিয়াকে সংরক্ষণ করে। যদি কারও বড় ধরনের ডাইরিয়া, কলেরা

হয়ে পরিপাকতন্ত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া হারিয়ে যায়, তখন অ্যাপেন্ডিক্স আবার সেই ভালো ব্যাকটেরিয়া পরিপাকতন্ত্রে সরবরাহ করে।

নর্থ ক্যারোলাইনার ডিউক ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা জানান, বৃহদান্ত্রের অ্যাপেন্ডিক্স নামক যে অংশটিকে এতোদিন অপ্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিজনক বলে মনে করা হতো, তা আসলেই মানুষের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটেও অপ্রয়োজনীয় নয়। এখানে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা ব্যাকটেরিয়াগুলো হজমে সাহায্য করে এবং কলেরা ও ডায়রিয়ার মতো মারাত্মক রোগ সংক্রমণের পর পরিপাকতন্ত্রকে আবারো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিল পার্কার জানান, অস্ট্রেলিয়ার রয়াল মেলবর্ন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির মেডিকেল সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নিকোলাস ভার্ডাক্সিস জানান, এটি সত্যি এক চমৎকার আবিষ্কার, যেখানে এতো ছোট্ট একটি ব্যাকটিরিয়া এতো চমৎকার একটি জায়গায় থাকতে পারে, এ আবিষ্কারের আগে তা জানাই ছিল না।

সময়ের পরিক্রমায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছে যে, মানুষের দেহের ডিজাইনে কোনো ভুল নেই, কোনো অপরিকল্পিত ঘটনা নেই। প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে কোনো না কোনো জরুরি কাজের জন্য।

বিবর্তনবাদীদের অপপ্রচারে মুসলিমরা বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে—সত্যিই বোধহয় মানুষের দেহে কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ রয়েছে। তারা বুঝতে পারছে না এভাবে তারা আল্লাহর সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা তৈরি করছে যে, তিনি মানুষকে কিছু অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ দিয়ে তৈরি করেছেন। আল্লাহ কখনই প্রয়োজন ছাড়া কিছু করেন না, তাঁর প্রতিটা কাজ অত্যন্ত নিখুঁত।

বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ ও নাস্তিকতা

আস্তিকতার মতো নাস্তিকতাও হচ্ছে মূলত একটি ধর্ম-বিশ্বাস। ব্যক্তিগত জীবনে অমায়িক ধার্মিক লোকের সাথে যেমন সাক্ষাত হয়েছে, তেমনিভাবে ভাল মনের ও রুচিশীল নাস্তিকদের সাথেও পরিচয় রয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আমরা কম-বেশী পরিচিত। কিন্তু নাস্তিক মৌলবাদীদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। এই মৌলবাদী নাস্তিক গোষ্ঠী বা ধর্ম-বিদ্বেষী (মূলত ইসলাম) মুক্তমনারা 'বিজ্ঞান' ও 'যুক্তিবাদ' নিয়ে বেশ মাতামাতি করে।

তাদের এতো বিজ্ঞান-প্রীতির কারণে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে, বেশীরভাগ বিজ্ঞানীরা হয়তোবা তাদের ঘরানার নাস্তিক। এই দাবীর ভিত্তি হচ্ছে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে তারা সবাই নাস্তিক – কখনো তারা আস্তিক হতে পারে না। সম্প্রতি নাস্তিক মৌলবাদীদের গুরু অক্সফোর্ডের বায়োলজির প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স প্রি-স্কুলের পাঁচ বছরের শিশুদেরকেও যাতে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব শিখানো হয় এবং তা ক্যারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেছেন![24]

ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব বর্তমান বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের অন্যতম বিষয়। তাই ধর্ম-বিদ্বেষী (মূলত ইসলাম) মুক্তমনাদের মতে যারা এ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করবে বা বিশ্বাস করবে তারা সবাই এমনি এমনি নাস্তিক হয়ে যাবে! তাদের সংকীর্ণ ভাবধারার একটি নমুনা:

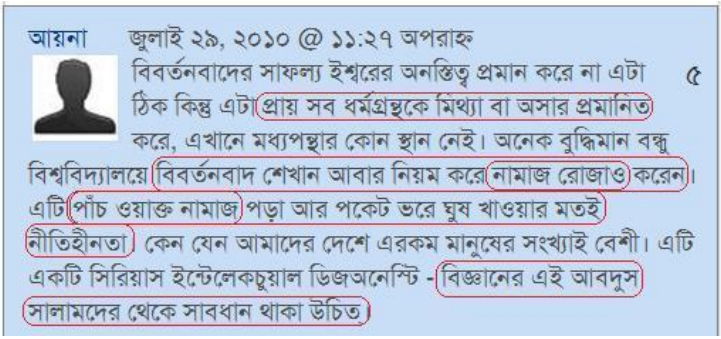
আয়না জুলাই ২৯, ২০১০ @ ১১:২৭ অপরাহ্ন

বিবর্তনবাদের সাফল্য ইশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমান করে না এটা ঠিক কিন্তু এটা প্রায় সব ধর্মগ্রন্থকে মিথ্যা বা অসার প্রমানিত করে, এখানে মধ্যপন্থার কোন স্থান নেই। অনেক বুদ্ধিমান বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবর্তনবাদ শেখান আবার নিয়ম করে নামাজ রোজাও করেন। এটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া আর পকেট ভরে ঘুষ খাওয়ার মতই নীতিহীনতা। কেন যেন আমাদের দেশে এরকম মানুষের সংখ্যাই বেশী। এটি একটি সিরিয়াস ইন্টেলেকচুয়াল ডিজঅনেস্টি - বিজ্ঞানের এই আবদুস সালামদের থেকে সাবধান থাকা উচিত।

[24] http://www.guardian.co.uk/science/2011/sep/01/richard-dawkins-evolution-children-five

বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীতে সমস্ত জীবজগতের আবির্ভাব হয়েছে একটি সরল এককোষী জীব থেকে – যা "সাধারণ পূর্বপুরুষ" নামে পরিচিত। আর এই এককোষী ব্যাক্টেরিয়ার মতো জীবের আবির্ভাব নাকি হয়েছিল কেমিক্যাল বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের (যেখানে যারা যোগ্য তারা পরিবেশে উদ্দেশ্যহীনভাবে টিকে থাকে; অন্যদিকে দুর্বল বা অনুপোযুক্তদের বিলুপ্তি হয়) মাধ্যমে কালের প্রক্রিয়ায় (মিলিয়ন বছর টাইম স্কেলে) উদ্দেশ্যহীন ও দৈবক্রমে অজৈব পদার্থ থেকে জীবের মৌলিক উপাদান- ডিএনএ ও প্রোটিন তৈরী হয়। তারপর এগুলো মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে ট্রায়াল-এন্ড-এরর (Trial and error) প্রক্রিয়ায় কোনক্রমে হঠাৎ করে জোড়া-তালি লেগে হয়ে যায় এককোষী ব্যাক্টেরিয়ার মতো জীব বা আমাদের আদি-পিতা! সেই এককোষী জীব থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্দেশ্যহীনভাবে ও দৈবক্রমে অপরিকল্পিত মিউটেশনের (জীনগত পরিবর্তন) মাধ্যমে ধাপে ধাপে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি। ডারউইনের সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজকের মতো ছিল না। সে সময় জীবকোষকে অত্যন্ত সরল মনে করা হতো – ডিএনএ আবিষ্কার তো দূরের কথা। তাই বিজ্ঞানী হিসেবে তার তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে ডারউইন বলে গেছেন, তার তত্ত্ব প্রমাণের জন্য জীব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা ট্র্যানজিশনাল স্পিসিজ দেখাতে হবে। প্রায় ১৬০ বছর ধরে এই স্বপ্নের ট্র্যানজিশনাল স্পিসিজের ফসিল সন্ধানে পৃথিবীর যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কল্পিত "ট্র্যানজিশনাল স্পিসিজ" বা "মিসিং লিঙ্ক" এর টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। যুক্তিবাদের খ্যাতিরে বলা যায় এদের সংখ্যা পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রজাতির সংখ্যা থেকে অনেক অনেক গুন বেশী থাকার কথা। আর তাই বর্তমানে বিবর্তনবাদীরা ফসিল আলোচনা থেকে বিরত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর ব্যাখ্যা হিসেবে দেখায় নিও-ডারউইনিজমকে – বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জেনেটিক সিকোয়েন্সের মিলের সামঞ্জস্যতাকে (genetic relatedness or homology)।

মিসিং লিঙ্ক বা ট্রাঞ্জিজিশনাল স্পিসিস নিয়ে বিবর্তনবাদীরা বেশ বেকাদায় থাকেন। 'Ida' নামক ফসিল আবিষ্কারের (২০০৯) পর সমস্ত পৃথিবীর মিডিয়া জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইডা আবিষ্কারের পরে এটাকে "Eight Wonder of the World" বা "Our Mona Lisa" বলে ঘোষণা করা হয়। বিবর্তনবাদ মিডিয়াতে জনপ্রিয় করতে Sir David Attenborough এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইডা আবিষ্কারের পর তিনি অত্যন্ত আবেগ তাড়িত হয়ে বলেন যে, এখন থেকে আর কেউ বলতে পারবে না যে মিসিং লিঙ্ক নেই! আর কেউ যদি প্রমাণ চায় তবে ইডা' কে

যেন হাজির করা হয়। এবং সাথে সাথে মিডিয়াতে বলা হলো যে ইডা ফসিল সব ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণিত করল (ভিডিও দেখুন)! পরে দেখা গেল ঐটি কোন মিসিং লিঙ্ক নয়, বরং ল্যামুর নামক জন্তু[25]। তাহলে এখন ধর্মের কী হবে?

বিজ্ঞান হচ্ছে সদা পরিবর্তনশীল একটি বিষয় – প্রবাহমান নদীর মতো – বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষালব্ধ উপাত্ত দিয়ে সঠিক বা সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এটাই বিজ্ঞানের আসল সৌন্দর্য। এটা কোন ভাবধারার অন্তর্গত সম্প্রদায়ের (নাস্তিক) সম্পত্তি নয়। বিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিম, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, চাইনিজ, আস্তিক, নাস্তিক এবং সমস্ত মানব সভ্যাতার অবদান আছে। যেখানে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের-ই সদা বিবর্তন হচ্ছে, সেখানে এই পরিবর্তনশীল মতবাদকে ভিত্তি ধরে বিবর্তন-মৌলবাদী (নাস্তিকেরা) বিজ্ঞানের খোলসে অপরিবর্তনশীল ধর্মকে ভুল প্রমাণে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর এটা করা হয় জনপ্রিয় পাবলিক মিডিয়ার কল্যাণে। বিজ্ঞান ও ধর্মের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাই দুটোকে কখনো একই মাপ-কাঠিতে বিবেচনা করা যায় না – যা কিনা হবে মানুষ ও গাছ-পালাকে একই মানদণ্ডে তুলনা করার সামিল।

অতি সাধারণ অর্থে 'বিবর্তন' বলতে বুঝায় সময়ের সাথে সাথে কোন কিছুর পরিবর্তন। এ অর্থে এন্টিবায়োটিক সহনশীলতা (Antibiotic resistance) অথবা ভাইরাসের (যেমন ফ্লু বা এইচআইভি) মিউটেশনকে বিবর্তন (evolution) বলা যায়। **কিন্তু এ-ধরণের বিবর্তন দিয়ে ডারউইনিয়ান বিবর্তনবাদকে ফ্যাক্ট বা ধ্রুব-সত্য হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা এ-ধরণের উদাহরণ দিয়েই জনসাধারণকে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধরণা দিয়ে থাকে!** মজার বিষয় হচ্ছে ডারউইনিয়ান বিবর্তনবাদকে 'সূর্য উঠা বা অস্ত যাওয়ার মতো সত্য' প্রমাণে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে। বিবর্তনবাদকে স্রেফ বিজ্ঞান হিসেবে ধরলে সেখানে প্রশ্ন করার অবকাশ আছে। প্রসঙ্গত, "জড় পদার্থ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি" – এ বিশ্বাস প্রায় ২০০০ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানী-মহলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ডারউইনের "প্রজাতির উৎপত্তি" প্রকাশের পাঁচ বছর পরে বিজ্ঞানী লুই পাস্তর একটি অতি সাধারণ পরীক্ষার (যা বকনল পরীক্ষা নামে পরিচিত) মাধ্যমে হাজার বছরের বিশ্বাসকে চূর্ণ করে দেন। কিন্তু বিবর্তনবাদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করলে বিবর্তন মৌলবাদীরা

[25] http://www.guardian.co.uk/science/2009/oct/21/fossil-ida-nature-magazine-revelation

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। রাগ প্রশমনে সাধারণত তারা প্রশ্নকারীর অজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলার অপচেষ্টা করেন। তাদের কিছু কমন শব্দগুচ্ছ হচ্ছে-

You are such an ignorant, You don't know anything about biology, Are all those thousands of famous scientists wrong?

বিবর্তনবাদ যদি বিজ্ঞান-ই হয়ে থাকে তবে তো এত আবেগ-প্রবণ হওয়ার কারণ নেই। তার মানে বিবর্তনবাদ কি নাস্তিকতা নামক ধর্মের ভিত্তি? বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে বস্তুবাদী (নাস্তিক)/বিবর্তনবাদী ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের মূলে রয়েছে মধ্যযুগীয় চার্চ-বাস্তুবাদী আইডিওলজিক্যাল সংঘর্ষ। চার্চের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অগ্রযাত্রা ব্যহত হচ্ছিল। গ্যালিলিওকে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল। নাস্তিকেরা বিজ্ঞানের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্যালিলিওর ইস্যুটিকে ব্যবহার করছে নাস্তিকতার ভাবধারা প্রচারে। চার্চ যখন-ই নড়াচড়া শুরু করে, বস্তুবাদীরা গ্যালিলিও – সমতল পৃথিবী – ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব – ছয় হাজার বছরের পৃথিবী – ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে দাবিয়ে রাখে। যার ফলে সমাজে চার্চের প্রভাব শূন্যের কোঠায়। এজন্য চার্চ বা ক্রিস্টিয়ান ধর্ম তাদের কাছে গৌণ। বস্তুত, ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলাম তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে।

মজার তথ্য- যে গ্যালিলিওকে নিয়ে নাস্তিকেরা এত ব্যবসা করছে, সেই গ্যালিলিও কিনা গডে বিশ্বাসী রোমান ক্যাথলিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন! বিবাহ বহির্ভূতভাবে জন্ম নেওয়া তার দুই কন্যাকে বিয়ে দিতে পারবেন না বিধায় তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন। পরবর্তীতে মেয়েরা চার্চের পাদ্রী হয়েছিলেন।[26]

বিবর্তনবাদী/মুক্তমনাদের বর্তমানে অন্যতম টার্গেট হচ্ছে ইসলাম। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে গ্যালিলিও বা খ্রীষ্টান ধর্মের ইস্যুকে এখন তারা মুসলিমদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। আবার অন্যদিকে সাধারণ মুসলিমদের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে বিবর্তন-নামীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের আবরণে ব্যবসা করার খ্যাতিরে কয়েকজন মুসলিম নামধারী আরব বিজ্ঞানীকে

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

বিবর্তনবাদের কর্ণধারও বানিয়ে দেয়; কেননা তারা নাকি ডারউইনের অনেক আগে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন!

ইদানিং রাখ-ঢাক না রেখেই নাস্তিক মৌলবাদীরা তাদের বিবর্তনবাদ নামক ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন। আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন অক্সফোর্ডের বায়োলজির প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স। সম্প্রতি তিনি নাস্তিকতার বাস ক্যাম্পেইন শুরু করেছেন – যার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব।

বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে বিবর্তনবাদ নিয়ে প্রশ্ন করে এমন অনেক বড় মাপের বিজ্ঞানী রয়েছেন।[27] বিবর্তন-মৌলবাদীরা এজন্য তাদেরকে চার্চের মিশনারিজ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশেষ বিনোদন লাভ করেন! এটা একটি অতিপ্রাচীন ও সহজ অস্ত্র। বিবর্তনবাদ-মৌলবাদীদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বিবর্তনবাদে অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদীরা হচ্ছে গডে বিশ্বাসী আস্তিক! বিজ্ঞানকে তারা নিজেরদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করেন। এজন্য এরা অনেক সময় এতই আবেগী হয় যে বিবর্তনবাদে প্রশ্নকারী বিজ্ঞানীদেরকে ক্রিমিনাল হিসেবেও গণ্য করে!

কিন্তু তারা ভুলে যান যে, বর্তমান সময়ের বিবর্তিত-বিবর্তনবাদ তত্ত্বের (নিও-ডারউইনিজম) ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ক্যারোলাস লিনিয়াসের (Carolus Linnaeus) জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাসের উপর। এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে জীবের বাহ্যিক মিলের ভিত্তিতে। আর **তিনি এই যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কাজ করেছিলেন গডের মহিমা তুলে ধরার জন্য!**[28]

[27] http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660
[28] http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html

সারকথা হচ্ছে- বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিশ্বাস দুটো ভিন্ন বিষয় যার প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। কিন্তু নাস্তিকেরা তাদের ভাবধারা সমাজে আরোপ করতে বিজ্ঞানের মুখোশ ব্যবহার করছেন।

সমাজতান্ত্রিক নাস্তিকতা এবং ইউজেনিক্স : এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

এডলফ হিটলার এবং কার্ল মার্ক্স -এর তত্ত্বে কিছু জায়গায় বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। জানিনা ব্যপারটা কাকতালীয় কিনা। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর অর্থ আর ভাবার্থ ভীতিকর ভাবে একরকম।[29] নিচে কথাগুলোর খসড়া আর তার নিচে অনুবাদ দেয়া হল-

"Let us consider the actual, worldly Jew — not the Sabbath Jew, as Bauer does, but the everyday Jew. Let us not look for the secret of the Jew in his religion, but let us look for the secret of his religion in the real Jew. What is the secular basis of Judaism? … Practical need, self-interest. What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money. Very well then! Emancipation from huckstering and money, consequently from practical, real Jewry, would be the self-emancipation of our time… In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Jewry."

অনুবাদ: "আমাদের ভাবা উচিত যে, সাধারণ ইহুদিদের ধর্ম কী? সেটা কোন সাবাথ ইহুদি না যেটা তাদের ধর্মগুরুরা তাদের করে থাকেন কিন্তু আমাদের দেখা উচিত ইহুদি ধর্মের মূলের প্রতি। ইহুদীবাদের বৈশ্বিক ভিত্তি কী?..ভোগ আর স্বার্থপরতা? কী তাদের সত্যিকার ধর্ম? সুদখোরী? কোনটা তাদের সতিকার উপাস্য? টাকা? ঠিক আছে তাহলে! লোভ আর সুদখোরী থেকে এবং পর্যায়ক্রমে এবং ইহুদিবাদ হতে পর্যায়ক্রমে মুক্তিদানই হবে আমাদের আত্নমুক্তি। শেষ কথা হচ্ছে ইহুদি থেকে মুক্তিদানই হবে ইহুদীবাদ থেকে মুক্তিদান।"

উপরের অংশগুলো আর শিরোনাম পড়ে আপনাদের হয়তো মনে হয়েছে এটা হয়তো এডলফ হিটলার এর বলা কোন বিখ্যাত ভাষণ এর অংশ। কিন্তু না এটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা সমাজতান্ত্রিক এবং কথিত সাম্যবাদীদের মহামানব কার্ল মার্ক্স এর লেখা কিছু মন্তব্য যেটা লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এর পাবলিক ডোমেইন-এ রাখা আছে প্রদর্শনীর জন্য।

[29] লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস, কার্ল মার্ক্স

এর পরের উক্তিটা দেখুন-

"We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are all determined to destroy this system under all conditions."

অনুবাদ: "আমরা সমাজতান্ত্রিক আমরা বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শত্রু যা সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের শোষণ করে, তার বৈষম্যমূলক বেতন-ব্যবস্থার মাধ্যমে। আর তার অযাচিত আর অমানবিক মূল্যায়ন যেটা একজন ব্যক্তিকে তার সম্পদের মাধ্যমে করা হয় তার দায়িত্ববোধ আর যোগ্যতার বদলে, আর আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই ব্যাবস্থাকে যেকোন মূল্যে ধংসের জন্য।"

এটা পড়লে এমনিতে মনে হবে কার্লমার্ক্স এর কোন বই থেকে অথবা কোন উক্তি নয়তো কোন সমাজতান্ত্রিক নেতার অথবা লেখকের উক্তি। তা কিন্তু না, এটা মূলত এডলফ হিটলার বলেছিলেন, মে মাসের ১ তারিখে ১৯২৭ সনের দিকে।

অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে যে, সাম্যবাদী মার্ক্স আর নাযিবাদি হিটলার কোন ক্ষেত্রেই একে অন্যের কাছাকাছিও ছিলেন। তবে অনেক চিন্তা আর পড়াশোনার পরে এই ধারণাটা অনেকটা ভাবায় অনেককে তারপরে সোশ্যাল হিস্টোরি ডকুমেন্টেসান এবং বহু নিরীক্ষার পরে ১৮৪৮ সনের পর থেকে যত যুগান্তকারী মতবাদ প্রণীত হয়েছে তাদের একত্বের বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়, (যদিওবা হিটলার সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, ১৯২৯ সালের তার একটা কথার মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় নাৎসিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে মিল সামান্য) এই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোও ছিল তাদের মধ্যে একটি মতবাদ।

এই প্রবন্ধের এই অংশে শুধুমাত্র বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট মতবাদ এবং তাদের চরম লক্ষ্য ইউটোপিয়ার ধারণাটা আসলো কোথায় থেকে?

সমাজতন্ত্র কী?

অনেক ডিকশনারি এবং বইপত্রে লেখা আছে সমাজতন্ত্র হচ্ছে এক ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কথা বলার অধিকার আছে, তার থেকেও বড় কথা এখানে আছে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্য এবং নায্য অধিকার। খুব ভালো কথা আচ্ছা এখন দেখা যাক মার্ক্স কী বলতেন সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে অথবা প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধারণা কি পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের মূল চেতনার সাথে খাপ খায় কিনা?

অতি-সরলীকরণ করলে যে কথাগুলো মার্ক্স এর বিভিন্ন লেখা থেকে বোঝা যায় (যেহেতু তিনিই এই বাদের প্রবক্তা) তা হচ্ছে, মার্ক্সের দর্শন মতে সমাজতন্ত্র শুধু একটা সরকারব্যবস্থা না একটা রাষ্ট্রীয় ধরণ একটি কঠোর ভাবে শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৌশল-পদ্ধতি অবলম্বিত রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে একটা দেশ যাত্রা করবে পুঁজিবাদ হতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের "রুপান্তরের" পথে, যেখানে কমিউনিস্ট ইউটোপীয়া হচ্ছে সর্বাধিক কাম্য একটা সমাজব্যবস্থা। একটা পৃথিবী যেখানে নেই কোন ধর্ম, পুলিশ, যুদ্ধ। অনন্ত সুখের (!) এক স্বপ্নভূমি। আচ্ছা, এসব কি শুধুমাত্র ভূমি মালিকদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা কেড়ে নেবার মাধ্যমে সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, না।

এই পরিবর্তনশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য প্রক্রিয়াজাত করার কাজ করতে হবে। তো এখন কথা হচ্ছে যারা প্রক্রিয়াজাত হতে চায়না তাদের কী করতে হবে?

সোজা ভাষায় এসব অনিচ্ছুক ম্যাটেরিয়াল বা উপাদান সমূহকে উচ্ছেদ করতে হবে জড় থেকে। অনেকে বলেন এই অবাঞ্ছিত বস্তু বা উপাদান সমূহ আসে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। তো এই ব্যপারটা আসলে একেবারে মিথ্যা না হলেও এটা পুরো সত্য না। এই সমাজকে গঠন করার জন্য প্রয়োজন কিছু মাপকাঠি। এটা রাজনৈতিক হবার সাথে সাথে সামাজিক এবং গোষ্ঠীয় হতে হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায়। হিসাব অনুযায়ী একটা মাপকাঠি বা মেজারিং স্টিক দরকার ইউটপিয়াতে কে কে ফিট আর কে ফিট না সেটা বোঝার জন্য।

আর যে এটার মধ্যে যেতে চায় না তার পরিণতি কখনই ভালো না আর এদের জন্য সমাজতন্ত্র কোনদিন ভালো কিছু রাখেনি বরং বিরোধীকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে সমাজতন্ত্রে এই

রকম কথাই আছে। ধীরে ধীরে এই পৃথিবী থেকে সকল ইনফেরিওর বা দুর্বলজাতিকে ধ্বংস করতে হবে অথবা তারা নিজেরাই ধংস হবে এই প্রক্রিয়ায়। অনেক সমাজতান্ত্রিক আমার দিকে হয়তোবা তেড়ে আসবেন এইকথা বলে যে ইহা সত্যিকার সমাজতন্ত্র নয় তাহলে তাদের জন্য আমার নিচের লেখাগুলো দিয়ে দিলাম-

"Until its complete extermination or loss of national status, this racial trash always becomes the most fanatical bearer there is of counter-revolution, and it remains that. That is because its entire existence is nothing more than a protest against a great historical revolution… The next world war will cause not only reactionary classes and dynasties, but also entire reactionary peoples, to disappear from the earth. And that too is progress." – Karl Marx, 1849, Neue Rheinische Zeitung

এখানে সহজ ভাষায় যেটা বলা হয়েছে তার সারাংশ হচ্ছে যে, জাতি বা সম্প্রদায় হচ্ছে বিপ্লবের সব থেকে মৌলিক বাধা আর এই সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত করার পথে সব থেকে বড় প্রতিবাদ। অনেকে বলবেন এতে খারাপ কিছু কি আছে? এই সমাজে বিপ্লবের কারণে একসময় না একসময় সমস্ত সম্প্রদায় এর কুপ্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর পৃথিবী পাবে তার ইউটোপীয়া। এটা তেমন হিংস্র মনে না হলেও এর পরের উক্তিটা সব প্রকাশ করে দিবে দিনের আলোর মত-

"The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way…. They must perish in the revolutionary holocaust." – Karl Marx, Marx People's Paper, April 16, 1856, *Journal of the History of Idea*, 1981

এটা কি মনে হয় আপনাদের revolutionary holocaust বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? বাম আর সমাজতান্ত্রিকদের নিকট প্রশ্ন থাকল?

সামাজিক বিবর্তন আর মানবতাবিরোধী ইউজেনিক্স:

যে সময়ে কার্ল মার্ক্স তার সোশ্যালিস্ট ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছিলেন তার একশ বছর আগে থেকেও সোশ্যালিজম এর বিষয়ে বেশ কিছু কথা উঠেছিল। মার্ক্স মূলত এইসমস্ত মতবাদের সমন্বয়কারী, আর এইসমস্ত বাদের মধ্যে আরেকটি বেশ বিতর্কিত মতবাদ এর কাঠামো তৈরি হচ্ছিল। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক হতে গেলে নাস্তিক হতেই হবে সেজন্য তাদের এই মতবাদের সাথে আরেকটি বিশ্বাস থাকা খুবই অনুমেয় আর সেটা হচ্ছে মানব-বিবর্তন। প্রশ্ন উঠে মনে মানব-বিবর্তন বিশ্বাস করলে ক্ষতি কী? তাহলে সেটা নিচে দেয়া হল।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, ডারউইন এর মানব বিবর্তন শুধুমাত্র মানুষের বাহ্যিক এবং শারীরিক বিবর্তনকেই বোঝায় কিন্তু তার বন্ধু কার্ল মার্ক্স তার এই তাত্তিক ধারণাকে অনেক বেশী গতিশীল করে তোলেন ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে। যদিওবা ডারউইন তার নিজের তত্ত্বেরই অনেক বার সামাজিক প্রয়োগ এর ব্যাপারে কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে মার্ক্সের অবস্থান ডারউইনের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বেশী ব্যবহারিক এবং উদ্যমী ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ডারউইনবাদের ব্যবহার শুধু তাত্ত্বিক নয় ব্যবহারিক দিক থেকেও করা উচিত।

ইউজেনিক্স এর প্রাচীন মতবাদ সোশ্যাল ডারউইনইজম এর প্রবক্তারা মনে করতেন যে, দুর্বল, জন্মগত অসুস্থ, আর অনুন্নত লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করাটা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এবং সারভাইভাল অব ফিটেস্ট প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাধা যা মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিরূপণে বাধা প্রদান করছে।

এছাড়াও, ডারউইনইজম এর প্রবক্তা ডারউইন আরও বলেছেন যদি মানব সমাজ এসব সাবস্পিসিজ বা অনুন্নত প্রজাতিদের সাহায্য জোড়া বন্ধ করে দেয় তাহলে হয়তোবা প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই ঝামেলা সমূহ আমাদের আর বিরক্ত করবে না। তাদের অভিমতে এটা মানব সমাজকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে সাহায্য করবে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে।[30] যখন তার এই তত্ত্ব প্রায় পূর্ণতা পাবার উপক্রম তখন তিনি এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেন, “…Do the races or species of men… encroach on and replace one another, so that some finally

[30] অরিজিন অব স্পিসিজ

become extinct?… We shall see that all these questions must be answered in the affirmative…"[31]

অনেকে বলেন, এটা নাকি পুরনো সব মানুষদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা অনেক বছর আগে পৃথিবীতে ছিল তাহলে তাদের জন্য এর পরের চমকটা অপেক্ষা করছে। এইসব তথাকথিত সাব-স্পিসিজ এর বাণীসমূহ ডারউইনের লিখিত বই Descent of Man-এ খুব ভালোভাবে দেয়া আছে। এখানে তিনি বলেছেন, "At some future period, in the not very distant future… the civilized races of man will almost certainly exterminate and replace the savage races throughout the world…"

এই বইটা পড়ার পরে মার্ক্স বলেন যখন তিনি তার চিন্তাধারা বুঝতে পারেন, "…this is a book which contains the basis of natural history for our views."

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি! এটা আবার কেমন কথা কেমন ভাবে সামাজিক বিবর্তনবাদ সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সমার্থক হল? এই অমানবিক মতবাদটা মানবতার মুক্তিদানকারী সমাজতন্ত্রের কেমন করে সমার্থক হল প্রশ্ন জাগে মনে, তবে কি ডারউইনের মতবাদ আর মার্ক্সের মতবাদ পরস্পর পরিপূরক? জানি না এমন কোন কথা, হয়তো বা হয়তোবা নয়। তবে সহায়ক এই বিষয়টি পরিস্কার।

তবে সব থেকে কুখ্যাত তত্ত্বটির পূর্ণতা পাওয়া তখনো বাকি ছিল। ডারউইনের সৎ এক কাজিন তার এই মতবাদ পড়ে এতোটাই অনুপ্রাণিত হন যে, তিনি নিজের চিন্তাধারা এর সাথে যোগ করেন এবং তিনি এক নতুন বিশ্বের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন, তিনি প্রক্রিয়াগতভাবে বিভিন্ন ক্লাস বা দল-উপদলে মানবজাতিকে বিভক্ত করতে শুরু করেন যে, কে কে এই মানবসমাজে অবস্থান পাবার যোগ্য আর কে না। তিনি মানব সমাজকে এক নতুন উপায়ে এক নতুন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করন শুরু করেন এবং বিশ্বাস করতে থাকেন অবাঞ্চিতদের বিশুদ্ধি, বিকলাঙ্গদের বিলুপ্তি এবং তথাকথিত নীচু প্রজাতিসমূহের অধিগ্রহণ খুব সতর্কতার সাথে কৃত

[31] ***On the*** origin of ***species*** by means of natural selection – Page 498

সামাজিক প্রকৌশল এবং ডিজাইনিং এর মাধ্যমে করা যায়। এই তত্ত্বটার নাম **ইউজেনিক্স**, আর বিজ্ঞানীর নাম স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন।

স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন বর্তমানে একটু অখ্যাত হলেও চার্লস ডারউইন এর সময়ে তার প্রভাব ছিল ঈর্ষা করবার মতো। ডারউইন এর তত্ত্ব প্রদান করবার পর থেকেই কি সামাজিক কি রাজনৈতিক প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের উপাদান আর উৎপাদক উভয়ই ছিলেন গ্যালটন। যুগান্তকারী সামাজিক প্রকৌশল এর পুরোধা হিসেবে তার নাম আসে সর্বাগ্রে।

এর আগের পর্বে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে কিভাবে মার্ক্স আর ডারউইনের তত্ত্ব এক সাথে একই ক্ষেত্রে সাহায্যকারী পরস্পরের, এক্ষেত্রে আপনাদের কয়েকটি বিষয় পরিস্কার করে দেয়া লাগবে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই প্রসঙ্গে প্রথমে আসে হেগেলের কথা। যদিওবা হেগেল আর মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চিন্তার ধরণটা ছিল দুই প্রকৃতির। তাদের মধ্যেকার সুস্পষ্ট চিন্তার ব্যবধান নিচে দেয়া হল।

এ প্রসঙ্গে সিডনী হুক এর বইয়ে মার্ক্স এবং হেগেলের মধ্যে যে পার্থক্য দেয়া হয়েছিলো সেটার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল-

His first point of difference between Hegel and Marx is both thinkers' conception of philosophy. For Hegel, philosophy is an activity of thought, a self-enclosed and self-sufficient *Nachdenken* (German for reflection, literally thinking-after) whose purpose is the clarification of what has happened. "To clarify an event is [for Hegel none other than] to explain it in terms of logical necessity [. . . in which the event is] fitted into some developing whole [i.e. the system]," in that process revealing its meaning, which can be no other than what it is (i.e. what has happened). "The task of the philosopher is [thus] to discover that meaning [which is none other than God, or Spirit, or Mind: *Geist*], progressively correcting his conceptions *after* more and more of the web of cosmic structure [as *Geist*, through man, comes to know itself] has been

disclosed to him" . Thus philosophy's only goal is (self-) understanding, in which "the world comes to self-consciousness and man rests in God."

অনুবাদ: "মার্ক্স আর হেগেলের মধ্যে পার্থক্যর প্রথম অবস্থানটা হচ্ছে যে তারা দুইজনেই মুক্তচিন্তাবাদি দার্শনিক দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর তাদের চিন্তা সবথেকে বেশী প্রভাবশালী। হেগেলের জন্য দর্শন হচ্ছে একটা চিন্তা করার ক্রিয়া, আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ *Nachdenken* বা প্রতিবিম্ব (জার্মান ভাষায়) ভাষাগত ভাবে চিন্তার প্রতিফলন সেটার মূল কাজ হচ্ছে যেটা সংঘটিত হয়েছে সেটাকে সুনির্দিষ্ট করা হেগেলের ভাষায় ' কোন বস্তুকে পরিস্কার করা [বিকল্পহীন ভাবে হেগেলের জন্য] মানে সেটাকে প্রয়োজনীয় যুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা [যেখানে বিষয়টা] একটা পরিবর্তনশীল কাঠামোর মধ্যে অবস্থান লাভ করে [পদ্ধতির মধ্যে]। এবং যে পদ্ধতির মাধ্যমে এর অর্থ প্রকাশিত হয় যেটা কি হয়েছে সেটা ছাড়া আর কিছুই না অর্থাৎ হেগেল বাদ অতীত কে এবং কর্মের দান্দিকতার দিকে সবচেয়ে বেশী জোর দেয় এবং দার্শনিক প্রসঙ্গে হেগেল বলেন, "দার্শনিকের কাজ হচ্ছে মহাবিশ্বের সদা পরিবর্তনশীল ধারণা সমূহের মধ্যে সম্পর্কের সন্ধান করা যতটা তাঁর নিকট মহাবিশ্বের ধারণা এর বিষয়টা সুস্পষ্ট হতে থাকে "অর্থাৎ দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে জানা যেখানে "বিশ্ব আত্মচেতনার মুখোমুখি হয় এবং মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে।"

Thus for Marx what the philosopher does is not contemplative evaluation (as Hegel would have it) but involved social activity contemporary with the material state of things. In fact, ironically enough, Hegel's contemplative philosophy itself (like all contemplative philosophies), Marx points out, is not "removed from life" (25). Making current society the object of philosophy (esp. a teleological one that claims that the said state is the highest so far, necessary towards final perfection) with which philosophy does nothing but reflect about (esp. as some form of prototype or paradigmatic model, which philosophies tend to do to their objects) (esp. a philosophy that identifies "reason" with "reality" (20)) is to accept that actually existing state of things—as the State of things, the way that things absolutely are; and as something acceptable, the

way that things should be—in the process (doubly) legitimizing that current state.

অনুবাদ: কিন্তু মার্ক্সের জন্য দার্শনিক কি করেন সেটার কোন মুল্য নেই। এর বদলে তিনি সামাজিক আচরণ সমূহকে ব্যাখা করে এটা প্রদর্শন করেন। তিনি এটাকে শুধুই বস্তুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং শুধুই ইন্দ্রিয়বাদের মধ্যে এর সার্থকতা দেখাতে থাকেন। এবং তিনি এর সমালোচনা করেন এই বলে যে, অন্য যেকন তুলনামূলক এর মত হেগেলের তুলনামূলক দর্শনও শুধুমাত্র বর্তমান জীবনকেই আলোচ্য হিসেবে ধরেছে এবং বর্তমান সমাজকেই তার আলোচ্য মনে করা হয়েছে (এটা একটা দুর্বোধ্য উপায় যেটা শুধুমাত্র সর্বশেষ পরিস্থিতি কে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে বা মানব সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য) আর এটা প্রতিটি বস্তুকে সেই অবস্থাতেই পরম মনে করে যে অবস্থায় এটা বর্তমানে আছে অথবা যেকন অবস্থাতে সেটা বিদ্যমান থাকবে (সরলীকরণ করে) এবং যেটা সমাজের যেকোনো পরিস্থিতিকেই বৈধ মনে করে।

এর ফলে বোঝা যায় যে, মার্ক্স আর হেগেলের দর্শন আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও সেটার মধ্যে একটা বড় তফাত আছে আর সেটা হচ্ছে হেগেল এর তত্ত্ব শুধুমাত্র Dialectal Materialism এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু মার্ক্স এর প্রয়োগ নিয়ে যান সামাজিক ক্ষেত্রে যেটা পরে মার্ক্সবাদ নামে পরিচিত হয়।

এপ্রসঙ্গে বলা যায়, মার্ক্সের এই বিরোধিতার জন্য দান্দিক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনটা আসে এবং এর পূর্ববর্তী আলোচনায় সমাজতন্ত্রের যে অমানবিক দিক গুলকে তুলে ধরা হয়েছে সেটা আসে কেমন করে? প্রথম কথা হচ্ছে দান্দিক বস্তুবাদ কখনো একটা নির্দিষ্ট প্রোপ্যাগান্ডা ছিল না বরং এটা কোন নির্দিষ্ট সময়কেও নির্দেশ করেনি। হেগেলের তত্ত্ব একটা নির্লিপ্ত দার্শনিক তত্ত্ব ছিল আর মার্ক্সের তত্ত্ব ছিল মূলত ব্যবহারিক জীবনের জন্য। নিচের লেখাটা এটা আরও স্পষ্ট করবে।

First, let's say what Marx meant by 'critique'. It was closely bound up with Hegel's idea of 'sublation' [*aufheben*]: to negate, and thereby to preserve the inner truth of something.

Hegel's philosophical work was an attempt to summaries the essence of the entire history of philosophy, and for him that meant an entire history. So Marx's critique of Hegel was a critique of philosophical science as such. He concluded that philosophy cannot answer the questions that philosophy has brought to the surface. In the end, those questions are not philosophical but practical. When Marx claimed that his work was scientific [*wissenschaftlich*], this did not mean that he was elaborating a set of doctrines, of 'theories', but that, by tracing the contradictions of existing science to their roots in the inhuman way in which humans lived, he could bring to light the necessity to revolutionize that way of life, to move from contemplation to 'practical-critical', revolutionary solutions.[32]

সিরিল স্মিথ এখানে সোজা ভাষায় বেশ কিছু অসম্পূর্ণ কথা বললেও তার কিছু কথা যেমন "হেগেলের সাথে মার্ক্সের প্রধান তফাত ছিল হেগেলের রক্ষণশীলতা বা নমনীয় মনভাব নিয়ে আর তার ফালতু বিশ্বাস সমূহকে সংরক্ষণের বা তাদের বাতিল করার প্রতি তার অনীহা নিয়ে" এছাড়াও মার্ক্সের ধর্ম সংক্রান্ত যে বিষয়টা রয়েছে বা ধর্ম ধ্বংসের যে পদ্ধতিটা আছে সেটা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

এ প্রসঙ্গে সিরিল বলেন-

It is similar to Marx's attitude to religion: it was not a matter of rejecting religious sentiment because it was 'untrue', without foundation, and then devising a new religious form. Rather, we have to uncover those aspects of a way of life which gave rise to religion – and then revolutionize those aspects. Religion was 'the heart of a heartless world'. So the issue was to establish a world with heart. Instead of an illusory solution, we must, in practice, find a real one.

এ প্রসঙ্গেও মার্ক্সের চরমপন্থি মতবাদ সমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

[32] http://www.marxists.org/ , Paper by Cyril Smith for Hegel seminar 18th June 1999

অনুবাদ: "এটা (হেগেলের সমালোচনা) এর ক্ষেত্রে মার্ক্সের অবস্থান ছিল অনেকটা তার ধর্ম সংক্রান্ত মতবাদ এর মত, এখানে তিনি ধর্মকে এজন্য ধ্বংস করতে চাননি কেননা সেটা ভুল ছিল এবং সেটাকে ধ্বংস করে তিনি নতুন একটি ধর্মও তৈরি করে যেতে চাননি। তার মতবাদ ছিল সেই কারন সমূহকে খুঁজে বের করা যেগুলা জীবনে ধর্মকে উৎপন্ন করেছিল এবং সেগুলকে ধ্বংস করা বা সেগুলতে বিপ্লবসাধন করা। ধর্ম ছিল বর্বর সমাজের বা নিষ্ঠুর সমাজের হৃদয় একে ধ্বংস করে একটা নতুন হৃদয় সম্পন্ন এবং চমৎকার বিশ্ব (!) তৈরির জন্য এর বিলোপসাধন জরুরি। কোন তত্ত্বীয় সমাধানের জায়গায় আমাদের খুজতে হবে একটা বাস্তব সমাধান।"

এখান থেকে একটু হলেও বোঝা যায় কার্ল মার্ক্সের ধর্মবিদ্বেষ। কিন্তু হেগেলের দান্দিক বস্তুবাদ তো ধর্মকেও সমাজের একটা উপাদান মনে করে সেটার পর্যালোচনা করার এবং সেটাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবছেদ এর কথা বলেছে। হেগেলের দান্দিক বস্তুবাদের মতে ধর্মকে কখনই বস্তুবাদ এবং বস্তুবাদী পৃথিবীর সাথে একত্রিত করার কথা বলা নাই বরং এটাকে (ধর্মকে) দার্শনিকদের আলোচ্য হিসেবে ছেড়ে দেয়ার এবং ধর্মকে আত্মার পরিশুদ্ধির একটা ক্ষেত্র বলা হয়েছে।

ঠিক এক্ষেত্রেই মার্ক্স এই ঈশ্বর চিন্তা আর ধর্মচিন্তাকে আফিমের সাথে তুলনা করেছেন।

কিন্তু মার্ক্সের এই মতবাদ তার নিজের জন্যই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কেননা এই মতবাদ উনি সেই সময়ে প্রদান করেছিলেন সে সময়ে ধর্মের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড এইসময়ে তার এই মতবাদ তার জন্য কাল হতে পারতো। এই কারণে তার দরকার ছিল এমন একটি মতবাদের যা ধর্মকে একেবারে নাড়িয়ে দিতে পারে যে তত্ত্ব স্রষ্টার হাতকে কেটে ফেলতে পারে (নাস্তিকদের ভাষায়)।

যে সময়ে মার্ক্স তার এই নতুন "Dialectal Materialism" মতবাদকে নতুন ভাবে তৈরি করেছিলেন, এই দর্শন যে সমস্ত জীবন এর মূললক্ষ্য হচ্ছে সংগ্রাম, তখন চার্লস ডারউইন মূলত একটা নতুন মতবাদ নিয়ে আসেন যে **"সমস্ত জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে সংগ্রাম আর প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে এখানে স্রষ্টার কোন ভুমিকাই নেই"।**

যদিও আমরা মনে করি যে ডারউইন এই বিবর্তন বাদকে এর প্রথম প্রবক্তা, এই মতবাদ তিনি পেয়েছিলেন হঠাৎ করে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে তাহলে এই ধারণা সঠিক না এই আইডিয়া সর্বপ্রথম লিখেন।

Johann Wolfgang von Goethe ১৮০০ সালের দিকে এবং এই মতবাদটাকেই ডারউইন পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে শক্তভিত্তির ওপর দাড় করান। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে গথে কখনই কোন প্রকারের পর্যবেক্ষণ এবং পরিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই মতবাদের সূচনা করেননি যা করেছিলেন ডারউইন আর হেকেল।

কিন্তু এই মতবাদ মার্ক্সকে তার কাঙ্খিত প্ল্যাটফর্ম এনে দেয় এবং তিনি ডারউইনকে যা বলেন তা Gerald Runkle রচিত Marxism and Charles Darwin নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে এখানে যখন মার্ক্স তার Das Capital এর প্রথম খণ্ড তাকে উৎসর্গ করেন তখন তাকে তিনি বলেন-

“I thank you for the honor you have given me by sending me your great work on capital; and I heartily wish that I was more worthy to receive it by understanding more of the deep and important subject of political economy though our studies have been so different but we both believe in the extension of knowledge for the happiness of mankind.”

এখন কথা হচ্ছে মার্ক্স আর ডারউইন এর মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন দিকে হলেও এদের মূল সূত্রটি ছিল এক জায়গায় আর সেটা হচ্ছে উগ্র বস্তুবাদ। আর এই উগ্রবস্তবাদের ধিকিধিকি আগুনকে হাওয়া দিতে থাকেন আরেক ব্যক্তিত্ব তার নাম হচ্ছেন ফ্রান্সিস গ্যালটন।

যখন তিনি ডারউইনের ‘ survival of the fittest’ এই তত্ত্বটি পড়েন তখন তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। এবং তিনি যখন প্রজাতিসমূহের সংগ্রাম অথবা “competition of the species”, তিনি তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, তার সময়ের প্রতিটি জ্ঞান এবং তত্ত্ব একটা সুনির্দিষ্ট উত্তরের দিকেই তাক করছে আর সেটা হচ্ছে এটা কোন প্রজাতিভিত্তিক না বরং জাতিভিত্তিক সংগ্রাম বা “struggle of the races.” হ্যাঁ প্রথমবারের মত কেউ এরকম একটা

তত্ত্ব নিয়ে আসেন যে "সব মানুষ আসলে সমান না" কিছু মানুষ বেশী বিবর্তিত আর কিছু মানুষ কম বিবর্তিত সাব-স্পিসিজ, যেগুলো হয় সবথেকে চমৎকার প্রজাতিসমুহের সাথে এগুলো মিশে যাবে অথবা এরা ধ্বংস হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে পড়ে থাকবে, ১৮৬৯ সালে ডারউইনের বই বের করার ১০ বছর পরে গ্যালটন নতুন একটা বিজ্ঞান এর জন্ম দেন যার নাম দেয়া হয় ইউজেনিক্স অনেকে বলেন, এই মতবাদ হচ্ছে গ্যালটনের একার। তাহলে তাদের নিচের লেখা গুলো পড়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে।

ডারউইন ইউজেনিক্স এর ইনিশিয়েটার বা দ্রষ্টা:

"At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilized races of man will almost certainly exterminate and replace throughout the world the savage races. At the same time the anthropomorphic apes . . . will no doubt be exterminated. The break will then be rendered wider, for it will intervene between man in a more civilized state, as we may hope, than the Caucasian, and some ape as low as a baboon, instead of as at present between the Negro or Australian and the gorilla."[33]

আরও যদি চান তাহলে নিচে আছে এগুলো-

Darwin's foremost German disciple, Ernst Haeckel, made even more dramatic statements. According to Haeckel, if you want to draw a sharp boundary between the human races and the apes, "you must draw it between the most highly developed civilized people on the one hand and the crudest primitive people on the other, and unite the latter with the apes."

অনুবাদ: ডারউইনের সবথেকে প্রিয় ছাত্র Ernst Haeckel আরও বেশী নাটকীয় কথা বলেন হেকেলের মতে "যদি আপনি মানুষ আর নর-বানরদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানতে চান" আপনাকে অবশ্যই সেটাকে সবথেকে সবথেকে সভ্য মানুষকে এক তরফে রেখে আর সবথেকে আদিম মানুষকে আরেক তরফে রেখে করতে হবে, এবং পরবর্তীদেরকে (আদিম মানবদের) নর-বানরদের গোষ্ঠীর অন্তুরভুক্ত করতে হবে।"

[33] The descent of man

এটার মানে কি? এটা তিনি তখন বলেন যখন কলনাইজেশান তুঙ্গে অবস্থান করছে আর দাস ব্যবসা সবথেকে লাভজনক আকার ধারন করেছে তখন? এটা বলে তিনি আর তাঁর গুরু একবারে সমস্ত নিগ্রোদেরকে নর-বানর দের অন্তর্ভুক্ত করে দেন যে তাদের প্রথম শ্রেণীর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই ? আর একে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান তৎকালীন সমস্ত ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী আর বিবর্তন পন্থী কেননা এই মতবাদ একেবারে বৈজ্ঞানিক ছিল আর ছিল বিবর্তন তত্ত্বের চোখে একেবারে সঠিক।

এই কি তাহলে বিবর্তনবাদ?

অনেকে বিবর্তনের বিষয়টিকে জননবাদ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাহলে দেখা যাক এ ব্যাপারে ডারউইনের কি প্রোজেক্ট ছিল। ডারউইন প্রথম দিকে যথেষ্ট বিতর্কিত হলেও এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু হাক্সলি (যাকে বুলডগ নামেও ডাকা হয়) এগিয়ে আসেন তিনিই প্রথম এই বিষয়টিকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দেন এবং হাক্সলি, গ্যলটন আর ডারউইন তিন জন মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা নিজেরা নিজেদের তিনটি ফ্যামিলির ভিতরেই প্রজনন করবেন এবং কয়েক পুরুষের মধ্যে তারা জন্ম দেবেন এক সুপারম্যান ফ্যামিলি। বলা বাহুল্য তাদের প্রচেষ্টা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়।

কিন্ত দুটি কারণে ইউজেনিক্স বিলুপ্ত হয়না সেটার মধ্যে একটি হচ্ছে বিশ্বের বহু ভার্সিটি তাদের এই মতবাদ কে পড়াতে শুরু করে আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছেন আমাদের কার্ল মার্ক্স। কেননা মার্ক্সবাদীরা এটাকে দেখতে থাকেন তাদের ইউটপিয়া লাভের একমাত্র রাস্তা হিসেবে আর তাই এই রক্ত-পিপাসু কার্লমার্ক্স আর তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সমাজতন্ত্র আর ইউজেনিক্স প্রায় সমার্থক বানিয়ে দেন।

অনেকে আবার এই রক্তপিপাসু কথাটার প্রচন্ড বিরোধিতা করবেন সেজন্য দিয়ে দিলাম কার্লমার্ক্স এর কিছু অমৃতবচন-

On peaceful Movements: "May the devil take these people’s movements, especially when they are ‘peaceful."[34]

[34] Neue Rheinische Zeitung No. 13

On Terrorism: “There is only one way in which the murderous death agonies of the old society and the bloody birth throes of the new society can be shortened, simplified, and concentrated, and that way is revolutionary terrorism.”[35]

On Dictatorships: “Every provisional political set-up following a revolution requires a dictatorship, and an energetic dictatorship at that.”[36]

On Family: “After the earthly family is discovered to be the secret of the holy family, the former must then itself be annihilated in theory and in practice.”

এসব শুনে অবশ্যই আপনাদের মার্ক্সকে শান্তি আর মানবতার গুরু মনে হচ্ছে তাই না? তাহলে আমাদের অবশ্যই আজকে থেকে সমস্ত ধর্ম ছুড়ে ফেলে দিয়ে মার্ক্সবাদে পরম শান্তি খুঁজে নিতে হবে।

ইউজেনিক্স এর প্রসার সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে (বিংশ শতাব্দীতে) ১৯০৫-১৯৩২ ইউজেনিক্স এর প্রসারের প্রথম ধাপ ছিল এই সময়টা। ১৮৯৮ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র পার্টি সুইডেনে ক্ষমতাগ্রহণ করে কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদ এর সমর্থক এই রাজনৈতিক দলটা ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সুইডেনে অবস্থান করে এবং তাদের দরুন প্রায় ৪০০০০০ মানুষের স্টেরিলাইজেসান এর প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।তারা চরম ভাবে গ্যালটন এর মতবাদের অনুসারী ছিল। ১৯০১ এইচ. জি. ওয়েলস লিখেন *Anticipations*, কট্টর ইউজেনিক্স বাদ প্রবর্তনের এবং ভবিষ্যতে এর প্রভাব আলোচনা করা হয় এ জায়গায়।

১৯০৪ চার্লস হারবার্ট ডেভেনপোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন Cold Spring Harbor Research Facility নিউইয়র্কে যেখানে জন ডি.রকফেলার, এন্ড্রু কারেঞ্জি, আর হ্যারিম্যান পরিবার সহ অনেকে টাকা পয়সা দেন যাতে সেখানে ইউজেনিক্স পঠিত এবং পরীক্ষিত হতে পারে, যার পরিণতি ছিল ভারজিনিয়ান ক্লেনসিং যেখানে প্রায় লাখ খানেক পরিবারকে স্টেরিলাইজেসান করা হয়

[35] Neue Rheinische Zeitung No. 301

[36] Neue Rheinische Zeitung Articles, June-November 1848

(এটা একটা প্রমাণ যে ইউজেনিক্স মূলত বাম প্রোডাক্ট হলে পারেও পুঁজিবাদীরাও এর থেকে খুব পিছিয়ে ছিলেন না)।

১৯০৭ প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সর্বপ্রথম ইউজেনিক্স-কে অনুমোদন প্রদান করেন এবং এরই সাথে সাথে ডেনমার্ক (১৯২৯), নরওয়ে আর এস্তনিয়া (১৯৩৬) সালে ইউজেনিক্স কে অনুমোদন দেয় আর এই ফলেই সংগঠিত হয় মানবতার সবথেকে বড় অপরাধের বা এথনিক ক্লেঞ্জিং এর।

১৯২৯ মারগারেট স্যাঙ্গার কট্টর ভাবে মালথুইসিয়ান ইউজেনিক্স এর সমার্থক তাঁর প্রথম ক্লিনিক খুলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে থাকেন তাঁর বাণী। এর ফলে সারা বিশ্বে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন কালো মানুষরা নিয়ন্ত্রিত গর্ভপাতের শিকার হন যেখানে তারা ছিলেন পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ ।[37]

তবে এই নগণ্য উদাহারণসমূহ কোন ভাবেই ইউজেনিক্স এর চরম ভয়াবহতা কে ব্যাখা করতে পারবে না। যে ইউজেনিক্স এর চরমতম স্বপ্ন ছিল Master Race Of the left. আজ একাবিংশ শতাব্দীতেও ইউজেনিক্স সগর্বে মাথা উচুকরে দাড়িয়ে আছে। কালো মানুষদের হাহাকারের মধ্যে, শত লক্ষ মানুষের মৃত্যু আর গণহত্যার মধ্যে। আজও এই ভয়াবহ শয়তান তাঁর কালো ডানা বিস্তার করে রেখেছে সমস্ত মানবজাতির ওপরে। আজ এর নাম আলাদা হলেও কাজ একই মূলসূত্র একই।

...আর এখানেই শেষ নয়! এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন

---- সমাপ্ত ----

[37] The American Thinker